স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু

সম্পাদনা
তপন কুমার দে



স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু • সম্পাদনা তপন কুমার দে

স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু

সম্পাদনা
তপন কুমার দে

তাম্রলিপি

স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু
সম্পাদনা : তপন কুমার দে

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০

তাম্রলিপি-১২৩

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আবু হাসান

কম্পোজ
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এম. আর প্রিন্টিং প্রেস
১১, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০

Shadhinoter Ghoshana O Bangabandhu
Edited by : Tapan Kumar Dey
First Published : February 2010, by A K M Tariqul Islam
Tamralipi, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 400.00

ISBN : 984-70096-0123-1

উৎসর্গ

জহুর আহমদ চৌধুরী
এম এ হান্নান
আব্দুল্লাহ আল হারুন
মাহবুব উল আলম চৌধুরী
এম এ মান্নান

সূচীপত্র

স্বাধীনতার ঘোষণা ১১
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১২
আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ ১৫
স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব ১৬
আবুল মাল আবদুল মুহিত - স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুজিবনগর সরকার ৩১
কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান - বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই ৩৭
আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন - স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু ৪৬
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ - স্বাধীনতার ঘোষণা : উত্থাপিত বিতর্ক ৫১
মুনতাসীর মামুন - এ শতকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়েছিল একমাত্র বাংলাদেশই ৬১
বেলাল মোহাম্মদ - স্বাধীনতা ঘোষণা : পুনরুক্তি করে বলা ৭২
এডভোকেট আমিন আহমেদ মন্টু - স্বাধীনতার ঘোষক পরিপ্রেক্ষিতে ভাবনা ৭৮
জহিরুল ইসলাম - রক্তাক্ত বাংলা ও স্বাধীনতার ঘোষণার ক্ষণ ৮৩
সরদার সিরাজুল ইসলাম - বঙ্গবন্ধু যেভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন ৯৫
অমৃত অধিকারী - স্বাধীনতার ঘোষক কে ৯৯
মযহারুল ইসলাম - স্থপতি এবং ঘোষক ১০৫
তপন কুমার দে - স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু ১১৩
ডা. এস এ মালেক - স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ আছে কি? ১৪৪
মোহাম্মদ সেতাব উদ্দিন - ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক ১৫১
বাহাউদ্দীন চৌধুরী - স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক ১৫৩
মাহবুব উল আলম চৌধুরী - স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে ১৫৮
মুসা সাদিক - ইথারে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেই টিক্কা খান গণহত্যার নির্দেশ দেন ১৬৫
খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ - ইতিহাস ঋজু, স্বচ্ছ ১৭০
এ এম এম শওকত আলী - স্বাধীনতার ঘোষণা, হাইকোর্টের রায় ও বিতর্ক ১৭৪
ড. আবদুল মতিন - বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৭
মাওলানা হোসেন আলী - ঘোষক বিতর্কের সমাধান ১৮৪
ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম - স্বাধীনতা এবং চট্টগ্রামের বিতর্কিত ঘোষণা ১৯০
সেলিম রেজা নূর - স্বাধীনতার ঘোষণা মার্কিন দলিল ও সংবাদপত্রে ১৯৫
হারুন হাবীব - ইতিহাসের সত্য ও হাইকোর্টের রায় ২০৩
সেকেন্দার মতিউর রহমান - স্বাধীনতার ঘোষণা একটি সমীক্ষা ২০৭
সাখাওয়াৎ আনসারী - তথ্যপ্রমাণের আলোকে স্বাধীনতার ঘোষণা ২১৩
শাহরিয়ার কবির - স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্বীকার করা মানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ২১৮

আবুল খায়ের - আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ২২২
আবুল মাল আবদুল মুহিত - স্বাধীনতা ঘোষণা দিবসের স্মৃতি একাত্তরে আমেরিকায় ২২৫
বাহজাদ আহমেদ - গোপন বেতারে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা ২৩২
সরদার সিরাজুল ইসলাম - তবুও জানতে হবে সঠিক ইতিহাস ২৪০
ডা. এস এ মালেক - স্বাধীনতার তৃতীয় ঘোষক ২৪৩
ড. হারুন-অর-রশিদ - ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ২৪৯
মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী - বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ২৫৪
কে জি মুস্তাফা - বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে আবার বিতর্ক ২৫৭
অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী- ২৬ মার্চ ১ম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ২৬৩
হাসান ফেরদৌস - ইতিহাসের বিকৃতি ও বাংলাদেশ ২৭৭
কে এম সোবহান - ঘোষণা পাঠ ২৬ মার্চ না ২৭ মার্চ ২৮৩
তপন কুমার দে - স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের কয়েকজন রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য ২৮৯
তপন কুমার দে - স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জেনারেল জিয়া শাজাহান সিরাজ, মীর শওকত ও কর্নেল অলির বক্তব্য ৩০২
তপন কুমার দে - স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বক্তব্য ৩১০

সম্পাদকীয়

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তির সহযোগিতায় বিশেষ একটি মহল দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবর্তে মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করে চলছে। এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির জন্য 'স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু' নামক গ্রন্থটি সম্পাদনার উদ্যোগ নিই। এই গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার লোকজন বিশেষ করে রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত লেখা পরিবেশন করে পাঠকদের উদ্দেশে উপস্থাপন করা হলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে এই গ্রন্থখানি যারা পাঠ করবেন তারা বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মেজর জিয়া নন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যিনি যাই করেছেন–তিনি তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব মেনেই করেছেন। যার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে মেনে নেন এবং অন্যকোনো নেতা বা মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে মেনে নেননি এবং অন্য কোনো নেতা বা মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করেননি। মেজর জিয়াও জীবিতকালে কোনোদিন কোনো বক্তব্যে নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে দাবি করেননি। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তব্যে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেই শুধু তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেনি, সেদিন তাঁর ও বাংলার মানুষের শত্রু জেনারেল ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও সিদ্দিক শালিক সহ বহু পাকিস্তানি নেতারাও বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন। বিদেশি আরো বহু রাজনীতিবিদ তাদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুকেই বাংলার স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতা করেছেন

তাদের মধ্যেও অনেকেই বিভিন্ন সময় বক্তব্য ও বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বহু বিচিত্র রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং জিয়ার মন্ত্রী সভার সিনিয়র সদস্য ও বি.এন.পি'র প্রভাবশালী নেতা জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়া বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক উল্লেখ করে বক্তব্যে বিবৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির জগতের আরেক বিচিত্র রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও দল বদলের ওস্তাদ ব্যারিস্টার মওদুদ ও শাহজাহান সিরাজ বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বলেন তার কিছু অংশ এই গ্রন্থে তুলে ধরা হলো। সেই সাথে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে বাংলাদেশের খ্যাতিমান লেখকদের বক্তব্য। তারা স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তাদের লেখায়। এই গ্রন্থটি স্বাধীনতার ঘোষক সম্পর্কে সঠিক তথ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের কাছে ভবিষ্যতে তুলে ধরতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠক সমাজ কিছু উপকৃত হন তবেই আমার কষ্ট ও শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে-এর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে লেখাপড়া করতে হয়েছে। আর এই লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন ভারপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক মোঃ মইজউদ্দীন খান এবং টেকনিক্যাল অফিসার মীর তাহাজ্জত আলী অঞ্জু এবং প্রকাশনা ও বিপণন শাখার সহকারী পরিচালক ভবরঞ্জন চক্রবর্তী। এ জন্য আমি তাঁদের নিকট অবশ্যই ঋণী। বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাম্রলিপি'র স্বত্ত্বাধিকারী এ কে এম তারিকুল ইসলামের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তপন কুমার দে

স্বাধীনতার ঘোষণা

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকা চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তি যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান, কোনো আপোস নাই জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

শেখ মুজিবুর রহমান
২৫ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর
১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ হতে ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৭১ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

এবং

যেহেতু, এই সমস্ত নির্বাচনে ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে বাংলাদেশের জনসাধারণ আওয়ামী লীগের ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেছিল,

এবং

যেহেতু, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই সকল গণপ্রতিনিধিকে ৩রা মার্চ, ১৯৭১ মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিল,

এবং

যেহেতু, উক্ত আহূত সভা, অনিয়মতান্ত্রিক ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল,

এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনারত থাকাকালে পাকিস্তানের কর্মকর্তাগণ তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু, উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যান্য অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলার মানুষের ন্যায়গত স্বাধিকারের জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এবং

যেহেতু, পাকিস্তানি বর্বরেরা, বাংলার নিরীহ জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা এবং তাদের উপর অমানবিক ও নৃশংস অত্যাচার করেছে এবং এখনও করছে

এবং

যেহেতু, পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও অন্যান্য দমনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ফলে, বাংলাদেশের নির্বাচিত বর্তমান প্রতিনিধিগণ মিলিত হয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন ও সরকার গঠনে অপারগ,

এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের বীর সন্তানগণ তাদের সাহস ও বীরত্ব ও বিপ্লবী চেতনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে,

আমরা, যারা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের জনগণ আমাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলনে আমরা একটি গণপরিষদ গঠন করলাম, এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার জন্য, বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি ঘোষণা করছি এবং যে পর্যন্ত না একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সে পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকবেন,

এবং

প্রেসিডেন্ট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক থাকবেন এবং তিনি রাষ্ট্রের সমুদয় নির্বাহী ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ক্ষমতাসহ ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন,

তিনি প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য মন্ত্রীকেও নিয়োগ করতে পারবেন। তিনি কর ধার্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবেন, তিনি গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবি ঘোষণা করতে পারবেন,

বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু সরকার গঠনের প্রয়োজনে তিনি যে কোনো কাজ করতে পারবেন,

আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরো ঘোষণা করছি যে,

প্রেসিডেন্টের অবর্তমানে তথা প্রেসিডেন্ট যখন তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগ অথবা দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সমুদয় দায়-দায়িত্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট পালন করবেন,

আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আমাদের যে দায়-দায়িত্ব তা পালন করব,

আমরা আরো ঘোষরা করছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে কার্যকর হবে। আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করলাম।

প্রফেসর এম ইউসুফ আলী
এম এন এ

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একই দিনে আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ নামে একটি আদেশ জারি করেন। স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সমস্ত আইন চালু ছিল, তা রক্ষার্থে এটা করা হয়।

আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ

আমি, বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে আদেশ জারি করছি যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সমস্ত আইন চালু ছিল, তা ঘোষণাপত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একইভাবে চালু থাকবে, তবে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য করা যাবে। এই রাষ্ট্র গঠন বাংলাদেশের জনসাধারণের ইচ্ছায় হয়েছে। এক্ষণে, সমস্ত সরকারি, সামরিক, বেসামরিক, বিচার বিভাগীয় এবং কূটনৈতিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাঁরা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছেন, তারা এতোদিন পর্যন্ত নিয়োগবিধির আওতায় যে শর্তে কাজে বহাল ছিলেন, সেই একই শর্তে তারা চাকুরীতে বহাল থাকবেন। বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত সমস্ত জেলা জজ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সমস্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা যাঁরা অন্যত্র অবস্থান করছেন, তারা সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের স্ব স্ব এলাকায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

এই আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে।

স্বাক্ষর/-
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব

(সোমবার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭২ বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতির জনক কর্তৃক উত্থাপিত স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে আমি আজ কয়েকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই। আজ আমরা এখানে গণপরিষদের সদস্য হিসেবে বসবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা যে আজ বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারছি, সে সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেকদিন থেকে শুরু হয়। জনাব স্পিকার সাহেব, আপনার জানা আছে যে, ত্রিশ লক্ষ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। এই গণপরিষদের সদস্য হিসেবে নিশ্চয়ই তাদের আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করব এবং মনে রাখব। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সে রক্ত যেন বৃথা না যায়। রক্ত দিয়েছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন, নিরীহ জনসাধারণ। রক্ত দিয়েছে এ দেশের কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীরা, রক্ত দিয়েছে ভূতপূর্ব ইপিআর, রক্ত দিয়েছে আনসার, মোজাহেদরা। রক্ত দিয়েছে প্রত্যেকটি বাঙালি, এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও রক্ত দিয়েছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। নিষ্ঠুর বর্বর ইয়াহিয়া খানের খান সেনারা যে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, তা থেকে বাংলাদেশের মা-বোনেরা পর্যন্ত নিস্তার পায়নি। লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এই পশু সেনাদের আচরণের ইতিহাস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই।

আজ তাদের কথা আমরা স্মরণ করছি, স্মরণ করতে হয় আমার সহকর্মী সভ্যবৃন্দের কথা, যারা সেই গত নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাদের অনেককেই বন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে—তাদের নামও ওই প্রস্তাবে রয়েছে, যে প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে পরিষদে পেশ করছি।

তাছাড়া এই দেশের জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ লোক, আওয়ামী লীগের লক্ষ লক্ষ কর্মী স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যারা আমাদের এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, দলমত নির্বিশেষে যারা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের ত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব স্পিকার সাহেব, আজ স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, এর সঙ্গে সঙ্গে আমি চারটি স্তম্ভকে স্মরণ করতে চাই, যে স্তম্ভকে সামনে রেখে আমাদের দেশের সংবিধান তৈরি করতে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা গণতন্ত্র দিতে চাই এবং গণতন্ত্র দিতেই আজ আমরা এই পরিষদে বসেছি। কারণ, আজ আমরা যে সংবিধান দেব, তাতে মানুষের অধিকারের কথা লেখা থাকবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ জনগণের জানমাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। এমন সংবিধানই জনগণের জন্য পেশ করতে হবে। আজ এখানে বসে চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এমন সংবিধান রচনা করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়ার সভ্য দেশের মানুষের সামনে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে। জনাব স্পিকার সাহেব, জাতির কাছে আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে, একটা বিরাট কর্তব্য আছে। আমি আমার বক্তৃতা বড় করতে চাই না। কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাদের সেই ইতিহাস আজ এখানে পর্যালোচনা না করলেও চলবে। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন নেতার কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন যেমন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, বর্বর পাকবাহিনীর হাতে নিহত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। আর কলম দ্বারা সংগ্রাম করেছেন সেই জনাব তফাজ্জল হোসেন—আমাদের মানিক ভাই। এদের কথা শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করতে চাই। স্মরণ করি ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনের সময় যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁরা কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন। গণতন্ত্রকে এদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাদের কথা যদি স্মরণ না করি, তাদের ইতিহাস যদি না লেখা হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা জানতে পারবে না এই সংগ্রামের পিছনে কারা ছিলেন।

গত বছর নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনের পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল যে, বাংলাদেশ জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের কলোনি এবং বাজার করে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার

ওপর আঘাত করছিল, আমাদের নাগরিক অধিকারের ওপর আঘাত করে আমাদেরকে কলোনি করে রাখতে চেয়েছিল। আমাদের সংগ্রাম তখন থেকেই চলছিল। আমরা জানতাম সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে আজ চরম সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। ২৫ মার্চ তারিখের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। সেইদিন বর্বর পাক হানাদার বাহিনী কোনো আইন-কানুন মানে নাই। কোনো সভ্য দেশে তাদের কাজের তুলনা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্য দেশে যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে। কোনোরূপ ওয়ার্নিং না দিয়েই অতর্কিতে কাপুরুষের মতো বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে, দুধের বাচ্চাকে পর্যন্ত হত্যা করে তারা এক জঘন্য লীলায় মেতে উঠেছিল। অর্ডার দিয়েছিল আওয়ামী লীগের লোক, যাকে পাও তাকেই হত্যা করো, কোনোরূপ দয়ামায়া নাই। তাদের জঘন্য কাজ-কারবারের এমন সমস্ত ইতিহাস আমাদের হাতে আছে, যা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের হাতে একজন জেনারেলের দস্তখত করা কাগজ ধরা পড়েছে। তাতে আছে লুটপাট করো। এমনকি পাশবিক অত্যাচারের কথাও আছে। বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙালির ওপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫ মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানলাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র । এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একই সময়ে একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো । তখন যদি আমি ভারত সরকারের বিষয়ে না বলি, তাহলে অন্যায় করা হবে। আমার দেশের জনসাধারণ যখন প্রাণভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে, ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে যায়, তখন ভারতের জনসাধারণ তাদেরকে বুকে টেনে নেয়, ভারতের জনসাধারণ, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং আসামের জনসাধারণ, বিশেষ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কারণ তারা আমাদের জনসাধারণকে বুকে টেনে নিয়েছেন

স্মরণ করি ভারতের সেনাবাহিনীর ওই সমস্ত জোয়ানদের, যাঁরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগ্রাম করেছেন। আমি স্মরণ করি রাশিয়ার জনসাধারণ ও সরকারকে, যারা নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তারা প্রকাশ্যে আমার গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বাংলাদেশে ধ্বংসলীলা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। স্মরণ করি গ্রেটবৃটেনের জনসাধারণকে, পশ্চিম জার্মানির জনসাধারণকে, জাপানের জনসাধারণকে, এমনকি আমেরিকার জনসাধারণকে যারা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। যারা যারা সমর্থন করেছিলেন, তাদের সকলকে আমাদের এই গণ-পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এমনকি জাতিসংঘে রাশিয়া তিনিটি ভেটো দিয়েছিল, তা না হলে সেখানে যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তাতে বাংলাদেশের অবস্থা কী হতো, তা বলতে পারি না। যে সমস্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ আমাদের সমর্থন দিয়েছিল, বিশেষ করে, পোল্যান্ড, তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের জনসাধারণকে আমি এই পরিষদের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং স্মরণ করতে চাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, এসব কথা বলতে গেলে ভাষা আসে না, মানুষ ভাবপ্রবণ হয়ে যায়। সে জন্য এগুলি বলা আমার পক্ষেও কষ্টকর। কারণ, আমি ভাবপ্রবণ হয়ে যাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার ছেলে পঙ্গু অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্য কিছুই করতে পারি নাই। আমাদের বাংলার গ্রামকে-গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আমাদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, আমাদের কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ রকম কত নির্যাতনই না আমাদের লোককে সহ্য করতে হয়েছে এবং তারা যে সহনশীলতা দেখিয়েছেন সে জন্য তাদের যদি আমরা মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। আর যে সমস্ত দল আমাকে সমর্থন করেছে তাদেরকেও আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই।

জনাব স্পিকার সাহেব, আমাদের সামনে আজকে বিশেষ কর্তব্য হলো জাতিকে একটা সংবিধান দেয়া এবং যতো তাড়াতাড়ি হয়, সেই সংবিধান দিবার চেষ্টা করা হবে। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনার মাধ্যমে তাদের সবাইকে বলে দিতে চাই যে, আপনারা গাছতলায় বসে যুদ্ধ করেছেন, না খেয়ে যুদ্ধ করেছেন, পরনের কাপড়ও ছিল না। আমার

সহকর্মীদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মেম্বারদের যে অধিকার পাওয়ার আছে, সে অধিকার পুরোপুরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি মাইক্রোফোন বিদেশ থেকে আনবার চেষ্টা করতাম, তাহলে তিন মাস সময় লাগত, অনেক দেরি হয়ে যেতো। এই এসেম্বলি ভবন যে অবস্থায় ছিল, তাতে মাত্র ৩০০ মেম্বারের বসার জায়গা ছিল, আজকে সেখানে ৪৫০ জন বসেছেন। যদি এই এসেম্বলি ভবনও না থাকত, তবে গাছতলায় বসেও আমার মেম্বাররা সংবিধান রচনা করতেন—এই সুনিশ্চিত আশ্বাসটুকু দিতে পারি। আজকে আমাদের জনগণ কী অসুবিধায় আছে। তাদের থাকার মতো ঘর নেই, আমরা কিছু দিতে পারছি না, মানুষ কষ্ট করছে। হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। অর্থ নাই, জনসাধারণকে সুবিধা করে দিতে পারছি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আপনার কাছে আবার বলছি যে, আমাদের সামনে কর্তব্য হলো সংবিধান তৈরি করা। আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আগামীকাল আবার বসব। শুধু যে আমাদের দলীয় সদস্য থেকে কমিটি করব তা নয়, দলমত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, জনগণকে যাতে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একটা সুষ্ঠু সংবিধান দেয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সকলের মতামত চাইব। এই সংবিধানে মানবিক অধিকার থাকবে, যে অধিকার মানুষ চিরজীবন ভোগ করতে পারে। আমরা গত তেইশ বছরে কী দেখেছি—শাসনতন্ত্রের নামে অশাসনতন্ত্র, জনগণের নিরাপত্তার নামে মার্শাল ল', জনগণের দাবি আদায়ের নামে প্রতারণা। আর বাংলাদেশের কথা উঠলেই 'হিন্দুস্থানের দালাল' এই ধরনের কথা সারা জীবন শুনে আসছি। সে সব যাতে এদেশ থেকে উঠে যায়, সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

জনাব স্পিকার সাহেব, আপনি এই পরিষদের স্পিকার হয়েছেন। আবার আপনাকে জানাতে চাই যে, আমরা একটা গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আপনি যতোক্ষণ নিরপেক্ষ থাকবেন, আমাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আপনার কর্তব্যটুকু আইন ও আপনার বিবেক অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টারি কনভেনশন মেনে নিয়ে পালন করবেন, এই আশা করি। আপনি কোন দল বড়, কোন দল ছোট, তা দেখবেন না, কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিচার ও ইনসাফ করবেন। আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা জানাব।

এখানে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, নজরুল ইসলাম সাহেব তা পড়েছিলেন, আবার সংশোধন করে তা পেশ করা হবে। আপনার মাধ্যমে আমার সদস্য ভাইদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। তারপর এসেম্বলির কর্মচারীরা রাত-দিন পরিশ্রম করে এতো তাড়াতাড়ি যে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন, সে জন্য তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি জানি তারা মাত্র কয়েক দিনের নোটিশে খুব পরিশ্রম করে এই বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন। তারপর আমি ধন্যবাদ জানাই এই রিপোর্টারদের, এখানে যারা কাজ করছেন। তারা যেন পরিষ্কার, সুন্দর করে রিপোর্ট তৈরি করেন, তাতে ভুল-ভ্রান্তি যেন না হয়, কারণ, এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে, এই ইতিহাস যেন নষ্ট না হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জনাব স্পিকার : এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব ছিল তা সংশোধনের পরে যে আকারের হয়েছে, আমি তা পড়ে শোনাচ্ছি। সংশোধিত প্রস্তাব হচ্ছে :

"বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের যে বিপ্লবী জনতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যবক, বুদ্ধিজীবী, বীরাঙ্গনা, প্রতিরক্ষা বিভাগের বাঙালিরা, সাবেক ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। আজকের দিনে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে যথাযথভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ গণপরিষদ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল এই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

স্বাধীনতা সনদের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল আজ সে সনদের সঙ্গেও এ পরিষদ একাত্মতা ঘোষণা করছে।

এক্ষণে এই পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সেই সব মূর্ত আদর্শ, যথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, যা শহীদান ও বীরদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করছে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে যারা আছেন, তারা 'হ্যাঁ' বলবেন।
সদস্যগণ : (সমস্বরে) 'হ্যাঁ)। ('না' কেহই বলেন নাই)
জনাব স্পিকার : এই প্রস্তাব গৃহীত হলো।

সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন

সংবিধানের আক্ষরিক অর্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক ও মর্মার্থে জাতির জনক। স্বাধীনতার ঘোষকের কথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কেউ তোলেননি। তার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর কেউ কেউ তুলেছেন—তবে তির্যকভাবে। সুতরাং এ-ধরনের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর হওয়া আবশ্যক। সংবিধান ঠিকভাবে পড়লে এই বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ থাকে না।

সাংবিধানিকভাবে সব সংশোধনের পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্থান ঢাকা, কাল ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। আমি সম্পূর্ণ সাংবিধানিক আলোচনার মধ্যে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। তবে তার আগে একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বলতে হয় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নেতাজী সুভাষ বসু যখন কুখ্যাত হলওয়েল স্তম্ভ অপসারণের আন্দোলন করেন সেই আন্দোলনের কর্মী হিসেবে শেখ মুজিব ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের কর্মী, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রীর পদ বরণ, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বিভিন্ন পর্যায়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ১৯৬৬ সালে তার বিখ্যাত পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধিকার ছয়দফা দাবি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে জড়ানোর প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, উক্ত মামলা থেকে মুক্তি ও জনসমাবেশে তাকে বঙ্গবন্ধু অভিধা প্রদান এবং ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের কথা মনে

রাখতে হবে। পরবর্তী ঘটনার বিবরণ আমরা মুজিবনগরে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা বা Proclamation of Indenpendence থেকে পাব যা আজকে সংবিধানের অঙ্গ হয়ে গেছে। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ডাক 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং তার পরিণামে সার্বিক অসহযোগ ও হরতালের উল্লেখ করতে হয়।

এবার সংবিধানে বর্তমান আকারে যা আছে তাই দেখা যাক, অর্থাৎ ৫ম সংশোধনীর পরেও যা দাঁড়িয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম পরিচ্ছেদে আছে :

"আমরা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

এখানে স্বাধীনতার ঘোষক কোন একজন ব্যক্তি নন বরং আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, আবার ঘোষণার তারিখ ২৭ মার্চ নয়, ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। এর অর্থ দাঁড়ায় সংবিধানে এখানে মুজিবনগরে প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এই ঘোষণার মূল বিষয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তাই মুজিবনগরে গৃহীত ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরতে হয়। প্রথমে মূল ইংরেজি, পরে তার অনুবাদ ।

ঘোষণাপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ:

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE
Mujibnagar, Bangladesh
dated 10th day of April, 1971

WHEREAS free elections were held in Bangladesh from 7th December 1971 to 17th January, 1971 to elect representatives for the purpose of framing a Constitution;

AND WHEREAS at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to Awami League

AND WHEREAS General Yahya Khan summoned the

elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing of Constitution;

AND WHEREAS the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period;

AND WHEREAS instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war;

AND WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Banddhu Sheikh Mujibur Rahman the undisputed leader of 75 million of people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dhaka on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honor and integrity of Bangladesh;

AND WHEREAS in the coduct of a ruthless and savage war pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh;

AND WHEREAS the Pakistan government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a constitution, and give to themselves a Government;

AND WHEREAS the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh;

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the

people of Bangladesh whose will is supreme, buly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, declare and constitute Bangladesh to be a Sovereign People`s Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman and

We further resolve that this Proclamation of Independence shall be deemed to have into offect from 26th day of march, 1971.

সংবিধানের প্রস্তাবের সঙ্গে মিলিয়ে ঘোষণাপত্রের তর্জমা ও ব্যাখ্যার পূর্বে বলতে হয় এই ঘোষণাপত্র বা Proclamation of Independence কে সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ৩য় অনুচ্ছেদে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। তাছাড়া এর বরখেলাফকে রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধাচরণ গণ্য করে 123A Penal code-এ দণ্ডনীয় অপরাধ ধার্য করা হয়েছে। যার প্রাসঙ্গিক অংশ হচ্ছে :

Whoever, Within or Without 1(Bangladesh), with intent to influence, or knowing it to be likely that he will influence, any person or the whole or any section of the public, in a manner likely to be prejudicial to the safety of 1(Bangladesh), or to endanger the sovereignty of 1(Bangladesh), in respect of all or any of the territories lying within its borders, shall by words, spoken or written, or by signs or visible representation, condemn the creation of 1(Bangladesh) 4(in pursuance of the Proclamation of Independence on the twenty-sixth day of March, 1971), or advocate the curtailment or abolition of the sovereignty of 1(Bangladesh) in respect of all or any of the territories lying within its borders, whether by amalgamation with the territories of neighbouring states or otherwise, shall be punished with

rigorous imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট বহু ব্যয়ে স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্রকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের একটি আকর দলিল বলে গণ্য করেছেন।

এইবার আমরা সাংবিধানিক বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যায় যেতে পারি। শুরু হচ্ছে 'আমরা' বলে আবার তারপর 'বাংলাদেশের জনগণ' বলে তার অর্থও স্পষ্ট করা হয়েছে। আমরা যে বাংলাদেশের জনগণ- আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। কবে তা করা হলো? সেটা ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। এই স্বাধীনতা ঘোষণার পরিণাম পরের বাক্যাংশে বলা হয়েছে যে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেছি। কিভাবে তা হয়েছে তাও বলা হয়েছে। সেটা হলো জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক আইনের ভাষায় বলা হয় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা।

এই সংবিধান রচিত হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদের দ্বারা যা চূড়ান্তরূপ পেয়েছে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে। তা হলে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের ঘোষণা কোথায় এবং একজন ঘোষকের কথা যে বলছি সেগুলি কোথায়? অবধারিতভাবে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার আকর দলিলে যেতে হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে Proclamation of Independence যা ঘোষিত হয় মুজিবনগরে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে—যেখানে কেবল স্বাধীনতার ঘোষণা নয়, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি ও স্বাধীনতা ঘোষণার আদি পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেটা বুঝতে হলে এই ঘোষণাপত্রের বাংলা ভাবার্থ দিতে হয়।

ঘোষণাপত্রের শিরোনাম, তারিখ ও স্থানের উল্লেখের পর বলা হয়েছে ৭ ডিসেম্বর '৭০ থেকে ১৭ জানুয়ারির নির্বাচনের কথা যার উদ্দেশ্য সংবিধান রচনা। নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯-এর মধ্যে ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে যারা আওয়ামী লীগের সদস্য; জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে সংবিধান রচনার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মেলন ডাকেন। সেই আহূত সংসদকে স্বেচ্ছাচার ও অবৈধভাবে মুলতবি করা হয়; প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে আলোচনা চলাকালে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতী যুদ্ধ ঘোষণা করে; এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন জনগণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান বাংলাদেশের জনগণের বৈধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য অধিকার পরিপূরণে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় নিয়মিত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন, এবং বাংলাদেশের জনগণকে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সংহতি রক্ষার জন্য আহ্বান জানান; পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ নৃশংস ও বর্বর যুদ্ধ চালিয়ে বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক অধিবাসীদের ওপর গণহত্যা ও বিভিন্ন প্রকার নজিরবিহীন নির্যাতন চালাচ্ছে; এই গণহত্যা নির্যাতন ও নিপীড়নের জন্য জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষে সম্মিলিত হয়ে একটি সংবিধান রচনা করে নিজেদের একটি সরকার দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে; এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জনগণ তাদের সাহস, বীরত্ব ও বৈপ্লবিক প্রবণতায় বাংলাদেশের ভূভাগে তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে;

আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের প্রদত্ত ম্যান্ডেট পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ, যে জনগণের অভিপ্রায় সর্বোচ্চ সেজন্য আমরা আমাদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করে আলাপ আলোচনা করেছি, এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানব মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে;

বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও সংগঠন করছি এবং এতদ্বারা ইতঃপূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করছি ... এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

আইনে এই প্রক্রিয়াকে লেজিসলেশন বাই রেফারেন্স বলা হয়।

আর একবার সরলার্থে বলা যায় ঘোষণাপত্রে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের জনগণ তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি অনুসারে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পত্তন করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা তখনকার সাড়ে সাত কোটি জনগণের অবিংবাদিত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করেন। এইভাবে প্রথমে জনগণ, তারপর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সবশেষে জননেতা একসারিতে যুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙালিরা জাতি বা নেশন হলো, যার অর্থ একটি ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত জনগোষ্ঠী আপন রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। একেই বলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল পার্থক্য এখানে। পাকিস্তান ভারতের মতো ইংরেজ সরকার কর্তৃক ১৯৪৭ সালের Indian Independent Act-এর মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব গণপরিষদের ওপর হস্তান্তরিত হয়ে অর্জিত হয় কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের পত্তনে। প্রতিষ্ঠা

করল বাংলাদেশের জনগণ অর্থাৎ বাঙালিরা। এই যে স্বাধীনতার প্রক্রিয়া তা ঘটনা পরম্পরায় এমনভাবে সন্নিবেশিত যে এই প্রকিয়ার মধ্যে যে একজনের নাম আসে তিনি জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম স্বাধীনতার ঘোষণাদাতা রূপে সংবিধান সন্নিবেশিত হয়ে আছে। এই সংবিধানের প্রাধ্যন্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

ঘোষণাপত্রের প্রক্রিয়ায় কয়েকটি মূল ঘটনার যে উল্লেখ রয়েছে সেগুলির মধ্যে ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, জেনারেল ইয়াহিয়ার সংসদের অধিবেশন ডেকে আকস্মিকভাবে মুলতবি ঘোষণা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলাকালে অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া আর জনগণের ওপর নির্মম, বর্বর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যা, যার প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচিত অবিসংবাদিত জননেতার স্বাধীনতা ঘোষণা—এই সব ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত আছে। তবে এর সঙ্গে ৭ মার্চের রমনার বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ডাক : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" অবশ্যই উল্লেখ হয় এই জন্য যে এই ডাকের ফলে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তা অভূতপূর্ব। এর ফলে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক অসহযোগ সূচিত হয় তাতে সামরিক স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতা সেনানিবাসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । ফল দাঁড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী দখলদার বাহিনী বা অকুপেশন আর্মিতে পর্যবসিত হয়। বস্তুত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের কালোরাত্রি পর্যন্ত শেখ মুজিবের নির্দেশে সরকার চলতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা। এই ডাক একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। কেবল ডাক দিলে তো হয় না, সেই ডাকের পিছনে ডাক দেবার ক্ষমতা বা অথরিটিও চাই। সবই ছিল শেখ মুজিবের কাছে।

এবার কালের দিক থেকে বিচার করা যাক। সংবিধানে বলা হয়েছে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল তাহলে আমরা সাংবিধানিকভাবে ২৭ বা অন্যকোনো দিনের উল্লেখ করতে পারি না। বাস্তবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১, তাহলে ২৬ মার্চ কিভাবে হয়? হয় এইজন্যে যে ঘোষণাপত্রের শেষে বলা হয়েছে যে ঘোষণাপত্র বা Proclamation of Independence ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে গণ্য করা হবে। এইভাবে ঘোষণাপত্র শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ডাকের দিনকেই সমর্থন ও অনুমোদন করে। তাহলে

সাংবিধানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার দিন আমরা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ছাড়া আর কোনো তারিখ বলতে পারি না।

স্থান সম্বন্ধে দেখতে গেলে দেখতে পাব ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয়েছে মুজিবনগরে, আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা থেকে যা ঘোষণাপত্রেই বলা আছে। সাংবিধানিকভাবে স্থানের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথমে ২৬ মার্চ তারিখে দেন শেখ মুজিব ঢাকাতে যা সমর্থিত হয় ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে। সাংবিধানিকভাবে প্রথমে ঘোষণা ঢাকায়, এর সমর্থন ও অনুমোদন মুজিবনগরে, আর কোনো স্থানের অনুপ্রবেশের অবকাশ নেই, সুতরাং চট্টগ্রাম বা অন্যকোনো স্থানের অবস্থান সংবিধানের অন্তর্গত নয়।

সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জনগণের জাতি হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা Right of Self determination এর ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার কথা দুই-ই বলা আছে। তবে আমরা পাই প্রথম অংশে ঘোষণা, দ্বিতীয় অংশে প্রতিষ্ঠার কথা আছে, আছে একটি জাতির স্বাধীন ও সার্বভৌম আত্মবিকাশের কথা। আইনে এই দুরূহ দায়িত্ব পালন করে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আর প্রতিনিধিদের মুখপাত্র হয়ে আসেন তার স্বীকৃত নির্বাচিত নেতা। এইখানে গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে জনতা ও নেতার সম্পর্ক অর্থাৎ তিনিই নেতা যিনি জনগণের আস্থাভাজন এবং আস্থাপ্রকাশের স্বীকৃত আইনগত দিক হচ্ছে নির্বাচন। সংবিধানে তাই বলা হয়েছে জনগণ অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তারা ঘোষণা দিচ্ছেন এরপূর্বে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতা অর্থাৎ জনগণের নেতা যে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন তাকে অনুমোদন করে। এইভাবে নেতা-জনতা বা জনতা-নেতা এক হয় আইনের চোখে। সুতরাং আইনের দিক থেকে যদি কোনো একব্যক্তি স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার অধিকারী হন বা লিগ্যাল অর্থরিটি যদি কারও থাকে তিনি হবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতা। আর অন্য কোনো ব্যক্তির সেই অধিকার গ্রহণের অবকাশ নেই। তা হলে সাংবিধানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষক একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমন। এর পরিপন্থী কিছু বলা সংবিধান লংঘনের শামিল।

সংবিধানের আক্ষরিক অর্থে আমরা পেলাম স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এইবার সংবিধানের মর্মার্থ বা ইংরেজিতে যাকে বলে স্পিরিট অব ল সেই অর্থে আমরা কী পাই?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল, এই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান রচয়িতাদের বলা হতো family founding fathers বা প্রতিষ্ঠাতা জনকবৃন্দ। এই রেওয়াজ বা কনভেনশন গত দু'শ বৎসর ধরে অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আমাদের বর্তমান সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধনসহ একাধিকবার স্থগিত থাকার পরও সেই ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যে প্রথম সংবিধান রচিত হয় তা আজও বলবৎ আছে, এবং দ্বাদশ সংশোধনীর পর কাঠামোগতভাবে প্রায় ১৯৭২ সালের অসংশোধিত সংবিধানের অবস্থায় ফিরে গেছে।

এই সংবিধান রচিত হয় যে গণপরিষদের দ্বারা এর সদস্যরা হচ্ছেন ১৯৭০ সালে ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং এঁরাই ১০ এপ্রিল '৭১ সালে মুজিবনগরে নিজেদের গণপরিষদ গঠন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সঙ্গে আমরা আগেই দেখেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণাকে অনুমোদন করেন। সবদিক থেকে এই গণপরিষদের সদস্যবৃন্দকে প্রতিষ্ঠাতা জনক বলা যায়। আবার এই প্রতিষ্ঠাতা জনকবৃন্দের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রথমে নির্বাচনের সময়ে আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে তিনি নির্বাচিত সদস্যদের নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে Proclamation of Independence এর বলে প্রেসিডেন্ট ও সংবিধান রচনার সময়ে প্রধানমন্ত্রীরূপে এই ফাউন্ডিং ফাদারদের নেতা। সংবিধানের মর্মার্থে তিনি জাতিরজনক। আজকাল অনেকে এমন কী যারা তাঁর কঠোর সমালোচক তাঁরাও শেখ মুজিবকে ফাদার অব নেশন বা জাতির জনক বলছেন। তাহলে সংবিধানের আক্ষরিক অর্থে একদিকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক, মর্মার্থে পাচ্ছি তিনি ফাউন্ডিং ফাদারদের নেতা। দুটোকে জড়িয়ে আমরা পাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুজিবনগর সরকার

আবুল মাল আবদুল মুহিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বস্তুতপক্ষে রেসকোর্স ময়দানের ৭ মার্চের জনসভায়ই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। একে একটি শর্তসাপেক্ষ স্বাধীনতা ঘোষণা বলে বিবেচনা করা যায়। তিনি পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে বলেন। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়াকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে বলেন। একই সঙ্গে তিনি বাঙালিদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন, প্রত্যেক বাড়িতে একটি দুর্গ বানাতে এবং সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে তাদের বলেন। তিনি আরও বলেন; ভবিষ্যতে তিনি যদি নির্দেশ দেয়ার জন্য উপস্থিত না থাকেন তাহলে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তিনি এই বিরাট জনসভায় তার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন—এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টাই চলছে; বাঙালিরা বুঝে-সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে; প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং আপনাদের যা কিছু আছে; তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি; আরও রক্ত দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম; জয় বাংলা।

২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু তার সব সহকর্মীকে সরে যেতে বলেন এবং আন্দোলনকে চালু রাখতে নিদেশ দেন। তিনি নিজে স্বগৃহে হামলাকারীদের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। নিরাশায় মধ্যেও তার আশা ছিল; তাকে গ্রেফতার করে প্রতিপক্ষ ক্ষ্যান্ত দেবে এবং হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করবে। সময়ে আলোচনার মাধ্যমে হয়তো দুই দেশ বিভক্ত হবে। যে ট্রাডিশনে তার রাজনৈতিক বিকাশ ও মনমানসিকতা সৃষ্ট তাতে এছাড়া অন্যরকম কোনো ভাবনার অবকাশ ছিল না। তিনি কখনও সশস্ত্র বিপ্লবী ছিলেন না তিনি ছিলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। কিন্তু পাকিস্তানের বর্বর দস্যু দল যখন হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হলো এবং ধ্বংসলীলা শুরু করল তখন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রত্যুত্তর ছিল মুক্তিযুদ্ধ। এতে সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী

যোগ দিলে এই প্রতিরোধের গতিকে আর কোনো মতেই স্তিমিত করার সুযোগ থাকল না। ট্যাঙ্ক এবং কামানের হামলায় ঢাকা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ২৫ মার্চেই শহরটি সারাবিশ্ব ও সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু দেশের অন্যত্র অবস্থা এরকম ছিল না। অনেক জেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নামেমাত্র অবস্থানে ছিল। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর ছাউনিতে বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রামে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সাহায্যে জনতা প্রাথমিক পর্যায়ে শহরটিকে পাকিস্তানি হামলামুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। সেই সুযোগে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ সম্পাদক এম এ হান্নান সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পড়ে শোনাতে সক্ষম হন। এই ঘোষণার পরই বিমান হামলায় বেতার কেন্দ্রটি স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কয়েকজন উদ্যোগী নেতাকর্মীর প্রচেষ্টায় সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্ম হয়। বেলাল মোহাম্মদ; আবুল কাশেম সন্দ্বীপ; হাবিবুদ্দিন আহমদ; আবদুল্লাহ আল ফারুক এবং আমিনুর রহমান কালুরঘাট ট্রান্সমিশন স্টেশন থেকে বেতার সম্প্রচার শুরু করেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আবুল কাশেম সন্দ্বীপ হান্নানের পঠিত বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণাটি বারবার প্রচার করতে থাকেন। পরের দিন ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাটে তার সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। বেতারকর্মীরা এই বিদ্রোহী সেনানায়ককে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করতে আহ্বান জানান। মেজর জিয়া ঘোষণা করে বসলেন; তিনিই অস্থায়ী সরকার প্রধান এবং তিনি ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সারাবিশ্বের সমর্থনের আবেদন জানান। এই ঘোষণায় কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়—এটা কি জনগণের মুক্তিযুদ্ধ না এক সেনানায়কের বিদ্রোহ, এটা কি বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, না অন্যকানো নেতার ইচ্ছা । অবশ্য পরে ২৮ মার্চ মেজর জিয়া আবার একটি বেতার ঘোষণায় পরিষ্কার করে জানালেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার সমর্থনে তার সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করেছেন, তিনি বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী নেতা। তিনি আরও বললেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশকে এই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের আবেদনও তিনি পেশ করলেন। আবারও তিনি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন দাবি করলেন। বেতার কর্মীদের ইতোমধ্যে একটি দশজনের দল গঠিত হয়, পূর্বোক্ত পাঁচজন ছাড়া আরও ছিলেন রাশেদুল হোসেন ও শারফুজ্জামান, সৈয়দ আবদুস

শাকের; মুস্তাফা মনোয়ার এবং রেজাউল করিম চৌধুরী—পাঁচজন প্রকৌশলী এবং পাঁচজন অনুষ্ঠান বিভাগের। ২৯ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রতিরোধ আন্দোলনকে সংহত করতে বিশেষ অবদান রাখে। প্রতিরোধকারীরা একটি লক্ষ্যের সন্ধান পেল। তবে এই ঘোষণাকে বলবৎ করার জন্য প্রয়োজন পড়ে একটি রাজনৈতিক কাঠামোর। বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনের সংহতির জন্য দরকার ছিল একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড পরিষদ দ্বারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের সুযোগ ছিল খুব সীমিত। এই কমান্ড পরিষদকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী বলে বিবেচনা করতে খুব অসুবিধা ছিল না। ইতোমধ্যে বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করা হয়। শেখ মুজিব জনগণের নেতা, তাকে নির্বাচন করে দেশের ৮২ শতাংশ ভোটদাতা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একটি রাজনৈতিক সরকার। ছয় সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন একান্তই তাজউদ্দিন আহমেদের উদ্যোগে ও বুদ্ধিতে হয়। একটি প্রতিনিধিত্বশীল ও দায়িত্বশীল যৌথ নেতৃত্ব ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা এবং এর জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। পদদলিত ও শৃঙ্খলিত বাংলাদেশে মানুষের আশাকে জাগিয়ে রাখার জন্যও প্রয়োজন ছিল একটি সরকারের, হোক না তা দেশের ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত ও বিতাড়িত । তাজউদ্দিন আহমেদ ২ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লিতে ছিলেন এবং তখনই ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ পাকাপোক্ত করেন। তিনি দিল্লিতে থাকাকালেই অস্থায়ী সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং সম্ভবত এই বিষয়ে শ্রীমতি গান্ধীকে অবহিত করেন।

মুক্তিযুদ্ধ স্থায়ী ছিল মাত্র নয় মাস কিন্তু সহসা তা ঘটে যায়নি। এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতি ছিল বহুদিনের। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও রক্তক্ষরণের মধ্যে হয় এর প্রত্যক্ষ সূচনা । বিভিন্ন নেতিবাচক উপাদান ক্রমে ক্রমে জাতিসত্তার উন্মেষকে করে অপরিহার্য। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক বনিবনার অভাবই দুই অঞ্চলের মধ্যে ঔপনিবেশিক সম্পর্কের সুযোগ করে দেয়। বাঙালির কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও অর্থনীতি দলন ও শোষণের প্রক্রিয়া দুই অঞ্চলকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয়দফা হয় বাঙালি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সনদ। ছয়দফা আন্দোলন একদিকে যেমন বাঙালি রাজনৈতিক অঙ্গনে মতৈক্য নিয়ে আসে, অন্যদিকে তেমন একটি অনমনীয় ও অকুতোভয় মানসিকতা সৃষ্টি করে। ছয়দফা-ভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক

অবস্থানকে বানচাল করে দেওয়ার পাকিস্তানি উদ্যোগই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে। ১৯৭১-এর ১ মার্চ গণপরিষদ অধিবেশনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিয়েই জেনারেল ইয়াহিয়া বাঙালি প্রতিরোধ শুরু করে দেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একধরনের শর্তাধীন স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। একসঙ্গে থাকতে গেলে চারটি দাবি মানতে হবে, অন্যথায় বাঙালি যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে নেমে পড়বে। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সমঝোতার পথ পরিহার করে শঠতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পৈশাচিক সামরিক অভিযান শুরু করে। বঙ্গবন্ধু তার সহকারীদের সরে পড়তে বলে নিজে অপেক্ষা করে রইলেন তার আক্রমণকারীদের জন্য। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অভ্যস্ত জননেতার এই ছিল স্বাভাবিক আচরণ। পাকিস্তানি আক্রমণে কিন্তু কোনো সদিচ্ছার স্থান ছিল না, তারা বন্দুকের জোরে বাঙালিকে সম্পূর্ণ পদানত করতে ব্রতী হয়। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর মার্চের দিক নির্দেশনাই হয় সারাদেশের আশ্রয়। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে তারা সর্বত্র শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মার্কিন সরকারি সূত্রে তখনই জানা যায়, বঙ্গবন্ধু ধরা পড়ার আগে চট্টগ্রামের উদ্দেশে স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু সে বার্তা প্রেরণ ছিল শুধু একটি লৌকিকতা। বাংলাদেশের সর্বত্র শুধু চট্টগ্রামে নয়, ২৫ মার্চ রাতেই প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। শেখ মুজিব শত্রুদের হাতে বন্দি থাকলেও তাকে ছাড়া কাউকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে চিন্তা করা ছিল অসম্ভব। তিনি ছিলেন বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক এবং বাঙালি আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। জাতির অনিশ্চয়তাকালে তার নামেই প্রতিরোধ চলতে পারত। তার নামেই মুক্তিযুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমর্থন দাবি করতে পারত। জীবিত অথবা মৃত, স্বাধীন অথবা বন্দি—তিনিই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিভূ। তাই তিনি হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রথম সহ-সভাপতি ও সংসদীয় দলের উপনেতা। শেখ মুজিব ১৯৬৬ সাল থেকে তিন বছর যখন একনাগাড়ে কারাবন্দি ছিলেন তখন সৈয়দ নজরুল ইসলামই দলটিকে নেতৃত্ব দেন ও টিকিয়ে রাখেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তিনি স্বাভাবিকভাবেই হলেন দেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি ছিলেন দলের প্রধান সংগঠক, পরিকল্পনাকারী এবং নেতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রয়োগবাদী এবং সুদক্ষ প্রশাসক। অসহযোগ আন্দোলনের বাস্তব পরিচালনা ছিল তারই হাতে ন্যস্ত। তাকে ছাড়া অন্য কারও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব

পালনের প্রশ্নই ছিল না। এছাড়া অন্য তিনজন মন্ত্রী ছিলেন দলের প্রথম সারির নেতা। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা এবং প্রাদেশিক পরিষদে দলীয় নেতা। আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালে যখন প্রাদেশিক সরকার গঠন করে তখন তিনি ছিলেন একজন মন্ত্রী। এএইচএম কামরুজ্জামান ছিলেন একজন ঝানু সাংসদ এবং আইউব আমলে জাতীয় সংসদে তিনি ছিলেন খুবই সক্রিয় এবং সুবক্তা। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের উঁচু কাতারের প্রচারবিদ। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। খন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন দলের একজন সহ-সভাপতি এবং পুরনো কর্মী। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন। এদের সমকক্ষ অন্যকোনো নেতা আওয়ামী লীগে ছিলেন না। তাজউদ্দিনের বিচারে গঠিত এই মন্ত্রিসভায় কারও আপত্তি করার সুযোগ ছিল না।

দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তন করে ৮ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদ কলকাতায় বাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনেকে নিজে থেকেই কলকাতায় পাড়ি দেন। এই আলোচনা সভায় যুব নেতৃবৃন্দ কঠোরভাবে তাজউদ্দিনের বিরোধিতা করেন। শেখ মনি প্রবাসী সরকারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে মোটামুটি ঐকমত্য হলেও প্রধানমন্ত্রী কার হওয়া উচিত এ নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরদিন তাজউদ্দিন আহমেদ অন্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের খোঁজে বেরুলেন। ইতোমধ্যে অনেকে আগরতলায় সমবেত হয়েছেন বলে জানা যায়। এদেরে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সহায়তায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। নেতবৃন্দের বৃহত্তর সমাবেশে ১১ মার্চ অবশেষে মন্ত্রিসভা নিয়ে ঐকমত্য হলো। মন্ত্রিদের দায়িত্ব নতুন করে বণ্টন করা হলো এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে যথেষ্ট ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা হলো। একই সঙ্গে সব নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সমবেত করার একটি উদ্যোগ নেয়া হলো। ইতোমধ্যে সিলেট, কুমিল্লা ও আগরতলার সঙ্গমস্থলে একটি মোবাইল ট্রান্সমিটার স্থাপন করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সচল হয়ে উঠেছে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এই বেতার কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছেন। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এর প্রচারই তাদের বুকে আশা জাগায়, তাদের সাহস দেয়। এর মাধ্যমেই মুক্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অঙ্গনের খবর পায়। এই বেতার কেন্দ্র থেকে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সব নির্বাচিত সদস্যকে আগরতলার অথবা মেহেরপুর সীমান্তে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ১৩ এবং ১৭

এপ্রিলের মধ্যে মোট ৪৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি কুষ্টিয়া সীমান্তে সমবেত হয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা গ্রহণ করেন। এতে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ঘোষিত স্বাধীনতা বাণী সত্যায়িত করা হয়। (স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পরিশিষ্ট-৮ এ প্রদত্ত) এই ঘোষণায় বলা হয় যে, যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিরত থাকে, পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবিধান রচনা করতে দেয়নি এবং শঠতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও গণহত্যা চালায়, তাই বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশেৎর স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন এবং একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছেন। দিনাজপুরের সাংসদ প্রফেসর ইউসুফ আলীকে এই ঘোষণা প্রকাশের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত পটেনশিয়ারি নিযুক্ত করা হয়। এই ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতিকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি করা হয়। এই ঘোষণা যেসব নির্বাচিত সদস্য পাকিস্তানি হামলা এড়াতে সক্ষম হন তাদের সবাই সমর্থন করেন। জুলাইয়ের শুরুতে এই ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী ছিলেন ১২১ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং ২২৯ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। মন্ত্রিসভার ঘোষণা দেওয়া হয় ১৩ এপ্রিল এবং এর লৌকিক অভিষেক হয় ১৭ এপ্রিল। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয় মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে এবং এই স্থানের নামকরণ হয় মুজিবনগর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি প্রায় দু'শ বছরের পুরনো মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের (১৯৭৬) ধাচে প্রণয়ন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই

কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান

বাঙালি জাতিকে শাসন ও শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম এবং যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন অনেকে। অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করেছেন বাঙালি জাতির অনেক বীর সন্তানেরা। ১৯৪৭ এ পাকিস্তান স্বাধীন হলেও বাঙালির কোনো লাভ হয়নি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ এর দীর্ঘ ২৩ বছরের "স্বাধীনতা সংগ্রাম" এবং ১৯৭১ এর বীরত্বপূর্ণ "মুক্তিযুদ্ধের" সিঁড়ি বেয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা অর্জন করি আমাদের হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত" স্বাধীনতা।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বাধীনতার স্থপতি, স্বাধীনতার ঘোষক ইত্যাদি বিষয়ক ঘটনাগুলো ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্য। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অতি সহজে হঠাৎ করে আসেনি। স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে যে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে তা শুধু আমাদের দেশবাসীরই জানা নয়, বিশ্ববাসীও তা ভালোভাবে জানে। সুতরাং এ বিষয়গুলো নিয়ে নতুন কিছু লেখা সম্ভব নয়, তবে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি। ২০০১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী চার দলীয় বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বাধীনতার ঘোষক, জাতির জনক ইত্যাদি বিষয়ে নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা চালিয়েছে, নতুন প্রজন্মের কাছে মিথ্যা তথ্য তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। এ অবস্থা কোনো সচেতন নাগরিকের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয় বিধায় আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই যে আমাদের "জাতির জনক" এবং স্বাধীনতার ঘোষক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ১২টি তথ্য তুলে ধরছি।

১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা একদিনে বা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণার মাধ্যমেই আসেনি। '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে বিজয়, '৫৮-এর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৬২-এর গণবিরোধী হামিদুর রহমানের শিক্ষা

কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফার আন্দোলন, '৬৯-এর গণআন্দোলন এবং '৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রামের পথ বেয়ে সমগ্র জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। সবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ দীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের নেতৃত্বে ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক নেতা। তবে এনাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুই এ সংগ্রামে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। বিশেষ করে ১৯৬০-১৯৭০, এ দশ বছরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই এ সংগ্রাম তার সঠিক লক্ষ্যে (স্বাধীনতা) পৌঁছে । ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চে তৎকালীন পাকিস্তানে এমন কোনো ব্যক্তি সম্ভবত ছিলেন না যিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে চিনতেন না। শুধু তৎকালীন পাকিস্তান কেন, ১৯৭১ এ আমাদের উপমহাদেশসহ বিশ্বে যারা রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন তারা সকলেই বাঙালি জাতির নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকেই জানতেন। সুতরাং বাঙালি জাতির জন্মলগ্নেই এ জাতির জনক হিসেবে বঙ্গবন্ধুকেই সবাই চিনতেন। আজ এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ হলো একটি অন্যতম মাইলফলক। এ ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য "মুক্তিযুদ্ধের" ডাক দিয়েছিলেন এবং এ যুদ্ধ কিভাবে করতে হবে তার সুচারু দিক-নির্দেশনাও দিয়েছিলেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল", "তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিল করতে হবে", "জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিতে নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দিবে", "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব" এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ" "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধুর এ নির্দেশাবলি ৭ই মার্চ '৭১ এর পর থেকেই সকল বাঙালির হৃদয়ে ধ্বনিত হয়েছে, আজও এবং যুগযুগ ধরে প্রকৃত বাঙালির হৃদয়ে ধ্বনিত হবে। জাতির জনক ৭ মার্চ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ১৮ দিন আগেই বাঙালি জাতিকে এবং এ জাতির সকল পর্যায়ের নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, এ যুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং সামরিকভাবে এ

যুদ্ধ কিভাবে করতে হবে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের কৌশলগত (স্ট্রাটেজিক) এবং রণকৌশল (টেকনিকেল) সহ সকল দিক নির্দেশনাই দিয়েছিলেন। একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হতে পরিস্কার নির্দেশনার দরকার এবং ৭ মার্চের পরে ঘটনা এতো দ্রুত এগোবে যে পরে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার উপযুক্ত সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। জাতির জনকের ৭ মার্চের ভাষণের পরপরই ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে বাঙালি জাতি একতাবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করেছিল। পাকিস্তানিদের সাথে অসহযোগ সহ সকল সরকারি কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই বাংলাদেশ তখন চলত। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ না করানোর মতো সাহস দেখাতে পেরেছিলেন।।

৩) বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে অর্থাৎ রাত ১২টা ২০ মিনিটে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) (আজকের বিডিআর) এর বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে "স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন যা আজ ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণিত। এর সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও অটুট (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র—৩য় খণ্ড)। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল নিম্নরূপ :

This may be my last message, from to-day Bangladesh is independant. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last, your fight go on until the last soldier of the pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved" (অনুবাদ—সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যাই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ২৬ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা অনেকেই শুনেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা শুনেছিলেন তৎকালীন ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ পদাতিক ডিভিশনে কর্মরত আই এস পি আর (ISPR) এর

পরিচালক ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালেক। তিনি তার "উইটনেস টু সারেন্ডার" বইয়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "When the first shot had been fired, `the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, sounded like, a prerecorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh.`

অনেকেই ২৬ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক দেয় "স্বাধীনতার ঘোষণা" শুনেছেন এবং এ ঘোষণা অনুযায়ী তাদের কর্তব্য পালন করেছেন।

৪। স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়াও বঙ্গবন্ধু ২৫-২৬ মার্চ রাতেই টেলিফোনের মাধ্যমে আরও একটি ঘোষণা বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় এবং বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘোষণাটি নিম্নরূপ ছিল :

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এ যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নেই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। "জয় বাংলা"। এ ঘোষণা অনুযায়ীই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামরিক নেতৃবৃন্দ, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার নেতৃবৃন্দ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং সকল স্তরের জনগণ ২৬ মার্চ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে।

৫) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ দিবাগত রাতে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে পুরোপুরি দোষারোপ করে বলেছিলেন "Sk. Mujib has declared independence of East Pakistan. He is a traitor. This time he will not to unpunished"

(শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সে একজন দেশদ্রোহী। এবার সে শাস্তি এড়াতে পারবে না।) ২৭ মার্চ ৭১ তারিখে লন্ডন থেকে প্রকাশিত The Daily Telegram পত্রিকার প্রথম পাতায় নতুন দিল্লি থেকে তাদের সাংবাদিক ডেভিড লোমাক এর পাঠানো সংবাদের ভিত্তিতে Civil War in East pakistan. Sheikh a traitor, says President শিরোনামে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা লেখা হয়। সুতরাং ২৫-২৬ মার্চ, '৭১ এর রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুকেই পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট দোষারপ করেছিলেন। এছাড়াও অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং ইতিহাসবিদ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা নিজ কানে অথবা অন্যের মারফত শুনেছেন এবং তা তাদের বইতে, প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৬) ২৫-২৬ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু "স্বাধীনতা ঘোষণা" বিশ্বের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ২৭ মার্চ ১৯৭১ এ তাদের পত্রিকার হেড লাইনে প্রকাশ করেন। নীচে লন্ডন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি জনপ্রিয় পত্রিকা/সংবাদ মাধ্যমের উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

ক) The Times পত্রিকার ২৭ মার্চের হেড লাইন ছিল "Heavy fighting as Sheikh Mujibur Rahman declares E. pakistan independence" (অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করায় সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে)

খ) Financial Times পত্রিকার ২৭ মার্চের হেড লাইন ছিল "Civil War after East pakistan declare independence" এ শিরোনামে নীচে লেখা ছিল শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা দিলে সেখানে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

গ) The Guardian, The Daily Telegram, BBC সহ বিশ্বের প্রায় সকল পত্রপত্রিকা এবং খবর মাধ্যমে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার খবর প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়। সুতরাং ২৫-২৬ মার্চ, '৭১ এর রাতের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন তা বিশ্ববাসীর কাছেও সত্য বলে প্রমাণিত।

৭) বঙ্গবন্ধু "স্বাধীনতার ঘোষণা" সম্বলিত টেলিগ্রাম পেয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা বিভিন্ন মাধ্যমে সে নির্দেশ বিভিন্ন বাহিনী/সংস্থা এবং সকল স্তরের জনগণের নিকট তা পৌঁছে দেন এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর

বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। একই ধারায় ২৬ মার্চ বিকেল এবং ২৭ মার্চ সকালে চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ বিকেলে এবং ২৮ মার্চ সকালে তৎকালীন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানও বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ, '৭১ এ প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণার নির্দেশের আলোকে এবং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের অনুরোধে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন যা ছিল নিম্নরূপ :

"The Government of the Sovereign State of Bangladesh on behalf of our Great Leader, the Supreme Commander of Bangladesh sheikh Mujibur Rahman. We hereby proclaim the independence of Bangladesh and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur is the sole leader of the elected representatives of Seventy Five Million People of Bangladesh, and the Government headed by him is the only legitimate government of the people of the Independent Sovereign State of Bangladesh, which is legally and constitutionally formed, and is worthy of begin recognized by all the governments of the World. I therefore, appeal on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman to the Governments of all the democratic countries of the World, specially the Big Powers and the neighburing countries to recognize the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awaful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan ..... the legally elected representatives of the majority of the people .... . The guiding principle of a new state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enmity to none. May Allah help us. Joy Bangla" (মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, মেজর জেনারেল এম এস ভূঁইয়া) । মেজর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ চট্টগ্রাম

অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার এবং জওয়ানদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এসবই ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

৮) জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম, পিএসসি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি জেড ফোর্সের সফল অধিনায়ক, পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ব্রিগেড অধিনায়ক, সহকারী সেনাপ্রধান ছিলেন। ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মুশতাক সরকার তাকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। ১৯৭৫ এর শেষে দেশে সামরিক শাসন জারী হলে তিনি প্রথমে সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পরে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। শেষে তিনি 'গণভোটের' মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন এবং ১৯৮১ তে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। তার জীবদ্দশায় তিনি স্বাধীনতার ইতিহাস, জাতির জনক, স্বাধীনতার ঘোষক ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করেন নাই বরং ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ "দৈনিক বাংলা" পত্রিকায় তার লিখিত "একটি জাতির জন্ম" প্রবন্ধে তিনি বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক, স্বাধীনতার স্থপতি, স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে তার মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। অবাক লাগে জেনারেল জিয়া নিজে যা স্পষ্টভাবে লিখে এবং বিশ্বাস করে গেছেন, তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি আজ তা অস্বীকার করে জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে এবং জেনারেল জিয়াকেও বিতর্কিত করেছে।

৯) আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই এ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের জনগণ এবং ১৯৭০ এ নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ ১৭ই এপ্রিল '৭১ এ যে প্রবাসী সরকার গঠন করেন তাতে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তার নেতৃত্বেই এ সরকারের সকল কর্মকাণ্ড এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় যা ঐতিহাসিক সত্য। আমাদের "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে"ও (যা আমাদের সংবিধানের একটি অংশ) ২৬ মার্চ '৭১ এ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঢাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি: "যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯৭১ সালের ৩

মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহুত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং যেহেতু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের অনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের উদাত্ত আহ্বান জানান ...'' (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র)। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মরহুম ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ১৯৯৫ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হিসেবে অস্বীকার করা সংবিধান লঙ্ঘন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীন বাংলাদেশের মূলভিত্তি। একে শুধু সংবিধানের অংশ বললে খাটো করে দেখা হবে। মূলত এই ঘোষণাপত্রকে অস্বীকার করা স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করার শামিল। ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে লেখা আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। এই ঘোষণা অস্বীকার করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে অবমাননার তুল্য। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ''সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন একইভাবে বলেছেন বঙ্গবন্ধুই যে স্বাধীনতার ঘোষক এ সত্য সাংবিধানিক, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এটা কেউ অস্বীকার করলে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২৩ক(১) অনুসারে তার জরিমানাসহ ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।''

১০) ১৯৭৫ এ গৃহীত আমাদের সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর ৩৪ (খ) অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুকে ''জাতির পিতা'' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৫ হতে আজ পর্যন্ত অনেকগুলো নির্বাচিত, অনির্বাচিত এবং সামরিক সরকার এবং নির্বাচিত জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে। এ সব সরকার জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আমাদের সংবিধানে পঞ্চম থেকে চতুর্দশ অর্থাৎ দশটি সংশোধনী এনেছেন। এ সব সংশোধনীর মাধ্যমে ৪র্থ সংশোধনীর অনেক বিধানই রহিত করা হলেও ৩৪(খ) অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে উল্লেখ করার বিধান রহিত করা হয় নাই। এ রহিত না করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে ১৯৭৫ থেকে আজ

পর্যন্ত সকল সরকার এবং জাতীয় সংসদ বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকার করেছেন।

১১) সরকারিভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণ এবং এ সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণের জন্য ১৯৭৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ''মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন এবং মুদ্রণ'' নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। নয় সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবির এবং সদস্য সচিব ছিলেন জনাব হাসান হাফিজুর রহমান। গবেষণা শেষে সরকার কর্তৃক ১৯৮২'র নভেম্বর মাসে ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র'' নামে ইতিহাস ষোল খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময় থেকে শুরু করে জেনারেল এরশাদের সময় পর্যন্ত এ প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত থাকার পর এ ইতিহাস প্রকাশিত হয়। এ দলিলেও বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক এবং স্বাধীনতার ঘোষক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১২) ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনও প্রধানমন্ত্রী এবং কখনও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় জাতীয় সংসদে সংসদ সংস্যগণ বক্তব্য রেখেছেন। তাদের সকলেই বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৭২-এ আমাদের সংবিধান প্রণীত হয় এবং ০৪ নভেম্বর ১৯৭২ তা তৎকালীন গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এ সংবিধান পাস করা উপলক্ষে দেয় বিভিন্ন সংসদ সদস্যদের ভাষণও আমি সংসদ পাঠাগারে পড়েছি। তারা বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু

আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে দখলদার পাক হানাদার অভিযানের সাথে সাথেই তার গ্রেফতারের আগে তিনি ওয়ারল্যাসযোগে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও জেলা প্রশাসনসমূহের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রেরণ করেন এবং জনগণের প্রতি প্রতিরোধ যুদ্ধের আহ্বান জানান। এ রকম একটি বার্তা হস্তগত হওয়ার পর চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম এ হান্নান তা ২৬ মার্চ ১৯৭১ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ : "এটা সম্ভবত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আপনাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে যেভাবে পারেন শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীকে প্রতিহত করতে আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত না হওয়া এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের লড়াই অবশ্যই চলতে থাকবে।" (বাংলা অনুবাদ)

ঘোষণাটি প্রেরিত হয়েছিল ইংরেজিতে সাবেক ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে। এর স্বীকৃতি রয়েছে জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে স্থপতি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সংগৃহীত দলিলপত্রে। অর্থাৎ এটা সরকারি স্বীকৃতি। কেবল তাই নয়, সাংবিধানিকভাবেও বঙ্গবন্ধুকেই স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ১০ এপিল ১৯৭১ মুজিবনগরে গণপরিষদ কর্তৃক জারিকৃত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (The proclamation of independence order of Bangladesh dated 10th day of April 1971) বঙ্গবন্ধুই যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ঘোষণাপত্রের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "I ... Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman. The undisputed leader of 75 million people of Bangladesh. In due

fulfillment of the Legtitimate right of self determination of the people of Bangladesh duly made a declaration of independence at dhaka on March 26N 1971 ..."

অর্থাৎ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সঠিক প্রতিপূরণের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। উক্ত ঘোষণাপত্রের ১৩ অনুচ্ছেদে আবারও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ Declare and constitute Bangladesh to be a sovereign people republic of independence already made by Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman (অর্থাৎ তদানীন্তন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, যারা উক্ত তারিখে গণপরিষদ গঠন করেছিলেন) "বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করছি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোমধ্যে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি সংবিধানেরই অংশ। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের উদ্বৃতি দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। "চতুর্থ তফসিল (১৫০ অনুচ্ছেদ) ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি :" ৩ (১) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে এই সবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোনো আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীনে অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইন অনুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।"

এখন আমরা দেখব সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদে কী বলা হয়েছে : "১৫০ এই সংবিধানের অন্যকোনো বিধান সত্ত্বেও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে আমাদের পবিত্র সংবিধান বঙ্গবন্ধুকে তাঁর যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছে। ০২-০৬-৯৪ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক মন্তব্য করেছিলেন—"স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি সংবিধানের অংশ"। একই তারিখে এই দৈনিকের সাথে সাক্ষাৎকারে সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন ও ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ বলেন—"বঙ্গবন্ধুই যে স্বাধীনতার ঘোষক এই সত্য সাংবিধানিক। এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।"

দৈনিক জনকণ্ঠ থেকে এ প্রসঙ্গে আরও উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"এই দু'জন সংবিধান বিশেষজ্ঞই আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ অনুসারে উল্লিখিত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি সংবিধানের অন্যান্য যে কোনো বিধানাবলির মতো মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আইনের চোখে কেউ একে স্বীকার না করলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কেই অস্বীকার করা হবে। এটি বাংলাদেশের সৃষ্টির মূল সনদ।"

ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে জনকণ্ঠে লেখে যে "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাথে সংবিধানের অন্য কোনো বিধানাবলির কোনো অসঙ্গতি থাকলে বাতিল বলে গণ্য হবে।"

বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর ঘোষক হিসাবেও বঙ্গবন্ধুকে দেয়া হয় সাংবিধানিক স্বীকৃতি। আজ পর্যন্ত সংবিধানের সংশোধন করা হয়েছে বারবার। দীর্ঘ সামরিক শাসনকালে সামরিক ফরমানেও জারি হয়েছে অসংখ্য। কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বৈধ ও অবিকৃত থেকে গেছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে বঙ্গবন্ধুর নাম সংবিধান থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা কখনও হয়নি বা সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ তথা চতুর্থ তফসিলের ৩(১) অংশটি বাতিল করা হয়নি। মোটকথা, সাংবিধানিকভাবেই বঙ্গবন্ধু শব্দটি এবং বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষক এই তথ্যটি আজও একটি স্বীকৃত সত্য। এখন আর তা বাতিল করার বা সংশোধন করার অবকাশ নেই। অতএব, বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হিসেবে অস্বীকার করা সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল। সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সংবিধানকে 'বাংলাদেশের জনগণ অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষণাকারী, অন্য কেউ নন।

সংবিধান ও সংবিধানে অনুমোদিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের অভিপ্রায়ের অবমাননা তথা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নিন্দা করা যা প্রচলিত আইনে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ১২৩ক(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কথাবার্তা, ইঙ্গিতে বা লেখায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাইরে অবস্থান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও ভৌগোলিক সীমারেখা লঙ্ঘন এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

(Proclamation of Independence) অনুসারে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নিন্দা অথবা বাংলাদেশকে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত করার প্ররোচনা দেয় তবে তার জরিমানাসহ দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

এই দণ্ডবিধি অনুযায়ী কথায় বা লেখায় যদি বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে অস্বীকার করে বা বঙ্গবন্ধুর স্থলে অন্য কারো নাম ব্যবহার করা হয় তবে তা হবে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এ জন্য উক্ত অপরাধকারীর জরিমানাসহ দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

জিয়াউর রহমান জীবিত থাকতে কখনও নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেননি। তিনি ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। এটাই ইতিহাস এবং এভাবেই তার ভূমিকা বর্ণিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ক্রমাগতভাবে লেখা ও কথাবার্তার মাধ্যমে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উপস্থাপিত করে আসছে। কেবল তাই নয়, জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণাকে তারা মনগড়াভাবে ২৬ মার্চে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এখানে আমি দুটি সরকারি প্রকাশনার উল্লেখ করতে চাই । প্রথমটি হচ্ছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ইংরেজি জীবনী গ্রন্থ Begum Khaleda Zia Prime Minister of The Peoples Republic of Bangladesh এটি প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দফতর। এই পুস্তিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম প্যারায় লেখা হয়েছে—"It was president Zia. Then a Major in the Pakistan Army. Who proclamed the independence of Bangladesh from a make shift clandestine radio station of 26th March. 1971." (প্রেসিডেন্ট জিয়া, যিনি তখন পাকিস্তান আর্মিতে একজন মেজর ছিলেন, একটি গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন)।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি হচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৫ সালের ডায়েরি। এর ইংরেজী বিবরণী অংশের ৪ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রয়েছে—"The declaration of independence of Bangladesh on 26th March 1971 by Ziaur Rahman" (জিয়াউর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা)। দুটোই বিএনপি সরকারের প্রকাশনা এবং তা দেশে-বিদেশে বিশেষ করে বিদেশে বহুলভাবে প্রচারের জন্য মুদ্রিত হয়েছে।

এই প্রকাশনা দুটিতে কেবল তথ্য, তত্ব ও ইতিহাসেরই বিকৃতি সাধন করা হয়নি, উপরন্তু সংবিধানেরও চরম লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং অস্বীকার করা হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে তথা বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে। প্রথমোক্ত পুস্তিকাটি প্রধানমন্ত্রীর জীবনী। অর্থাৎ এটি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অনুমোদন করেছেন বলে ধরে নেয়া যায়। দ্বিতীয়ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুমোদন বা নির্দেশ ছাড়া প্রকাশ করার কথা নয়। সংবিধানের তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং স্পিকার শপথ গ্রহণকালে এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, "আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব"। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী সংবিধানের প্রেমে গদগদভাব দেখাতে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নামেন। সেই তারাই আবার সুবিধা মতো সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে অস্বীকার করার কারণে সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য আমি বর্তমান সরকারকে অভিযুক্ত করছি এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী এর বিচার দাবি করছি।

আগস্ট ২০, ১৯৯৫ইং।

স্বাধীনতার ঘোষণা : উত্থাপিত বিতর্ক

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

১৯৮১ সালের ৩ জুন সেই সময়কার জাতীয় সংসদে মরহুম জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক শোক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। শোক প্রস্তাবে বলা হয় : "১৯৭১ সালে পাকিস্তান সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে তিনি বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন এবং ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

বলাবাহুল্য সেই থেকে প্রকাশ্যত : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে তথাকথিত বিতর্ক এবং বিভ্রান্তির প্রয়াস চালানো হচ্ছে। স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত এই বিষয়টি যখন বিতর্কিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে তখন তা অবশ্যই বাস্তবানুগ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

জাতীয় স্বাধীনতার পিছনে আছে এক দীর্ঘ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস। পাকিস্তান জন্মের পর হতে এদেশে শাসন ও শোষণের অবাধ রাজত্ব কায়েম হয়। বাঙালি জাতিসত্তার সকল সংস্কৃতি, আত্মপরিচয়ের সকল উপাদান, ভাষা-সংস্কৃতি এবং জাতীয় বিশ্বাস ও শক্তিকে ধ্বংস করার নগ্ন চতুর কৌশলী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমিক সংগ্রাম করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত পটভূমিতে রয়েছে ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাস, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা এবং নির্বাচন, প্রাসাদ চক্রান্তে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ বাতিল ঘোষণা, ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর সামরিক আইন জারি এবং আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও শাসন, কথিত ২২ পরিবারের নগ্ন শোষণ, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা কর্মসূচি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উত্তাল গণ-আন্দোলন। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বিদায়। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ। নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। ষড়যন্ত্র '৭১ সাল। '৬৬-এর ৬ দফা ১ দফায় পরিণত। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান ও নির্দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা অর্জন।

সংগ্রামের এই সকল স্তরে স্তরে জাতির মানস গঠন, আত্মজাগৃতির নবতর উদ্বোধন, আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়ের জাতিগত উপলব্ধি জনগোষ্ঠীর সর্বস্তরে কখনো ধীরে কখনো দ্রুত তালে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে বন্ধুর যাতায় বাঙালি জাতি সংগ্রামে, সাহসে, বৈশিষ্ট্যে, আত্মত্যাগের বলিষ্ঠতায় স্বাধীন বীর্যবান সত্তার স্বাপ্নিক সম্রাটের প্রতীকী রূপে বরণ করে নেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। সেজন্যেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থবাদীর সকল ষড়যন্ত্র, সমস্ত প্রলোভন, ক্ষমতার দাপটকে উপেক্ষা করে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে একক অবিসংবাদিত নেতারূপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। দীর্ঘ দিবস রজনী, কত এককী আপসহীন তেজদৃপ্ত পদচারণায় কখনো কারাগারের নিভৃতে, কখনো ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কখনো নিকষ কালো রাতের ঘাতক সঙ্গিনের মুখোমুখি হয়েও যিনি বাঙালি জাতি ও তার মুক্তির লক্ষ্যে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন—সেই জাতিসত্তার একক প্রতীকী নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যান্য নেতৃত্বকে ছোট করে দেখবার জন্য নয় বরং অবিকৃত ইতিহাসের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যেই এসব কথা। মওলানা ভাসানীর অবদানকে খাটো করে দেখছি না। তবে তাঁর জীবনচর্চায় অস্থির দোদুল্যমানতা, এমনকি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য কোনোদিনই তাঁকে বাঙালির অখণ্ডতায় এবং নিস্তেজ পরিসমাপ্তিতে তাঁর অদ্ভুত রাজনৈতিক আচরণ চমকপ্রদ, কিন্তু সাফল্যে মহীয়ান নয়। এমনকি কখনো কখনো পাক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রত্যক্ষ খপ্পরে তাঁর চেতনা আচ্ছন্ন। পাক গোয়েন্দাবাহিনীর বিশিষ্ট কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইতে মওলানা ভাসানীকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তদানীন্তন সামরিক সরকারের 'প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য' সাহায্যের কথা সরাসরি লিখেছেন। অসময়ে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' মুখরোচক আলোচ্য বিষয়, কিন্তু ইতিবাচক ভূমিকা তো রাখতেই পারেনি বরং স্বাধীনতার শত্রুদের পূর্বাহ্নেই সাবধান করেছে মাত্র। যা হঠকারী স্লোগান সর্বস্বতা। সে কারণে ত্যাগী এই সংগ্রামী মানুষটি স্বাধীনতার সিপাহ-সালার হতে পারেননি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের অবদান বিচার্য ভিন্ন প্রেক্ষাপটে । আর নাজিমুদ্দিন? সে তো ভিন্নভাষী বিশ্বাসঘাতক। জাতীয় নেতাদের পাশে তার অবস্থান জাতীয় ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়।

সে কারণেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্বতঃসিদ্ধতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার, স্থপতি, সিপাহসালার এবং মুকুটহীন মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বাংলাদেশ নাম তাঁরই দেয়া। সেজন্য সংগ্রামের শেষ লগ্নে বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ এক এবং অভিন্ন হয়ে আছে। যাঁর ডাকে, আহ্বানে, নির্দেশে, ঘোষণায়, অনুপ্রেরণায় বাঙালি জাতি তুলে নিয়েছে হাতিয়ার, ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রু নিধনে। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবদানকে ছোট করে না দেখলেও একথা বলা যায়—স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত পটভূমিকায় সামরিক কোনো কর্মকর্তার বিশেষ ও উল্লেখ্য অবদানের অদ্ভুত দাবি এককথায় নাকচ হয়ে যায়। আগরতলা মামলায় যে সমস্ত সামরিক অফিসারকে জড়ানো হয়েছিল সেখানেও প্রধান ও ১ নং আসামী শেখ মুজিব। অন্যরা এসেছে তাঁকে জড়িয়ে। তবুও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে যখন বিতর্ক এসেছে তখন বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ ফয়সালা হওয়া দরকার।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে আমাদের বিচার্য বিষয় :

ক. শত্রু পক্ষের ভাষ্য,

খ. মিত্র পক্ষের সাক্ষ্যাদি

গ. স্বপক্ষ জবানবন্দি ও আত্মকথন

ঘ. পারিপার্শ্বিক অবস্থা

আসুন দেখা যাক, স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে শত্রু পক্ষের ভাষ্য কী?

ক. যারা বলেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা কেন স্বাধীনতার জন্যই তিনি প্রস্তুত ছিলেন না—তার জবাবে এয়ার ভাইস মার্শাল আজগর খানের লেখা 'জেনারেলস ইন পলিটিকস' বইয়ের ৩২ পৃ. থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরতে চাই। তিনি লিখেছেন : "একাত্তরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ঢাকা যাই। সেখানে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করি। আমি মুজিবুর রহমানকে প্রশ্ন করলাম, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কিরূপ নেবে এবং অচলাবস্থার অবসান কিভাবে সম্ভব? উত্তরে মুজিব বললেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সহজ। ইয়াহিয়া খান প্রথম ঢাকা আসবেন, এম এম আহমেদ (প্লানিং কমিশনের প্রধান) তাঁকে অনুসরণ করবেন। ভুট্টো আসবেন তারপর। ইয়াহিয়া খান সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেবেন এবং তারপরেই পাকিস্তানের শেষ।"

পাকিস্তানের শেষ অর্থাৎ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে? পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর মেজর সিদ্দিক সালিক, 'Withness to surrender` নামে একটি বই লিখেছেন। সেখানে ডেভিড লোশক- এর Pakistan crisis (পৃঃ ৯৮-৯৯) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

'When the first shot had been fired, the voice of sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wave length close to taht of the official Pakistan Radio, in what must have been and sounded like a Pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East pakistan to be the peoples Republic of Bangladesh."

পাকিস্তানের তদানীন্তন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন—"আমি শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেব। কেননা তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন"

'Sheikh Mujibur Rahman, President of the default Awami Legue, will be tried by a special Military Court of waging war against Pakistan and other offences, a Press Note issued by he Headquarter of CMLA said to day, 9th August 1971.

শুধু তাই নয়, আজ যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদানকে খাটো, ছোট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে হীন উদ্দেশ্য সাধন করতে চান তাদের বাংলাদেশের গণহত্যার নায়ক ও প্রধানতম শত্রু তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের বেতার ভাষণটি পাঠ করার অনুরোধ জানাই।

ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণাই শুধু নয়, স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে ঘোষিত পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্র একটি প্রামাণ্য দলিল। পাকিস্তান সামরিক এবং বেসামরিক গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক প্রণীত এই দীর্ঘ শ্বেতপত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য একটি ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে বারবার—তিনি হলেন শেখ মুজিব। শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, "২৫ মার্চের পূর্ববর্তী দিনগুলোতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিস্তারিত পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়া হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কাছে সরাসরি দায়ী করে সাবেক কর্নেল ওসমানীকে বিপ্লবী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। শ্বেতপত্রে ইপিআর ইবিআর-এর ট্রান্সমিটারে যোগাযোগ স্থাপনের কথাও বলা হয়েছে।

খ. স্বাধীনতার শত্রুপক্ষের এই স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে ভাষ্য বিবরণীর পর এবার স্বপক্ষের প্রমাণাদি তুলে ধরতে চাই ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি (সর্বাধিনায়ক নয়। কেননা মুজিবনগরে পঠিত ঘোষণাপত্র যা সরকার গঠনের ভিত্তি, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান সর্বাধিনায়ক হিসেবে উল্লিখিত)। জেনারেল ওসমানীর বক্তব্য, সাক্ষাৎকার এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরি। ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসে 'পূর্ব দেশের' সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল ওসমানী বলেছেন : "২৫ মার্চ রাত দশটায় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন আপনাকে যেন ওরা কোনো অবস্থাতেই ধরতে না পারে। তিনি আমার ওপর যুদ্ধ পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করেন।" যিনি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করেন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি এ যুক্তি কোনভাবে গ্রহণীয়? জেনারেল ওসমানী জাতীয় সংসদে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গত বিতর্কে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ১৯৮১ সালে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "বঙ্গবন্ধুই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

এ সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বলেন : "১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি বিদেশে ছিলাম। ওমানের টেলিভিশন পর্দায় দেখেছি ভোটের ছবি। তার আগে ঝড়ের ছবি। দেশে ফিরে দেখলাম আমার দেখা বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে গেছে। চারিদিকে দানা বেঁধে উঠেছে। সংগ্রাম, এবার স্বপ্ন সার্থক হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হবেন রাষ্ট্রনায়ক।" মহানায়ক শেখ মুজিবের প্রতি একজন সরলপ্রাণ সামরিক নেতার অকপট আত্মস্বীকৃতি, উপলব্ধির অবিকৃতি, স্বাধীনতার পরপরই সাপ্তাহিক বিচিত্রায় যা বিব্রত আছে।

জেনারেল জিয়ার লিখিত প্রবন্ধ—"একটি জাতির জন্ম" এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য তিনি লিখেছেন :

"তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন।" তিনি লিখেছেন : "৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো।"

ঐ ঘোষণার প্রেক্ষিতে তিনি ১৭ মার্চ অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

(লক্ষণীয় জিয়াউর রহমান ওই প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকার করেছেন। যদিও ক্ষমতায় এসে তিনি ইতিহাসকে বারবার বিকৃত করতে চেয়েছিলেন স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে)।

জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর ওই 'গ্রীন সিগন্যাল' না পেলে কী করতেন? কয়েকজন লোক নিয়ে বিদ্রোহ করতেন ? তিনি আরও লিখেছেন : অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি মেজর মীর শওকতকে ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো। মেজর মীর শওকত পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল শওকত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে—

আপনার বিবেককেই জিজ্ঞাসা করুন এটা অনস্বীকার্য যে ২৫ এবং ২৬ মার্চ '৭১-এর চরম মুহূর্তে প্রতিটি বাঙালির মনেই স্বাধীনতার কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই হিসেবে প্রতিটি বাঙালি সেদিন হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতার এক একজন ঘোষক। কিন্তু কে সেই মহান নেতা যিনি সেদিন অন্তরালে থেকেও প্রতিটি বাঙালিকে জুগিয়েছিলেন এই সাহস? কার আহ্বানে বাঙালি সেদিন পেয়েছিল স্বাধীনতার প্রেরণা ৭ মার্চ ('৭১) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক শুনিয়েছিলেন? ২৬ মার্চ '৭১ সন্ধ্যা হতে পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের মূল বেতার কেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে অবস্থান করে যারা স্বাধীনতার কথা বললেন, বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করলেন, কে তাদের সেদিনের প্রেরণার উৎস ছিলেন? কার পক্ষে তারা প্রচার করেছিলেন সেসব ঘোষণা-স্বাধীনতার কথা? কাজেই বলুন কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি? কে বা কারা ঘোষক ছিলেন, সেটা কি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ছিল না? এই আনুষ্ঠানিকতার বিতর্কে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। (একাত্তরের রণাঙ্গন পৃ.১৬৮-১৬৯)।

সামরিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি বেসামরিক ব্যক্তিত্ব তদানীন্তন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ আর মল্লিক বলেন, "২৬ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান সাহেব সংগ্রাম পরিষদের অফিস থেকে ফোনে ড. আনিসুজ্জামানকে জানান যে, গত রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ঘোষণার বাণী চট্টগ্রামে পৌঁছে গেছে। তিনি আরও জানান চট্টগ্রাম বেতার থেকে এই ঘোষণা আজই প্রচার করা হবে। ড. এ আর মল্লিক বলেন, বিকেলে হান্নান সাহেব স্বাধীনতার যে ঘোষণা পাঠ করেন তা আমরা শুনতে পাই।" একাত্তরের রণাঙ্গনে বইয়ের লেখক শামসুল হুদা চৌধুরী লিখেছেন, স্পষ্টতই চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে প্রথম বিপ্লবী ভাষণ প্রচারের গৌরব অর্জন করেছিলেন জনাব এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান শুরু হয় ২৬ মার্চ

সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে। তিনি লিখেছেন, এই বেতারে প্রথম সান্ধ্য অধিবেশনেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদটি উপস্থাপন করেন জনাব আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ '৭১ সান্ধ্য অধিবেশনে সদ্য গঠিত এই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করলেন মেজর জিয়াউর রহমান। মেজর জিয়াউর রহমানের সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণটি তাঁর স্বকণ্ঠ বাণীবদ্ধকৃত টেপ থেকে নিম্নে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

The Government of the `Sovereign state of Bangladesh` on behalf of our great leader, the supreme commander of Bangladesh Shiekh Mujibur Rahman we hereby proclaim the independence of Bangladesh... it is further proclaimed that Shiekh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representative of Seventy Five Million people of Bangladesh and the Government headed by him is the only legitimate Government of the people of the independence, Sovereign state of Bangladesh.

৩০ মার্চ তিনি আরো একটি ভাষণ দেন। ২৭ মার্চের বাণীবদ্ধ টেপ অথবা ৩০ মার্চের ভাষণে কোথাও তিনি নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান বলে উল্লেখ করেননি। তাহলে কি তিনি তৃতীয় কোনো ভাষণ দিয়েছিলেন—দিয়ে থাকলে কবে এবং ভাষণের বিষয় কী ছিল তার প্রমাণ নেই। ৩০শের পরই বেতারটি আক্রান্ত হয়।

জিয়াউর রহমানের ভাষণ নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি। উদ্ধৃতি ও তথ্য থেকে এসব প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি, জেনারেল জিয়া তাঁর ডায়রীর পাতায় (কবে লেখা ডায়রি তার উল্লেখ নেই) লিখেছেন : ২৭ মার্চ শহরের চারদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রেডিও স্টেশনে এলাম। একটুকরো কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটি এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছি সে কথাও লেখা ছিল সেই প্রথম ঘোষণায়।"

বলাবাহুল্য, জিয়ার এই কথিত ভাষণ ইতিহাস অতিরিক্ত, তার পূর্বেই ওই বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল। প্রচার করেছিলেন

হান্নান সাহেব। বঙ্গবন্ধু প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। এটাই ঐতিহাসিক সত্য। সে জন্য জিয়া যে দাবি করেছেন তিনিই প্রথম ঘোষণা দেন একথা ঠিক নয়। জিয়ার ভাষণে একজন উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারের দম্ভ প্রকাশিত হয়েছে, দেশ জাতির ওই সময়ের বাস্তব অবস্থার সত্য প্রকাশিত হয়নি। বাঙালি জাতির পক্ষে অবৈধভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার একটি গুরুত্ব আছে সেটা রাজনৈতিক গুরুত্ব নয়, সামরিক গুরুত্ব। সেই গুরুত্বকে বুঝানোর জন্যই মেজর রফিকের কথায় "সে দিন (২৭ মার্চ) অপরাহ্ন আমি কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললাম। এবার আমরা অনুরোধ জানালাম তিনি যেন এসে সংগ্রামরত সৈন্যদের পক্ষে বেতারে কিছু বলেন। অনুরুদ্ধ হয়ে ওই দিন বিকালে তিনি মদনঘাটস্থ রেডিও স্টেশনে আসেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে উল্লেখ করেন।"

সংগ্রামরত সৈনিকদের পক্ষে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করে তাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল। বাঙালি সামরিক বাহিনীর লোকজন যে বাঙালিদের পক্ষে আছে সেই হিসেবেই ভাষণটি আলোচিত, এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণাটি দেন, তা অতিশয়োক্তি এবং অনভিপ্রেত। এবং ঐতিহাসিক বিচারে অবাঞ্ছিত। কেননা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী তখন জিয়াউর রহমান পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের ক্যাপ্টেন। ৩ মার্চ, ৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতার ডাক দিচ্ছেন তখনও জিয়ার পরনে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পোশাক।

গ) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আত্মকথন :

তখন আমি পাবনার নির্বাচনী এলাকা হতে নির্বাচিত তদানীন্তন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পদ্মা-যমুনার বাঁকে জড়ানো এই অঞ্চলটি তখন উদ্বেল এবং উত্তাল । অস্থির উত্তেজনা। প্রতিরোধ মানসিকতা প্রজ্বলিত। ২৫ শের রাতে ঢাকায় কী ঘটেছে জানি না। সকালে ঢাকা বেতারে ভিন্ন কণ্ঠ, উর্দু বয়ান শুনে মনে হলো—ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে। বুঝলাম অসহযোগ আন্দোলন নেই। আন্দোলন সশস্ত্র। লড়াই আসন্ন। থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে নিলাম। দুপুরে সিরাজগঞ্জ থেকে লোক এলো, সিরাজগঞ্জ ওয়ারলেস স্টেশন থেকে পাঠানো একটি মেসেজ। তাতে লেখা ছিল :

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয়বাংলা।"

শেখ মুজিবুর রহমান
২৫ মার্চ। ১৯৭১

ঘ) স্বাধীনতা যুদ্ধ ছেলেখেলা নয় :

একটি জাতির স্বাধীনতার পটভূমি বিরাট এবং বিস্তীর্ণ। হাজার লোকের আত্মদান, ত্যাগ তিতিক্ষা, জেল-জুলুম, রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার মুকুল মঞ্জুরিত হয়। এটা কোনো হঠাৎ খেয়ালি বা উচ্চাভিলাষী কোনো ব্যক্তির নির্দেশে হয় না। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘুটবল খেলা নয়। যেন রেফারি হুইসেল দিলেই খেলা শুরু হয়ে গেল। কোনো এক ক্যাপ্টেন বা মেজর পাক সামরিক বাহিনীর পোশাকে আবৃত হয়ে হঠাৎ ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করার দাবিদার সাজলে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধাই শুধু জাগে না, করুণা হয়। ভাবখানা এই যে, কোনো সামরিক অফিসার রাতারাতি বেতার কেন্দ্র দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েই দেশ স্বাধীন করে ফেলল। এই সহজ মানসিকতা জনতার দরবারে অচল। বিষয়টি অত সহজ নয়। একটি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা দুরূহ কাজ। সেজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় মানস গঠন করতে হয়েছে। এই মানস গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সেজন্য তিনি জাতির নেতা, জাতির পিতা, স্বাধীনতার স্থপতি। ইতিহাস একথা বলবে।

জাতির পিতার এই অনন্য ভূমিকার পাশাপাশি যারা জিয়ার ওই ভাষণকে স্থাপন করে আত্মপ্রসাদ পেতে চায়—তারা তা পাক, আমাদের আপত্তি নেই। আপত্তি সেখানেই যেখানে দেখি জিয়ার ঘোষিত ভাষণটি সামনে রেখে স্বাধীনতার শত্রু পক্ষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকেই বিভ্রান্ত করতে চায়—অবমূল্যায়ন করতে চায়—বিতর্কের ধূম্রজালে স্বাধীনতাকেই ছোট করতে চায়, এবং ছোট করার পেছনে তাদের রাজাকারী আত্মপ্রসাদ।

কারণ তারা জানে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে খাটো করানো মানে স্বাধীনতাকে খাটো করা, বাঙালিকে অসম্মান করা। এবং তারা জিয়ার ভাষণকে সামনে রেখে ওই কাজটিই করতে চায়। এই রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইতিহাসের সমস্ত আয়োজন এবং অধ্যায়কে বাদ দিয়ে জিয়ার কথিত ভাষণ নিয়ে এতো লাফালাফি, মাতামাতি।

ইতিহাসের আরো একটি সত্য হলো—

'৭১-এর ৩ মার্চ পল্টনের ছাত্র জনসভায় ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতার ইশতেহার, যেখানে বলা হয়েছিল : ৫৪ হাজার ৫ শত ৭৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। বলা হয়েছিল ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।

তারপর ৭ মার্চের সেই বজ্রকণ্ঠ : "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ঘোষণা।"

তারপর ২৬ মার্চের ঘোষণায় তা উল্লিখিত হয়েছে। এবং ১৯৭১ সালের মুজিবনগরে গঠিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে :

"বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে : "এই ঘোষণা দ্বারা আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সেই পবিত্র ঘোষণাকে অনুমোদন করছি।" সেজন্য স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণার উল্লেখ আমরা পাই ৩ মার্চের ছাত্র জনসভায়, দ্বিতীয় ঘোষণা ৭ মার্চ লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে, ২৬ মার্চের ঘোষণা যা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত ও প্রচারিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পঠিত হয় ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে। যার উপর ভিত্তি করে সরকার গঠিত হয়। যুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং যার ফলে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র।

এ শতকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়েছিল একমাত্র বাংলাদেশই

মুনতাসীর মামুন

পৃথিবীতে দুটি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল—একটি যুক্তরাষ্ট্রের, আরেকটি বাংলাদেশের। কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ঠিক। পঁচিশ বছর আগে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সরকার একটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল এবং সেই সরকারই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলিতে মুজিবনগর প্রায় অস্পষ্ট, নির্বস্তুক বস্তু। এ রজত জয়ন্তীতেও তার ব্যতিক্রম নয়। মুক্তিযুদ্ধ যেমন, এখনও তেমন আমাদের জাতীয় জীবন থেকে এর সংশ্লিষ্টতা খাটো করে দেখার উপায় নেই। মুজিবনগর সরকার ছিল ধারাবাহিকতার ফসল, একথা বলেছেন মুজিবনগর সংশ্লিষ্ট অনেকে। ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম বলেছেন, মুক্তাঞ্চলে আমরা প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম। তারপর মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে আমরা তার অন্তর্গত হয়ে যাই।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেছেন, তিনি এবং তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তাঞ্চল দিয়ে ভ্রমণ করেই সীমান্তে পৌঁছান এবং ওপারে খবর পাঠানো হয় তাদের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে নিয়ে গেলে তারা যাবেন, নয়তো নয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তা করে এবং তার পরের ইতিহাস মোটামুটি সবার জানা।

ড. চৌধুরী ছিলেন তখন মেহেরপুরের এসডিও। তিনি মেহেরপুরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাজউদ্দিন ও আমিরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি জানালেন, একটি সরকার গঠিত না হলে সমস্ত তালগোল পাকিয়ে যাবে। দেশ-বিদেশের অনেকেই এ সরকারের বিষয়ে জানতে চাইছে। 'কার জন্য, কার অধীনে তোমরা যুদ্ধ করছ?' —এ ছিল প্রশ্ন। ড. চৌধুরী বললেন, "আমি তাদের বললাম, অতি শীঘ্র যেন তারা এর ফয়সালা করেন"। এরপর তারা বর্ডার ক্রস করেন।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। সে সময় এ ধরনের একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল মানুষের

মনোবল অটুট রাখা ও প্রবাসী সরকারের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য। প্রথম বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ এপ্রিল পালিত হচ্ছে মুজিবনগর দিবস।

১৭ এপ্রিলের এক সপ্তাহ আগে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে ১৭ এপ্রিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকার-এর পত্তন থেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে তার কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলাম।

তিনি জানালেন ৪ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদ ও তার সাক্ষাৎকারের পর সরকার গঠনের কথা তারা "বিশেষভাবে উপলব্ধি" করেন। "কেননা ভারত সরকারের সাথে একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিত।" এদিকে সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে চাপ আসা অব্যাহত রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দিন ভাইকে খুবই চিন্তিত মনে হয়। অস্ফুট স্বরে তিনি বলেন ফেলেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে কি বিপদে ফেলে গেলেন। আমি বিরক্তির সাথে জানতে চাইলাম সরকার গঠনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত কেন? জবাবে তাজউদ্দিন ভাই বলেন, "আপনি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে সরকার গঠন করে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।"

এসব অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনোমালিন্যের কথা আমরা পরবর্তীকালে শুনেছিলাম। তাজউদ্দিন আহমদ সঠিক কাজটিই করেছিলেন। ব্যারিস্টার ইসলামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনারা কি আগে থেকে এমন কোনো ধারণা করেছিলেন যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে"। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ ধরনের চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল। কতটা সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল তা আমরা জানি না, তবে এটা ঠিক কিছু চিন্তাভাবনা ছিল। না হলে এতো দ্রুত কোনো সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ঠিক হয়েছিল বঙ্গবন্ধু যে পাঁচজনকে নিয়ে হাই কমান্ড গঠন করেছিলেন, প্রথম মন্ত্রিসভায় তারাই থাকবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ১০ এপ্রিল ঘোষণার পর এসব বিষয় নিয়ে আর উচ্চবাচ্য হয়নি।

কিন্তু এটি হচ্ছে পরের ঘটনা। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দিন আহমদের মনে এ ধারণা দৃঢ় হয় যে সরকার একটি গঠন করতে হবে এবং তাড়াতাড়ি তা না করলে স্বাধীনতার কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। ঐ দু'একদিনের কথা জানেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম; কারণ তিনিই তখন ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে। সে সময়ের ঘটনা তিনি বিবৃত করেছেন তার বই- 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি'তে। লিখেছেন তিনি—

"তারপর কথা উঠল দেশের নাম কী হবে? আমি বললাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।' তাজউদ্দিন ভাই-এর পছন্দ হলো। নামটি ঠিক করার সময় আমাদের মাথায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা মনে হচ্ছিল। এ সময় সরকারি কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্য একটি মনোগ্রাম ঠিক করা দরকার। মনোগ্রাম আমাদেরই ঠিক করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশরে যে মনোগ্রাম সরকারি কাগজপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আমার হাতে আঁকা। চারপাশে গোলাকৃতি লাল-এর মাঝখানে সোনালি রঙ-এর মানচিত্র। মনোগ্রাম দেখে তাজউদ্দিন ভাই পছন্দ করলেন। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তিনি তা অনুমোদনও করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তার প্রথম সরকারি অনুমোদন।"

এরপর তাজউদ্দিনের বক্তৃতা। ইংরেজি খসড়াটি করেন রেহমান সোবহান। লিখেছেন ব্যারিস্টার ইসলাম—তার ইংরেজি খসড়ার একটা অংশ আমার খুব ভালো লেগেছিল। সেটা ছিল Pakistan is dead and buried under mountain of corpses. বাংলায় এর অনুবাদ করি 'পর্বত প্রমাণ লাশের নীচে' পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে।

এ পর্বের পর টেপকৃত বক্তৃতা প্রচারের প্রসঙ্গ। টেপে তাজউদ্দিনের বক্তৃতা টেপ হলো, ঠিক হলো ১০ তারিখ শিলিগুড়ির জঙ্গল থেকে প্রচারিত হবে। টেপ দিয়ে দেয়া হলো বিএসএফ-এর গোলক মজুমদারকে। ১০ তারিখ তা প্রচারিত হবে। ইতোমধ্যে সরকার গঠন নিয়ে আরো আলোচনা চলছে। দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তাজউদ্দিন জানালেন আমিরুল ইসলামকে দিয়ে বক্তৃতা প্রচার ঠিক হবে না, গোলক মজুমদারকে যেন তা জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু টেপ হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন।

"এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। রেডিও অন করে খেতে বসেছি।" লিখেছেন, ব্যারিস্টার ইসলাম, "খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দিন ভাই ও শেখ মণি আছেন।

রাত তখন সাড়ে ন'টা। সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আসলো। প্রথমে আমার কণ্ঠ ভেসে আসল। ঘোষণায় আমি বলেছিলোম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচারিত হলো। সারা বিশ্ববাসী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।"

২

১০ এপ্রিল স্বাধীনতা ঘোষণার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আরও দু'বার স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়, যার প্রথম লাইন ছিল "This may be my last message, from today Bangladesh is independent."

২৭ মার্চ অর্থাৎ পরদিন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষণা করনে— "Major Zia, Provisional commander-in-Chief of Bangladesh Liberation army, hereby Proclaims, on behalf of sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh." এখানে উল্লেখযোগা বাক্যটি হলো, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। এর দু'সপ্তাহ পর দেয়া হয় মুজিবনগর ঘোষণা। এখানে আরও উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক তিনটি ঘোষণাই ইংরেজিতে। যদিও এরা সবাই ছিলেন বাঙালি।

মুজিবনগর ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, একটি সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ সেই সরকারের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। ঘোষণাটি ২৪ অনুচ্ছেদের। ঘোষণায় মূলত যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল তা হলো ১৯৭০ সালের যুক্ত নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। ১৬৯ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৭। এ কারণে, জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু পরে বেআইনি ও একতরফাভাবে তা স্থগিত রাখা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের সম্মান ও সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান। এ পটভূমিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাকে অনুমোদন করছে।

ঘোষণাটি আইনের ভাষায় রচিত এবং তা রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম। এ ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বাক্য হচ্ছে—

১. বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।

২. বাংলাদেশের মানুষকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়মূলক সরকার প্রদানের জন্য যা যা করা দরকার তা করবেন।

এ ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের তারিখ ঘোষিত হয় যা নিয়ে এখনও হাস্যকর সব বিতর্ক হয়। মুজিবনগর ঘোষণায় পরিষ্কারভাবে লেখা আছে- "আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।"

একই তারিখে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন বলবৎকরণ আদেশ জারি" করেন। এ আদেশের বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। শেষ হয় মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রথম পর্যায়। এরপরের পর্যায় হলো সরকার গঠন, শপথ ও কার্যক্রম পরিচালনা।

১১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের একটি দীর্ঘ ভাষণ প্রচার করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে। এ ভাষণটির কথা অনেকের মনে নেই; কারণ কোথাও এর উল্লেখ নেই। উপসংহারে যে মন্তব্যগুলো করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ—

১. আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।

২. আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরও অনেক রক্তক্ষয় ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে।

৩. এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ... এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ'। ১৩ এপ্রিলের মধ্যে হাই কমান্ডের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন চূড়ান্ত করলেন। আপাতত অন্তর্দ্বন্দ্ব সবাই ভুলে গেলেন। ১৪ এপ্রিল ঠিক হয়েছিল চুয়াডাঙ্গায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু হয়ত পাকিস্তানিদের কাছে সে খবর পৌঁছে গেল। ১৪ তারিখ চুয়াডাঙ্গায় সাংঘাতিকভাবে বোমা বর্ষণ করা হলো। তারপর মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ঠিক হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এবার আর কাউকে জানানো হলো

না কোথায় কখন শপথ হবে। ১৭ তারিখ কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে আমির-উল ইসলাম পৌঁছেন বৈদ্যনাথতলায়। ১১টার দিকে তারা সেখানে পৌঁছান।

মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম ছিলেন ঝিনাইদহ এসডিপিও। যুদ্ধ করতে করতে তিনি তখন সীমান্তের কাছাকাছি। তিনি জানিয়েছেন, তৌফিক-ই-ইলাহী তাকে খবর পাঠান দ্রুত বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছুতে। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন নিরাভরণ একটি মঞ্চ। তাকে জানানো হয়, মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবে এবং গার্ড অব অনারের বন্দোবস্ত তাকে করতে হবে। তিনি আশপাশে আনসার-পুলিশ যাদের পেলেন তাদের নিয়ে গার্ড অব অনার দিলেন।

কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী আমাকে বলেছেন, শপথ গ্রহণের আগে গার্ড অব অনার হয় কিভাবে? সত্যিকার গার্ড অব অনার দেয়া হয় পরে এবং তখন আমি সেখানে ছিলাম।

ব্যারিস্টার ইলসাম লিখেছেন, "কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো।"

একটি ছোট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই স্থানের নাম 'মুজিবনগর' নামকরণ করেন। ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।

তৌফিক-ই-ইলাহী বলেছেন, 'নিজেকে মনে হচ্ছিল ধাত্রীর মতো। একটি দেশের জন্ম হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করছিল আবেগে তার গলা বুজে আসে। সেই আমবাগানে হাজার হাজার লোকের ভিড়। জানিয়েছেন আমির-উল ইসলাম। আর চারদিক মুখরিত স্লোগানে 'জয়বাংলা', 'জয়বঙ্গবন্ধু' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল বাংলাদেশ। এরপরই মন্ত্রিসভা মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন, যুদ্ধ চালনা, সিভিল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সব ইতিহাস আমাদের জানা। মুজিবনগর সরকারের অধীনে (যার প্রধান ছিলেন শেখ মুজিব) যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। এক্ষেত্রে জনাব তাজউদ্দিনের নেতৃত্ব অবশ্যই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ আলোচনার সময় এই সরকার, এই সরকারের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন এবং যারা এর নেতৃত্ব মেনে

নিয়েছিলেন তাদের কোনো কারণে হেয় করা ঠিক নয়। তাতে ইতিহাসের বিকৃতি হয় মাত্র।

প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর (১৭ এপ্রিল) তাজউদ্দিন আহমদ দীর্ঘ এক প্রেস স্টেটমেন্ট প্রদান করেন, যার শিরোনাম ছিল 'টু দি পিপল অব দি ওয়ার্ল্ড'। দীর্ঘ এ প্রেস স্টেটমেন্টে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। এর মূল সূত্রগুলো ছিল এ রকম—

(১) পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় স্বাধিকার সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হয়েছে।

(২) পাকিস্তান কাঠামোর ভেতর বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয়দফা দেয়া হয়েছিল এবং (১৯৭০) নির্বাচনের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল।

(৩) এর আগে আর কোনো দাবির প্রতি মানুষ এমন ব্যাপক সমর্থন জানায়নি। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে যেখানে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সেখানে ছয়দফার কথা নির্বাচনের সময় উল্লেখ করা হয়নি। বেলুচিস্তানের যেখানে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা ছয়দফার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও অধিকমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল।

(৪) ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পিপলস পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্বাচিত সদস্যরা পূবপাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া অ্যাডমিরাল আহসানকে বরখাস্ত করেন, যাকে মডারেট মনে করা হতো। মন্ত্রিসভার বাঙালি সদস্যদের বরখাস্ত করা হয়, যাতে ক্ষমতা একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

(৫) ইয়াহিয়া ভুট্টোর সঙ্গে আঁতাত করে এগুলো করেছেন; কারণ তারা চাননি পাকিস্তানে পার্লামেন্টই ক্ষমতার আসল উৎস হয়ে উঠুক।

(৬) এসব কারণে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়েছিল।

(৭) অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিল শেখ মুজিবকে এবং নিজেদের স্থাপন করেছিল তার কর্তৃত্বের অধীনে।

(৮) এ পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ বাধ্য হয়ে অর্থনীতি ও প্রশাসন সচল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শুধু মানুষ নয়,

প্রশাসন ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ও শর্তহীনভাবে সমর্থন দিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মেনে চলেছে এবং নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগকেই একক কর্তৃত্ব হিসাবে মেনে নিয়েছে।

(৯) ইয়াহিয়া ৬ মার্চ এক প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা আসবে।

(১০) যদিও মানুষ স্বাধীনতা চাচ্ছিল; কিন্তু শেখ মুজিব আবারও রাজনৈতিক সমাধানের পথে যেতে চেয়েছিলেন।

তাজউদ্দিন এরপর ২৫ মার্চ পযন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, লাশের পাহাড়ের নীচে পাকিস্তান এখন মৃত ও কবরস্থ এবং এসব ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে ইয়াহিয়া ও তার সমর্থকরা অনেক আগে থেকেই দুই দেশের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল।

তাজউদ্দিন সবশেষে আশা ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ছাই থেকে এক নতুন দেশ গড়ে তোলা। তাই ছোট-বড় সকল শক্তির সহযোগিতা তার কাম্য । We do not aspire to join any black or pact but will seek instance from those who give it in a spirit of goodwill free from any desire to control our destinies. We have struggle for too long for our self determination to permit ourselves to become any ones satellite. স্বাধীনতার ঘোষণা ও তাজউদ্দিন আহমেদের বক্তব্যে এ কথাটিই ধ্বনিত হয়েছিল যে বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে সমতা, মানবিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষাকল্পে এবং ন্যায়মূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আদর্শগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে। শাসনতন্ত্রের চারটি মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল—জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাতজন্ত্র। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই বিবেচনা করা হতো যে, সমাজতন্ত্র মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে ও মানুষের সম্মান নিশ্চিত করে। ন্যায়মূলক সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হতো সংসদীয় গণতন্ত্রকে। এ সমস্ত আদর্শ রক্ষা করা যাবে যদি কোনো শক্তির লেজুড় না হওয়া যায়। এবং কোনো জোটে আবদ্ধ না হওয়া যায়। যে কারণে বাংলাদেশ সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল।

স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে কিন্তু আহত হয়েছিল চারটি নীতির একটি গণতন্ত্র। ছাই থেকে দেশ গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সচেষ্ট ছিলেন। বিরাট কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনাও করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সে সরকার পারেনি। এর কারণ শুধু যে স্বাধীনতার বিরোধী ও বৈরী শক্তির চাপ তা-ই নয়, নিজের দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাও ছিল বড় কারণ। এর প্রধান সামাজিক কারণ ছিল, একটি যুদ্ধ—পুরো একটি দেশ ও জেনারেশনকে বদলে দিয়েছিল। তরুণ জেনারেশন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল এবং তা ছেড়ে দিতে তারা রাজি ছিল না। ওই সময়ের আমাদের ও আমাদের পূর্বেকার জেনারেশনের সে কথা ভোলার কথা নয়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে, দেশের পরিস্থিতি উন্নত হলে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তিনি এগিয়ে আসতেন কিনা তা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু ১৯৭২ সালের সংবিধানের অন্য তিনটি আদর্শ যে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়েছিল তা সবাই স্বীকার করবেন এবং মুজিবনগর ঘোষণায় যে পররাষ্ট্রনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তাও মেনে চলা হয়েছিল, যে কারণে বৃহৎ কিছু শক্তিবর্গ ও জোট মুজিব সরকারের প্রতি বৈরী আচরণ করেছিল কিন্তু শেখ মুজিব বেঁচে থাকলে মনে হয়, তার ব্যক্তিত্বের কারণেই এসব বাধা কাটিয়ে উঠতে পারতেন।

১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হত্যার পর বাংলাদেশের পুরো পরিস্থিতিই পাল্টে যায়। মুজিবনগরের স্বাধীনতা ঘোষণার অঙ্গীকারগুলোও এ সময় পরিহার করা হয়। গণতন্ত্রের জায়গা নেয় সামরিকতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থান নেয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র একেবারেই বর্জিত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণা, সেটা যে কোনো জাতির জন্যই অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এবং স্বাধীনতা ঘোষণার মূল সূত্রগুলো সবসময় সংরক্ষণে জাতি সচেষ্ট থাকে। একমাত্র বাংলাদেশেই চার বছরের মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদি স্বাধীনতার যোষণাকেই জলাঞ্জলি দেয়া হয় তা হলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয় কিনা ? নাকি, এ জাতি যেসব কারণে যুদ্ধ করেছিল সেগুলো ছিল ভুল ? এ প্রশ্নটি আমাদের প্রত্যেকের বিবেকের কাছে করা উচিত। এখানে আরো মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতার ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তান বা অন্যকোনো বহিঃশত্রু দ্বারা পদদলিত হয়নি। এটি হয়েছে বাংলাদেশের বাঙালি সৈনিকদের একাংশের দ্বারা। এবং ওই সময় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান। আগেই উল্লেখ করেছি মুজিবনগর ঘোষণার মূল সূত্রগুলো বিধৃত হয়েছিল ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে। জিয়াউর রহমান থেকে এরশাদ আমল-এ পনের বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এরশাদ আমল, জিয়া আমল থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না বরং ছিল পূর্ববর্তী আমলের যোগ্য উত্তরসূরি। মুজিবনগর ঘোষণায় বাংলাদেশে সিভিল সমাজ

প্রতিষ্ঠাকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হ্যাঁ, মুজিব আমলে এর ওপর আঘাত হানা হয়েছিল; কিন্তু প্রতিষ্ঠান ভাঙার সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। জিয়া ও এরশাদ আমলে শুধু সিভিল সমাজের আধিপত্য খর্ব করার জন্য শাসনতন্ত্রে ৭ বার বড় ধরনের সংশোধন করা হয়।

মুজিবনগর ঘোষণার আগে স্বাধীনতার আরো দুটি ঘোষণা দেয়া হয়েছিল বলে আগেই উল্লেখ করেছি। সংবিধানে মুজিবনগর ঘোষণা বিধৃত হয়েছে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নাম বারবার প্রচার মাধ্যমে উল্লেখ করে পুরো একটি প্রজন্মকেই বিভ্রান্ত করা হয়েছে এবং এভাবে জাতির জন্ম পরিচয়েই আঘাত হানা হয়েছে। যে তিনটি ঘোষণার কথা প্রবন্ধের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এ তিনটিই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং জিয়া আমলে তার কাজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ দলিল এখন সরকার স্বীকৃত। এর কোনোটিতে কি উল্লেখ করা আছে যে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন? সুতরাং বিএনপি যে কাজটি করেছে তা রাষ্ট্র বিরোধী, ইতিহাস-বিরোধী এবং জবরদস্তি মূলক কাজ। এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা স্বাধীনচেতা প্রতিটি নাগরিকের জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তবে, মুজিবনগর ঘোষণায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। স্বাধীনতা ঘোষণা ও তাজউদ্দিনের বক্তব্যে একটি সুর লক্ষ করা যায়—তা হলো, বাঙালি এ যুদ্ধে যেতে চায়নি। সে স্বাধিকার চেয়েছে। সেই ন্যায্য দাবি মেনে তাকে দমনের জন্য গণহত্যা চালানো হয়েছিল এবং সে কারণে সে বাধ্য হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। সে সবসময় রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছে। তাজউদ্দিন বলেছেন, ইয়াহিয়া আশা করেছিলেন ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এরপর তাজউদ্দিন কিন্তু নীরব। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশরে নেতৃবর্গ এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শত প্ররোচনা সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছিলেন। তার বদলে তাকে উপহার দেয়া হয় গণহত্যা। সে কারণে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এ কারণে ২৬ মার্চই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির পত্তন হয়েছিল এবং তা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই। ইতিহাসের একজন সামান্য ছাত্র হিসেবে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে যে তিন খণ্ডের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এ

বক্তব্যই দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্তভাবে তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে ৩৫টি নির্দেশ শেখ মুজিব জারি করেন তা "কর্তৃত্ব প্রতিরোধ এবং অঙ্গীকার করার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতা এবং বিপরীত জনমুখী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি করে।

বাঙালি জনসাধারণ একটি স্বতন্ত্র, বিকল্প স্বাধীন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার বোধ যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বুকের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে লাভ করতে থাকে।"

ড. জাহাঙ্গীর আরো লিখেছেন যে, এইসব নির্দেশের মধা দিয়ে শেখ মুজিব "বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার নির্দেশ দেন।"

ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে কিন্তু ৭ মার্চ "স্বাধীনতা ঘোষণার দিবস" হিসেবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

মুজিবনগর ঘোষণায় যা বলা হয়েছিল আজ পঁচিশ বছর পর তার অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে। একটি দেশের উত্থানের জন্য পঁচিশ বছর কম সময় নয়। কিন্তু এই সময়ে বাংলাদেশ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে মানুষের সাম্য, মানবিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার' সবই লুপ্ত। মুজিবনগর ঘোষণায় বাঙালি জাতির যে আত্মমর্যাদার কথা বলা হয়েছিল দৃপ্তভরে তা আজ অপসৃত। একটি জাতির উন্নয়নের জন্য যে দিক নির্দেশনার প্রয়োজন তার সবই ছিল আমাদের শাসনতন্ত্রে। আজ পঁচিশ বছর পর তা যুগোপযোগী নয় এমন কথা এখনও বলা যাবে না। ওই ঘোষণা, তথা শাসনতন্ত্র যদি নিষ্ঠভাবে মেনে চলা যায় তাহলে জাতি অনেক বিভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব দূর করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। ওই ঘোষণার মূল বাণী সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার কাঠামোও নির্মাণ করা যেতে পারে।

মুজিবনগর ঘোষণা দিয়েছিল জাতির পক্ষে আওয়ামী লীগ। ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিল জাতির পক্ষে আওয়ামী লীগ। এখন জাতির মর্যাদাজ্ঞাপক ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে আবার ফিরে যাবে কিনা তাও নির্ধারণ করতে পারে আওয়ামী লীগ।

স্বাধীনতা ঘোষণা : পুনরুক্তি করে বলা

বেলাল মোহাম্মদ

স্বাধীনতা ঘোষণা মানে একটি দেশ বা সীমানা চিহ্নিত এলাকাকে বিদেশি শাসনের কবল থেকে মুক্ত করে 'স্ব' বা নিজের অধীনে নিয়ে আসার ঘোষণা। এই ঘোষণা দুই প্রকার। এক, দীর্ঘসূত্রী পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র করে শাসককে সিংহাসনচ্যুত করে কিংবা জনগণের মনোনয়ন বা ম্যানডেট পেয়ে ছায়া সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া। দুই, বেতারে কণ্ঠক্ষেপণ, যা শিল্পী কথক সুলভ একটি কর্ম দায়িত্ব। আজকাল সম্মানী বেড়েছে। ১৯৭১ সালে একজন বেতার ঘোষকের দৈনিক সম্মানীর হার ছিল সম্ভবত পনেরো টাকা।

প্রথমোক্ত পর্যায়ের ঘোষণার সুযোগ কোনো জাতির জীবনে যে কারো ওপর বর্তায় না। এজন্য ব্যক্তিবিশেষকে জীবনভর অশেষ ত্যাগ ও তিতিক্ষা পোহাতে হয়, অন্য মনোবল প্রয়োগ করে জনবল ও ক্ষেত্রবিশেষে অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে উঠতে হয় একমাত্র দেশবরেণ্য নেতৃজনই উপযুক্ত সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকারী হয়ে থাকেন। ব্রিটিশ ভারতে দু'জন বাঙালি খণ্ডিতভাবে অঞ্চলবিশেষের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার লাভ করেছিলেন। একজন পশ্চিম বঙ্গের তিতুমীর, অন্যজন চট্টগ্রামের সূর্যসেন। ব্রিটিশের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা উড়ে গিয়েছিল। আর সূর্যসেন ও তার সাথীরা ব্রিটিশ শাসকের হাতে বন্দী এবং কারা বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিতুমীর ও সূর্যসেন সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রয়াসী হয়েছিলেন। সামরিক শক্তি প্রয়োগে সর্বভারতীয় স্বাধীনতার প্রয়াসী হয়েছিলেন একজন বিরল প্রজা বাঙালি সুভাষ বসুও। সর্ব ভারতীয় অবাঙালি নেতৃত্বের যোগসাজশে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সুভাষ বসুর রহস্যজনক অন্তর্ধান ঘটিয়েছিল, সূর্যসেন 'মাস্টারদা' নামে এবং সুভাষ বসু 'নেতাজি' নামে কালে কালে বাঙালিদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয়।

অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকও বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্যে প্রায় সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু সর্ব ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইফার বা শূন্যগর্ভ বনে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তান) বাঙালির জাতিসত্তা সংহত হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের

নেতৃত্বে। যুক্তফ্রন্টের তিন নেতা ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, এইচ এস সোহরাওয়ার্দী ও আবদুল হামিদ খান ভাসানী। অর্থাৎ সেই মুহূর্তে বাঙালির জাতিসত্তা একক নেতৃত্বের আসন প্রাপ্ত হয়নি।

বাঙালি জাতির জীবনে একক নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটেছিল ৬ দফাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আর তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশ দখলদার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হওয়া অবধি ৯ মাস। তার আগেও না, পরেও না, সেই রক্তক্ষয়ী ৯ মাসের এক অশরীর নেতৃত্বের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই সময়টুকুতে রাতের অন্ধকারে সামরিক দস্যুদের দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত একটি দেশ ও জাতি রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে আত্মরক্ষার তাগিদে সঙ্গতভাবেই জনগণের ভোটে বিজয়ী দলের নেতার একচ্ছত্র ছায়ায় যুদ্ধতৎপর। সেই ৯ মাস দেশ রণাঙ্গনের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার ধারণা হতো, স্বাধীনতা মানে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানের বাণী ছিল। ১। শোনো একটি মুজিবুরের থেকে লক্ষ মুজিবুরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, ২। সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম—মুজিবুর, ৩। তোমার নেতা শেখ মুজিব, আমার নেতা শেখ মুজিব, সবার নেতা শেখ মুজিব। ইত্যাদি, হ্যাঁ সেদিন ৭ মার্চ বাঙালি জাতির নেতা শেখ মুজিব সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রকাশ্য জনসভায়। আর ২৬ মার্চের পূর্ববর্তী গভীর রাতে কারারুদ্ধ হবার পূর্বাহ্নে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেছিলেন, যা বিভিন্ন মাধ্যমে দেশের অন্যান্য শহরে প্রেরিত হয়েছিল। চট্টগ্রামে সে রাতেই তা তার বার্তা হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকীর কাছে পৌঁছেছিল। সেই প্রত্যুষে বন্দরনগরীতে সেই ঘোষণা মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদক সেই মাইক্রোফোন ঘোষণার একজন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রোতা। বার্তাটি চট্টগ্রামের ডাক্তার দম্পতি আনোয়ার আলী-মঞ্জুলা আনোয়ারের উদ্যোগে বাংলায় অনূদিত ও সাইক্লোস্টাইলে কপিকৃত এবং হ্যান্ডবিলের মতো বিলি করা হয়েছিল। একটি কপি স্বয়ং আনোয়ার আলি এই প্রতিবেদককে সেদিন দুপুরে (২৬ মার্চ) দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এসব তথ্য ১৯৭২ সাল থেকে এ যাবৎ আমার বহু ব্যক্তিগত নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন স্মৃতিচারণ গ্রন্থে ব্যাপক বিধৃত।

বেতারে কণ্ঠক্ষেপণ পর্যায়ে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখি, ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রে আমিই ছিলাম উদ্যোক্তা সংগঠক। আমারই উদ্যোগে কেন্দ্রের নামকরণ ও ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনাসহ ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারটি স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী) বেতার কেন্দ্র হিসেবে সক্রিয় হয়েছিল। তার আগে সেদিন দুপুরে আমার অজ্ঞাতসারে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান নিজের প্রভাব খাটিয়ে বেতারের কয়েকজন প্রকৌশলীকে বাধ্য করেছিলেন ট্রান্সমিঢার চালু করতে এবং তিনি নিজের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রচার করেছিলেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা অনুষ্ঠানেও ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ওপরে দীর্ঘ বক্তব্য পাঠ করেছিলেন। তখন আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার নাম প্রচার করা হয়নি। ওই সময় এম এ হান্নানের সঙ্গে ট্রান্সমিটার ভবনে উপস্থিত ছিলেন বক্তব্যের মুসাবিদাকারী চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ডা. আবু জাফর। সেই অধিবেশনে আমাদের বিভিন্নজনের কণ্ঠে হ্যান্ডবিল আকারে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হওয়া ছাড়াও ক্ষুদে সংবাদ বুলেটিনেও তথ্যটি সংযোজিত হয়েছিল।

এদিকে ট্রান্সমিটার ভবনে পাহারা মোতায়েনের আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রস্তুতিকালেই আমি সচেতন ছিলাম এবং সেদিন দুপুরে রেলওয়ে বিল্ডিংয়ের পাহাড়ে ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছিলাম। তিনি কথা দিয়েছিলেন কয়েকজন জোয়ান পাঠাবেন বলে। কিন্তু পরে আর পাঠাননি। এ অবস্থায় প্রচার কাজের জনো অপরিহার্য প্রকৌশলী কর্মীদের ধরে রাখার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। পরের দিন কাকে পাওয়া যায় না যায়, এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুশ্চিন্তার বিষয়। গভীর রাতে ফোনে বন্ধু তাহের সোবাহানের (চন্দুনপুরা) কাছ থেকে জেনেছিলাম, চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর-করা পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ বাবর ও সোয়াত থেকে অস্ত্র নামিয়ে সেনানিবাসে নেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মেজর ও দেড়শ' জোয়ান ২৫ মার্চ রাতে ওই কাজে বিরত হয়ে সে রাতে পটিয়ায় অবস্থানরত। বন্ধুটি মেজরের নাম বলতে পারেননি।

পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ আমার বন্ধু মাহমুদ হোসেনের গাড়িতে করে পটিয়া গিয়ে দেখা পেয়েছিলাম মেজর জিয়ার। তিনি ২৬ মার্চের বেতার অনুষ্ঠান শুনছিলেন। আমি ট্রান্সমিটার ভবনে পাহারার ব্যবস্থা করার কথা বলতেই তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং প্রথমেই জোয়ানদের কালুরঘাটের দিকে যাত্রা করিয়ে

দিয়ে নিজেও সঙ্গী ক্যাপ্টেনদের নিয়ে একটি জিপ-এ আমাদের সঙ্গে ট্রান্সমিটারে ভবনে এসেছিলেন। সেই ২৭ মার্চ সন্ধ্যা অধিবেশনের প্রাক্কালে আমি কথার কথায় একান্তে তাকে বলেছিলাম, মেজর সাহেব, এখানে আমরা তো সবাই 'মাইনর' আপনিই একমাত্র 'মেজর' আপনি নিজের কণ্ঠে কিছু প্রচার করবেন কি?

এই প্রস্তাব এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তক্রমে আমার সাথে বসে ইংরেজি মুসাবিদা তৈরি হয়েছিল মেজর জিয়ার ঘোষণালিপির, যার প্রথম বাক্যাংশ ছিল : On behalf of our great national leader Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman. ২৮ মার্চ মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণা প্রচার প্রসঙ্গে নিজেকে Provisional head of Bangladesh and chief of liberation army দাবি করেছিলেন, বাইরে থেকে লিখে আনা খসড়াটির ব্যাপারে প্রচারের পূর্বাহ্নে আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বলেছিলাম 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষে' যোগ করতে। কিন্তু তা রক্ষিত হয়নি।

দ্বিতীয় ঘোষণাটি মান্যবর এ কে খান শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি পাল্টা ঘোষণালিপি তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাতে দ্বিতীয় ঘোষণার ভ্রম শোধরাবার প্রয়াস হিসেবে বারবার বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লিখিত। মেজর জিয়ার স্বকণ্ঠে ২৯ মার্চে প্রচারিত তৃতীয় ঘোষণাটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে চান্দগাঁও এর ওসমান গণি রেকর্ড করেছিলেন। যেটি সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া ৩০ মার্চ লিখেছিলেন। সেই হস্তলিপিটিও সংরক্ষিত আছে।

বস্তুত কালুরঘাটে আমাদের অন্যান্যদের মতোই মেজর জিয়াও ছিলেন বেতারের একজন ঘোষক মাত্র। তিনি তো নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে কিছু প্রচারের উদ্দেশ্যে বেতার কেন্দ্রে আসেননি, যে রকম এসেছিলেন ২৬ মার্চ দুই দুইবার এম এ হান্নান। মেজর জিয়া বরং আমার মতো একজন বেতার কর্মী বা ওই মুহূর্তে সমমনা বেতার কর্মীদের একটি ক্ষুদে টিম সংগঠনকারীর অনুরোধে ট্রান্সমিটার ভবনে পাহারা মোতায়েনের জন্যেই এগিয়ে এসেছিলেন, যে জন্যে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। মেজর জিয়ার ২৭ মার্চ সন্ধ্যার বেতার ঘোষণাকে authony Mascren has Zuvi Bangladesh Legacy of Blood গ্রন্থে 'a chance invitation বলে মন্তব্য করেছেন।

আর আমি সবসময় যা বলে থাকি, তা হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে যখন আমাদের নিরস্ত্র জনগণ দিশেহারা ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সামরিক অফিসারের কণ্ঠস্বর সবাইকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিল যে আমাদের পক্ষেও সেনাবাহিনী আছে। সেই পরম লগ্নে এম এ হান্নান কিংবা

আমাদের রাম-শ্যাম-যদু-মধুদের কণ্ঠে শতবার প্রচারের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথাও একজন বাঙালি মেজরের কণ্ঠে প্রচারিত হওয়ায় জনগণের মনে অশেষ সাহস সঞ্চারিত হয়েছিল, আর এতে করে নেতার প্রচারণার অন্যতম লক্ষ্য যে শ্রোতা সাধারণের মনোবল বৃদ্ধি করা , সেই লক্ষ্যেও অবলীলাক্রমে অর্জিত হয়েছিল। আর ঘটনাচক্রে মেজর জিয়ার কণ্ঠই ছিল বঙ্গবন্ধুর অনুসারী সেই সামরিক অফিসারের কণ্ঠ। এই আকস্মিকতা ক্যাপ্টেন রফিকের ক্ষেত্রেও হতে পারতো, যদি তিনি ২৬ মার্চ আমার অনুরোধে কালুরঘাটে আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসতেন। কিন্তু তিনি তো সেই দিনগুলোতে একা কিংবা মেজর জিয়ার সঙ্গে একবারও ট্রান্সমিটার ভবনে আসেননি। বস্তুত এম এ হান্নান ও ডা. আবু জাফর ২৬ মার্চের পর আর কালুরঘাটে পদার্পণ করেননি। ৩০ মার্চ কালুরঘাট বিমান হামলার পূর্ব পর্যন্ত আগমন ঘটেনি অন্যকোনো রাজনৈতিক নেতারও। একমাত্র স্থানীয় বাসিন্দা তরুণ রাজনৈতিক কর্মী সেকান্দার হায়াত খান ও তাঁর ভাই হারুন খান আমাদের সহযোগিতায় সারাক্ষণ ছিলেন আত্মনিয়োজিত ।

বলতে দ্বিধা নেই, বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার সঠিক তথ্যটি একমাত্র আমিই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে পুনরুক্তি করে লেখার মাধ্যমে লাগাতার দুই দশকব্যাপী সামরিক স্বৈরপ্রশাসন কিংবা সামরিক আশিষপুষ্ট সরকারের আমলেও স্মৃতিতে অম্লান রাখার চেষ্টা করে এসেছি। পাঠকরা লক্ষ করে থাকবেন, বৈরী পরিবেশে বানোয়াট তথ্যের অবতারণা কিংবা আমাদের মধ্যে কারো অসতর্ক ও বেসামাল অতিকথনের ফলে তথা বিকৃতি ঘটতে দেখলেই আমি সবসময় প্রতিবাদ করেছি। যথাসময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রতিবাদী নিবন্ধগুলো পরবর্তীতে আমার স্মৃতিচারণ গ্রন্থের (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) নতুন সংস্করণে সংযোজিত করা হয়েছে। সে সব খণ্ড রচনাও উৎসাহী পাঠকদের চোখে পড়তে পারে। তবে একথা হয়তো কারুরই অবহিত হবার কারণ নেই যে, এই সত্য তথ্য প্রকাশে অবিচল থাকার কারণে কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমাকে উচ্চতর বেতন স্কেলে ফিক্সেশন বেনিফিট মূলক ১২টি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ১৯৯৩ সালে। এবং সে অবস্থায় চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সুবাদে ১৯৯৪ সালে আমাকে স্বল্পতর হারে পেনশনে অবসর নিতে হয়েছে। চাকরিজীবনে একমাত্র মাসিক বেতনই জীবিকার অবলম্বন ছিল বলে আমার কোনো সঞ্চয় এবং ঢাকায় বা অন্যত্র কোথাও স্থাবর অস্থাবর কোনো সম্পত্তি নেই প্রেক্ষিতে, আমার ন্যায্য

প্রাপ্য থেকে পূর্ববর্তী সরকার নিজেদের রাজনৈতিক হীনমন্যতা ও বৈরিতার বশে আমাকে বঞ্চিত করায়, বর্তমান সরকারের কাছে তার প্রতিকার চেয়ে আমি আবেদন জানিয়ে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, মহান একাত্তরের শব্দ সৈনিকদের মধ্যে পরবর্তী কর্মজীবন ও অবসর জীবনে আমিই তো ন্যায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত একমাত্র ভুক্তভোগী। সম্মানিত পাঠক, মাঝপথে আনুষঙ্গিৎক কিছু বক্তব্য এসে গেলো, আবার ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে ২৬-৩০ মার্চ (১৯৭১) এই ৫ দিনে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ প্রথম ২/৩ দিন শ্রোতারা অনভ্যস্ত থাকায় ব্যাপকভাবে শোনেননি। ২৬ মার্চ দুপুর ও সন্ধ্যায় এম এ হান্নানের কণ্ঠ এবং আমাদের বিভিন্ন কণ্ঠ, আর ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় জিয়ার কণ্ঠস্বর বেশিরভাগ শ্রোতাই রেডিও সেট টিউন না করায় শুনতে পাননি। দু'একদিন পর থেকে কান-কানা-কান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা জানতে পেরে অনেকেই সারাক্ষণ সেট 'অন' করে রেখেছিলেন। এ অবস্থায় মেজর জিয়ার তৃতীয় ঘোষণাটিই (২৯ মার্চ) দেশব্যাপী শ্রুতিগ্রাহ্য হয়েছিল। এদিক ১০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের শ্রুত এলাকা ৫০ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে হলেও, ওই দিনগুলোতে রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, সিলেট বেতার কেন্দ্রগুলো স্তব্ধ থাকায় মধ্যবর্তী ইন্টারাপশন ছিল না, তাই উৎক্ষিপ্ত শব্দ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, ত্রিপুরার আগরতলা ও আসামের শিলচর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। সাম্প্রতিককালে আমি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ওই সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, কালুরঘাট থেকে প্রকাশিত অনুষ্ঠানমালায় কভারেজ দেখে চমৎকৃত হয়েছি।

স্বাধীনতার ঘোষণা বা ঘোষক বিষয়ক রাজনৈতিক বিতর্কটি একান্তভাবেই একটি নোংরা ও নিম্নমানের প্রসঙ্গ। জাতীয় মর্যাদায় বাঙালিদের প্রথম রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে মহাকালের আনুকূল্যে পেয়েছিলেন একমাত্র বঙ্গবন্ধুই। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাইরে আরো অনেক বাঙালি থাকলেও, বিশ্বসভায় (জাতিসংঘ) নিজের ভাষায় কথা বলবার আন্তর্জাতিক অধিকার পত্তন তথা বাঙালি জাতির পিতৃত্বে বঙ্গবন্ধুই অর্জন করেছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তার ভূমিকা নিয়েও কুতর্কের অবতারণা করা হয়। তার উত্তরে বলা যায়, পিতার ভূমিকা ভ্রূণ রক্ষা, পরবর্তী ৯ মাস ১০ দিন পিতার আশিষই সম্বল।

স্বাধীনতার ঘোষক পরিপ্রেক্ষিতে ভাবনা

এডভোকেট আমিন আহমেদ মন্টু

বাংলাদেশ আর স্বাধীনতা, পৃথিবীর মানচিত্রে এর নিজ অবস্থান এমনি এমনি হয়েছে এই কথা কেউ বলতে পারবে না। এই স্বাধীনতার পিছনে ছিল দীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা আর অধিকার হরণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত, এই কথাটি যেমনি সত্য ঠিক তেমনি এও সত্য যে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের এই অবস্থান পাওয়ার জন্য এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, পুলিশ, ইপিআর এবং বাঙালি সৈনিক ও সেনা-অফিসার কারো ভূমিকা খাটো করে দেখা সঠিক হবে না। তবে এ আরো সত্য যে, বাঙালি কিছুসংখ্যক ভিন্নমতালম্বী সমস্ত জাতীয় ধারার বিরুদ্ধে ছিল, তারা স্বাধীনতা চায়নি, ওরা পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবীসহ মুক্তিপাগল দেশবাসীকে হত্যা করার জন্য গড়ে তুলে ছিল রাজাকার আর আলবদর বাহিনী, তারা প্রকৃতপক্ষে ছিল মৌলবাদী, পাকিস্তান সরকার-এর দোসর ও সহায়ক শক্তি।

প্রসঙ্গক্রমেই বলতে হবে যে, এই স্বাধীনতা একদিনের কোনো একক শক্তির স্বইচ্ছার ফলে এসেছে বলা ঠিক হবে না। এর জন্য জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং এই প্রক্রিয়ায় সর্বদাই ভূমিকা রেখেছে সময়ের দাবি অনুসারে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এই প্রক্রিয়ায় প্রাণও দিতে হয়েছে অনেক অনেক। তাই বলতে হয় যে, ভাষা আন্দোলনের ভিতর থেকে জাতীয়তাবাদের বিকশিত চেতনার নবপর্যায়ের উত্থান আর এর দীর্ঘ পথ পার হবার পর মূল ফসল স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ আজকের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার ২৭ (সাতাশ) বছর পরও যে বিতর্ক আমাদের ইতিহাস আর সত্যকে আঘাত করে সে প্রসঙ্গে এবার আসছি। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক কে? তিনি কি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? তিনি কি তৎকালীন সেনা অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান? তিনি কি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা তৎকালীন এম পি জনাব হান্নান সাহেব—না কি অন্যকোনো ব্যক্তি?

এই বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য আরও একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, ঘোষণা বলতে আমরা কোনো ঘোষণাকে বুঝব? চট্টগ্রামের কালুরঘাটের ১৯৭১ এর ২৬ মার্চে দেয় বেতার ঘোষণাকে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মূল নেতার নির্দেশ দানকে, নাকি ওই গ্রামগঞ্জের মানুষের মনের স্বস্পৃহাকেও বলব ঘোষণা। তাই এই বিতর্কের মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই ঐতিহাসিক সত্যকে এবং জাতীয় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতগত অবস্থানকেও বিবেচনায় আনতে হবে।

এই কথা সত্য যে, ২৭ মার্চ, '৭১-এর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রথম যে বক্তব্য তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান দেন, ওই বক্তব্যকে এবং ভূমিকাকে কখনো কোনোভাবেই বাঙালি জাতি খাটো করে দেখে না। এই বক্তব্যের আবেদন তখন সকল মুক্তিকামী এ দেশের জনতার প্রাণে স্পৃহা জাগায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে প্রতিরোধ করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। তবে এও স্বীকার করা যায় না যে, ওইভাবে বেতার বক্তব্য না আসলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ হত না কারণ প্রতিরোধ আর যুদ্ধ মূলত ঢাকা নগরে ২৫ মার্চের কালো রাত থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। তবে এটা স্বীকার করা উচিত যে ওই বেতার বক্তব্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করার জন্য এবং একটা পদ্ধতিগত অবস্থানে জাতিকে আনার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। তাই এটাকে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা হিসেবে আখ্যায়িত না করে বলা যায় যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশকে প্রচার করার জন্য দেয় বেতার বিবৃতি বা বেতার আবেদন। এই বেতার ভাষণে মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে নিজকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা প্রদান করলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় ভাষণ সংশোধন করে দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন এই বক্তব্য প্রদান করেন। যা ছিল নিম্নরূপ:

"Major Zia of Bangladesh Liberation Army, Hereby Proclaims on behalf of great political leader Sheikh Mujibur RahmanThe Independence of Bangladesh.

I also declare we have already formed a sovereign legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and Constitution.

The new democratic Government is Committed to a policy of non alignment in international relations. It will seek

friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all government to mobilise public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal government of Bangladesh and is entitled to recognization from all democratic nations of the world."

এখানে দেখা যায় যে মেজর জিয়াউর রহমানের দেওয়া বেতার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব আর নির্দেশই প্রচার হয় দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আর সহযোগিতার জন্য।

আমাদের ইতিহাসের সঠিক চর্চা আর মূল্যায়ন করার জন্য ওই বেতার বক্তব্যের আবেদনকে এখন কোনো পর্যায়েই অবহেলা করা ঠিক নয়। আর তখনকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের একক বা মূল নেতৃত্ব প্রদানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয় নির্দেশ বা ঘোষণার কথাকেও অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। বঙ্গবন্ধুর দেয় নির্দেশ আর ঘোষণা ছিল নিম্নরূপ :

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, বাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন : সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

আলোচনার প্রাসঙ্গিক প্ররিপ্রেক্ষিত থেকে কেহ যদি বলেন স্বাধীনতার ঘোষক তৎকালীন সেনা-অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান। স্বাভাবিক কারণেই জাগরিত প্রশ্নের জবাবই মিলাবে পরিপ্রেক্ষিতগত ভাবনার উত্তর। উত্তর দিতে হবে এসকল প্রশ্নের ।

তিনি কেন ছিলেন না প্রবাসী সরকারের প্রধান?

তিনি কেন ছিলেন না মুক্তিযুদ্ধের সেনাধিনায়ক?

তিনি কেন ছিলেন, শুধুমাত্র একটি সেক্টরের প্রধান?

মুক্তিযুদ্ধ শুরুকরণের পূর্বে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র সংগঠিত করেছিলেন কি?

যদি তা না হয় তবে কি হঠাৎ করে কেও ঘোষণা প্রদান করলেই স্বাধীনতার জন্য দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন বা বলতে হবে কেন তিনি ছিলেন না স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হবার পর এ দেশের সরকার প্রধান? এই সরল প্রশ্নের উত্তরই বলে দেয় যে এই প্রস্তাবের সার্থকতা কতটুকু এবং যারা বলতে চান যে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক তারা শুধু ইতিহাস বিকৃত করতেই চান।

এবার স্বাভাবিকভাবে বিতর্কের প্রেক্ষিত আরো প্রশ্ন রাখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন কেন?

এই প্রশ্নের জবাব মিলাতে আজ আমাদের অবশ্যই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের দিকে তাকাতে হবে। তিনি বক্তব্যে বলেন এবারের সংগ্রাম, "মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি যদি নির্দেশ দিবার নাও পারি যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে।"

এই বক্তব্যের গভীরতা তাৎপর্য মুক্তিযুদ্ধের দিক দর্শনগত ক্রিয়া হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে ছিল। এছাড়া আরো বলতে হয় তিনি একদিনে বা একটি ঘটনা দিয়ে জাতিগতভাবে একক নেতায় পরিণত হন নাই। তিনি রাজনৈতিক মেধা, দৃঢ়তা, কৌশল আর লক্ষ্যের প্রতি অবিচল আস্থা নিয়ে দিনদিন বেড়ে ওঠে ছিলেন। তার প্রমাণ মিলে '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে, ৬ দফার আন্দোলন আর '৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে দেয় নেতৃত্বের মধ্যেও।

আমি আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্য থেকেই আবারও বলতে চাই যদি তিনি ঘোষণা প্রদান না করতেন তা হলে চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান এম পি কেন সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে বেতার বিবৃতি প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীনতার ঘোষণা না-ই প্রদান করেন তবে, কেন তিনি তার সহকর্মী নেতাদের ২৫ মার্চ সন্ধ্যারাতে নির্দেশ দিয়ে তাদের বাসভবনে থেকে সরে যেতে বলেন।

বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান না-ই করেন তবে কেন এবং কোন ভিত্তিতে ইপিআর, পুলিশ আর বাঙালি সেনা-কর্মকর্তা, সৈনিকরা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেছিলেন ২৫ মার্চ কালো রাত্রী থেকেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি স্বাধীনতার ঘোষক না-ই হয়ে থাকেন তবে কেন প্রবাসী সরকারের প্রধান তাকে করা হয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সরকার প্রধান ছিলেন কেন?

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য আলোচনায় বলতে হয় ১৯২০ সালে বাংলার দুর্গম পাড়াগাঁ মধুমতি আর বাঘিয়ার পলি বিধৌত শ্যামল গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার শিশু মুজিব সময় আর কালের দাবির প্রেক্ষিতেই আন্দোলন জেল জুলুম আর মানুষের অধিকার আদায়ের আস্থার বন্ধন হিসেবে '৭১-এ বাঙালি জাতির এক নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু হিসাবে অলিখিতভাবেই সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পান।

অন্যদিকে এই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার ও পরিক্রমার ধাক্কার ফসল ছিলেন তৎকালীন মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর রফিকুল ইসলাম, মেজর মীর শওকত আলী, মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন হায়দারসহ অনেক অনেক বাঙালি সেনা-অফিসার, সৈনিকরা ছিলেন। ওই ধাক্কারই ফসল ছিলেন ফ্লাইট লে. শহীদ মতিউর রহমান, বন্ধু শহীদ শাহজাহান, শহীদ ফজলু সহ ৩০ লক্ষ শহীদ প্রাণ আর স্বাধীনতার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা।

মিথ্যাচার আর বিকৃতির অবসানকরণের জন্য, জাতির সঠিক তথ্য চিত্র আগামী প্রজন্মের নিকট সঠিকভাবে উপস্থাপিত হওয়ার তাগাদায় এবং এই বিতর্কের অবসান হওয়ার প্রয়োজনীয়তাই বলে বিবৃতিমূলক বেতার বক্তব্য দাতাকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রয়াসকে কোনো অবস্থায়ই উৎসাহিত করা যায় না।

রক্তাক্ত বাংলা ও স্বাধীনতার ঘোষণার ক্ষণ

জহিরুল ইসলাম

উনিশ শত একাত্তরের ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে 'মুক্তির সংগ্রাম' আর স্বাধীনতার সংগ্রাম' এর যে সূত্র বঙ্গবন্ধু উপস্থাপন করেছিলেন, ২৫ মার্চের মধ্যরাতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে—"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। হৃদয় নিংড়ানো এই ঐতিহাসিক ভাষণেই ছিল স্বাধীনতার মন্ত্র স্বাধীনতার ঘোষণা। এই ঘোষণাতেই ছিল বাঙালির হাজার বছরের প্রত্যাশাকে রূপ দেয়ার সুস্পষ্ট আহ্বান—"আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না, সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবে না।"

এই শব্দমালাই ছিল বাঙালি জীবনের সহাকাম্য, ওই শব্দমালাই বাঙালির হাজার বছরের মুক্তির স্বপ্নকে উদ্ভাবিত করে তুলেছিল। সেদিন সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান উচ্চারিত হয়েছিল তার 'মোহন সুরে'। এ ছিল মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান, চিরাচরিত গেরিলা যুদ্ধের ডাক : "তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

বাণীর প্রেরণা

বঙ্গবন্ধুর এই বাণীই বাঙালি জাতিকে যুগিয়েছিল ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধকালের প্রেরণা। ২৫ মার্চের কালো রাত দখলদার বাহিনীর অত্যাধুনিক "Fire power" এর সামনে বুক পেতে দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা এই বাণীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই। আনসার-পুলিশ, ইপিআর, ইবিআর, সেনা-সামন্ত, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কিষাণ, মাঝি-মাল্লা, মা-বোন, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, পাহাড়-সাঁওতাল, সারা বাংলা, সমগ্র বাঙালি জাতি রক্তাক্ত বাংলা, সারা বিশ্ব...

পাকহানাদার বাহিনী আর তাদের দোসররা সর্বত্রই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। অন্য কারোর ঘোষণার জন্য বাঙালি অপেক্ষা করেনি। শুধু ২৫ মার্চ নয়, তার আগেও বাঙালি প্রতিরোধ করেছে, জীবন দিয়েছে, বুকের রক্তে মাতৃভূমিকে সিক্ত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

বাঙালি জাতি সেদিন কোনো প্রশ্ন করেনি, তারা হানানার বাহিনীর কামান-বন্দুক আর ট্যাঙ্কের সামনে জীবনবাজি রাখতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণগুলোর অনুসরণে মুক্ত স্বদেশের জন্য তারা নিঃশঙ্কচিত্তে নিজেদের জীবন আহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিল। 'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা করিবে দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

একটি নাম

আজকাল অবশ্য অনেকে দাবি করে থাকেন যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চাননি, স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, তিনি পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদি বাংলার স্বাধীনতা না চাইতেন এবং স্বেচ্ছায় পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন, তা হলে তিনি পাকিস্তানিদের সাথে সমঝোতা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন না কেন? ১৯৮০ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তদানীন্তন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (মরহুম) এ সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার মধ্যেই এর জবাব রয়েছে : "কেউ বলেন তিনি সাধীনতা চাননি, কেউ বলেন তিনি বাংলাদেশ চাননি, কেউ বলেন তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কেউ বলেন তিনি পতাকা উড়াননি, কেউ বলেন তিনি পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই। এর জবাব একটি ২৬ মার্চ রাতে রেডিও মারফত ইয়াহিয়া সাহেব যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণে শুধু একটি নামই ছিল, সেই নাম শেখ মুজিব। কত লোক স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন, কত লোক পতাকা উড়িয়েছেন, কত লোক প্রাণ দিয়েছেন, কত লোক দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, নাম কারও আসে নাই ইতিহাসের পাতায়। নরাধম ইয়াহিয়ার খাতায় একটি নাম ছিল, Mujib is a traitor to the nation, this time he will not go unpunished, জিজ্ঞাসা করুন তাদের যে মানুষ কিছু করল না, স্বাধীনতার ঘোষণা করল না, বাংলাদেশ চাইল না, পতাকা উড়াল না, তার ওপর তোমাদের কেন এত রাগ? আমরা এতো কিছুই করলাম, আমাদের নাম তো তোমাদের খাতায় উঠল না?

ঘোষণার ক্ষণ

শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের নিকট পরিষ্কারভাবে জানা ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। আবহমানকাল ধরে নিজস্ব জাতিসত্তার জন্য ধাপে ধাপে সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধুর আপসহীন নেতৃত্ব বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ঘোষণার ক্ষণটিতে এসে হাজির হয়েছিল। এমনি তরোভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আগুনে প্রজ্বলিত হয়ে প্রতিটি বাঙালি সেদিন আত্মাহুতির জন্য তৈরি হয়েছিল বলেই মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করতে পেরেছিলেন তাও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে।

প্রকৃতঅর্থে সেদিন প্রতিটি বাঙালিই হয়েছিলেন মনেপ্রাণে একেকজন স্বাধীনতা ঘোষণার 'প্রচারক'। এখন যতোই উচ্চকণ্ঠে বাস্তব সত্য হলো যে, মেজর জিয়া, মেজর মীর শওকত, ক্যাপ্টেন অলিসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাও বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে। আর যদি রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল না হতো বাঙালি জাতি যদি বঙ্গবন্ধুর ডাকে এক না হতো, তা হলে কোনো বাছাধনকে আর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করতে হতো না। আর যদি স্বাধীনতার একচ্ছত্র ঘোষক হওয়ার কারুর খায়েস থাকত, তাহলে তিনি ১লা মার্চ বা ৭ মার্চের আগে সর্বশেষ ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করার মতো বুকের পাটা দেখাতে পারলে বুঝতাম কত ধানে কত চাল, অন্যের আলো ধারকের আলোকিত হয়ে আলোর মালিকানা দাবি করার মতো আর কি!

আলোকবর্তিকা

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে তৎকালীন মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ২৭ মার্চ স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রচার করেন, তা ছিল ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণার অনুসরণ। তবে এ ঘোষণার সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই ঘোষণা সেদিন সমগ্র বাঙালি জনতার নিকট এসেছিল আলোকবর্তিকা হয়ে। আমাদের মতো যারাই এ ঘোষণা শুনেছিলেন, তারা আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, না সব শেষ হয়ে যায়নি, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছে মাত্র। আর অস্ট্রেলিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন—এবিসি, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন—বিবিসি, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিও মস্কো, জার্মান রেডিও, রেডিও জাপানসহ এই ঘোষণা বিশ্বের অন্যান্য বেতার কেন্দ্র থেকে পুনঃসম্প্রচার (রিলে) করার ফলে বিশ্বব্যাপী এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

বাংলার ৬৮ হাজার গ্রাম ও গঞ্জে, বাংলার ঘরে ঘরে হাজার হাজার মুক্তিপাগল মানুষ ছাড়াও মেজর জিয়ার আগে পরে অনেকেই, যেমন মেজর সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর রফিক, মেজর ওসমান, মেজর জলিল, মেজর হায়দার, মেজর মীর শওকত, মেজর সি আর দত্ত, উইং কমান্ডার বাশার, মেজর নুরুজ্জামান, ফ্লাইট লে. এম হামিদুল্লাহ, ক্যাপ্টেন অলি আহাদ, কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী এবং পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মেজর মঞ্জুর, মেজর তাহের, মেজর জিয়াউদ্দিন, মেজর হামিদ প্রমুখ বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তাদের অধীনস্থ সেনাদের নিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী, চিফ অব স্টাফ কর্নেল (অব) আবদুর রব এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুফ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আর মেজর জিয়ার উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার কর্নেল এম আর চৌধুরীকে স্বাধীনতা ঘোষণার কারণে পাকিস্তানি জল্লাদদের হাতে ওই রাতেই জীবন দিতে হয়েছিল। তবে মেজর জিয়ার সাথে তাদের পার্থক্য হলো যে, তারা জিয়ার মতো ঘোষণা প্রচার করার বেতার কেন্দ্র পাননি।

"Soon after darkness fell on March 25 (1971) the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wave length close to that of official pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. He called on Bengalis to go underground, to reorganise and to attack the invaders." (David Loshak, Pakistan Crisis, heinemann, 1971, London. pp.89).

এতদঞ্চলে পাক হানাদার বাহিনীর তদানীন্তন প্রচার কর্মকর্তা Major siddiq Salik তার Witness to surrender বইয়ে (পৃ. ৭৫) উপরে উল্লিখিত David Loshak এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। ১৯৭১-এর দিকে ডেভিড লুশাক ভারতে ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ-এর কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারকীয় গণহত্যা শুরুর সূচনা হিসাবে When the first shot had been fired অর্থাৎ যখন প্রথম গোলাটি বর্ষণ করা হলো, তখন পাকিস্তানি

রেডিও'র কাছাকাছি এক বেতার তরঙ্গে নিম্নস্বরে ভেসে আসল শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ। তাতে পূর্বধারণকৃত বাণীতে পূর্ব পাকিস্তানকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' বলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এই বাণীতে ছিল চূড়ান্তভাবে দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য নির্দেশ।

উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রয়োজনীয় সময়ে ৭ মার্চের 'স্বাধীনতা ঘোষণার' পরিপূরক হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা' রেডিওতে প্রচারের জন্য আগে থেকেই ইংরেজি ভাষায় একটি বাণীবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার মুহূর্তে যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা বেজে ওঠে, সে রকম ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল।

ভাষণের অনুকরণ

তবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার যে 'ঘোষণা' ছিল তারই অনুকরণে প্রতিটি বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হচ্ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 'যাদের মনে কিছুটা সংশয় ছিল, ২৫ মার্চের কালো রাত্রির পরে When the first shot had been fired অর্থাৎ যখন প্রথম গোলাটি বর্ষণ করা হলো, তখন থেকে প্রতিটি বাঙালি হয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষক এবং মুক্তিসেনা।

অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেসের এককালীন সাধারণ সম্পাদক, সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য এবং মুজিবপূর্ব আওয়ামী লীগ নেতা ও জনপ্রিয় লেখক আবুল মনসুর আহমদ তার 'শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের 'কনফ্রন্টেশান' এর আগে কেউ বাঙালি ছিল না, এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পরে কেউ পাকিস্তানি ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে ছিল, এ বিষয়ে এক সাক্ষাতকারে ৫ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক লে. জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী বীর উত্তম বলেছিলেন, একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১৬৮-৬৯)।

স্বাধীনতার প্রেরণা

এটা অনস্বীকায যে, ২৫ এবং ২৬ মার্চ, '৭১-এর চরম মুহূর্তে বাঙালির মনেই স্বাধীনতার কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই হিসেবে প্রতিটি বাঙালি সেদিন হয়ে

উঠেছিল এক একজন ঘোষক। কিন্তু কে সেই মহান নেতা যিনি সেদিন অন্তরালে থেকেও প্রতিটি বাঙালিকে যুগিয়েছিলেন এই সাহস? কার আহ্বানে বাঙালি সেদিন পেয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রেরণা?

৭ মার্চ '৭১ ঢাকার রেসকোস ময়দানে (পরবর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) কে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক শুনিয়েছিলেন? ২৬ মার্চ, '৭১ সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের মূল বেতার কেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে অবস্থান করে যারা স্বাধীনতার কথা বললেন, বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করলেন, কে তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিলেন? তার পক্ষে তারা প্রচার করেছিলেন সে সব ঘোষণা, স্বাধীনতার কথা? কাজেই বলুন কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি? কে বা কারা ঘোষক ছিলেন, সেটা কি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ছিল না?

অবশ্য পঞ্চম সংসদের অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় কেউ কেউ দাবি করেছিলেন যে, মেজর জিয়াই ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, যদিও পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত মীর শওকতের বক্তব্যের সাথে এর বৈপরীত্য লক্ষণীয়। ইতিহাস সাক্ষী যে, ১৯৭১ এর ২৭ মার্চ তারিখে মেজর জিয়া প্রথম কালুরঘাটের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' আসেন এবং তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেন। ওই দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ বেতার কর্মী বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন এবং পরে কয়েকবার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়।

প্রচারিত বার্তা

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাতে প্রচারিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণার এই বাণীটি দেশের বিভিন্নস্থানে নেতৃবৃন্দের নিকট পাঠানো হয়েছিল। এই বার্তার মুদ্রিত ইংরেজি কপি ২৬ মার্চ সকালে চট্টগ্রামবাসীর হস্তগত হয়। এই বাণীটি নিম্নরূপ :

"This may be my last message. From today Bangladesh is independent. The Paksistan Army has attacked police lines at Rajarbagh and East pakistan Rifles at Pilkhana at midnight. Get strength to resist and prepare for a war of independence. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. You right must go on until the last soldier of

Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved" (Quoted from `Message, Robert Paine, pp 24, McMillan Co. New York). (বাংলা রূপান্তর, 'এটাই হয়ত আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। পাকিস্তানি সেনারা মধ্যরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস আক্রমণ করেছে। তাদের প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় কর এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে যেখানে আছ এবং যা তোমাদের কাছে আছে, তা দিয়ে দখলদার বাহিনীকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সর্বশেষ সেনাটি বাংলাদেশ থেকে বিতারিত না করা পর্যন্ত এবং পূর্ণ বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই অব্যাহত রাখবে।)

বেতার কেন্দ্র

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলায় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস' শীর্ষক এক নিবন্ধে ডা. আনোয়ার আলী স্বাধীনতার ঘোষণার প্রচার সম্পর্কে বলেন, "আমার স্পষ্ট মনে আছে আগ্রাবাদ হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কদমতলী হয়ে আমরা রিয়াজউদ্দীন বাজারে যাই এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসি। ফেরার পথে আগ্রাবাদ রোডে (বর্তমান শেখ মুজিব রোড) একজন লোক টেলিগ্রাম বলে চেঁচাচ্ছিল আর এক টুকরা কাগজ বিলি করছিল। গাড়ি থামিয়ে একটি কাগজ সংগ্রহ করি। সে কাগজটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত একটি ইংরেজি বাণী : ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার ঘটনাবলী উল্লেখ করে বিশ্ববাসীর প্রতি সাহায্যের আবেদন আর দেশবাসীর প্রতি প্রতিরোধের নির্দেশ।"

পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধে ডা. আনোয়ার আলী উল্লেখ করেন যে, তাঁর স্ত্রী মনজুলা আনোয়ার ওই বাণীটির বাংলা ভাবানুবাদ করেন। ২৬ মার্চ অপরাহ্ন পৌনে দুটোর সময় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্রে যান। তিনি সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার এই বাণীটির বাংলা ভাষণ পাঠ করে শোনান। একইদিন বিকাল নাগাদ বেতার শিল্পী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্রটিকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নাম দিয়ে চালু করার পর রাত ৭টা ৪০ মিনিটের সময় বাণীটি পুনঃপ্রচার করা হচ্ছিল।

সংসদ সদস্য সেনগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে (একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌমুরী, পৃ. ৩৮৬-৮৭) বলেন মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে আমি সিলেটে আমার নির্বাচনী এলাকায় ছিলাম। ২৬ মার্চ '৭১ একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামের প্রেরকের ঠিকানায় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল। ... টেলিগ্রাম খানা ছিল ইংরেজিতে। তবে এতে যা ছিল তার অর্থ এই দাঁড়ায়, আমরা আক্রান্ত। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। তোমরা শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা কর।

ইংরেজি অনুলিপি

আওয়ামী লীগের এককালীন প্রবীণ নেতা আবদুল মালেক উকিল (মরহুম) এক বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬) উল্লেখ করেছিলেন যে, ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ নোযাখালী জেলা সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, ছাত্র, যুবক, প্রশাসনিক কমকর্তাসহ গণ্যমানা নাগরিকদের এক সম্মিলিত সভা হয়। এই সভায় তদানীন্তণ জেলা প্রশাসক মঞ্জুরুল করিম বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বামীনতাযুদ্ধের ঘোষণার একটি ইংরেজি অনুলিপি মালেক উকিল সাহেবের হাতে দেন। ... 'বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাস' (পৃষ্ঠা- ৫৯১) শীর্ষক বইয়ে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, ২৬ মার্চ সকাল ৮ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা নুরুল ইসলাম মঞ্জু (সংসদ সদস্য) পান এবং তিনি তারবার্তার অনুলিপি পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর ভোলায় পাঠিয়ে দেন।

Bangladesh : Constitutional Ques for Autonomy গ্রন্থে (পৃ. ২৫৪) মওদুদ আহমদ বলেন যে, জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। At six in the afternoon of March 27, Zia declared over Radio: Bangladesh is a sovereign and independent state.

জেনারেল ওসমানী

লন্ডন থেকে প্রকাশিত সানরাইজ পত্রিকায় ১৯৮০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জিয়া ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

ড. রওনক জাহান তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন যে, সামরিক কর্মকাণ্ড পাকিস্তান এক রাখার সর্বশেষ আশা ধ্বংস করে দেয় এবং আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর

রহমানের নামে ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় : "The military action destroyed the last hope of saving the unity of Pakistan, and on March 26, the independence of Bangladesh was formally declared in the name of Awami League and its leader, Sheikh Mujibur Rahman." (Dr. Raunaq Jahan, pakistan : failure in national integration, pp. 197. Columbia University press USA. 1972).

মেজর (বর্তমান মেজর জেনারেল) সুবিদ আলী ভূঁইয়া এ সম্পর্কে লিখেছেন: "২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়া চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পৌঁছলেন ... মেজর জিয়া তার প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে 'হেড অব দি স্টেট' অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান রূপেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে এই তথ্যই প্রকাশ পায় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে।" (মেজর এস এ ভূঁইয়া, মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪ , পৃ. ৪৪-৪৫)।

অসহযোগ আন্দোলন তথা বাঙালি জাতিসত্তার সার্বিক আন্দোলনকে Unilateral declared of independence হিসাবে আখ্যায়িত করে লন্ডনের The Times পত্রিকার paul Martin উল্লেখ করেন : The movement for independence gradually matured from a protest strike to a fully-disciplined civil disobedience campaign brodering unilateral declaration of independence.

২৩ মার্চ

বস্তুত, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ২৩ মার্চ থেকেই শেখ মুজিব 'স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং আর কোনোপ্রকার আলাপ-আলোচনা চালানো প্রয়াস বলে মনে করেছিল। অধুনালুপ্ত ঢাকার ইংরেজি দৈনিক Newsday পত্রিকার সম্পাদক এবিএম মুসার সাথে এক সাক্ষাতকারে তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক এবং লাট সাহেব হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য অপেক্ষমাণ জেনারেল টিক্কা খান বলেছেন যে, ২৩ মার্চে 'বাংলাদেশ পতাকা' উত্তোলন, বাংলাদেশের 'জাতীয় সঙ্গীত' বাজান এবং সামরিক বাহিনীর অনুকরণে কুচকাওয়াজ, পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের উত্থানের ওপর ক্রোড়পত্র প্রকাশ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের

অবস্থাই প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে ওইদিন থেকে আর্মি, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, ইত্যাদি বাহিনীতে কর্মরত বাঙালিদের বিদ্রোহ করার নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছিল। বাঙালি জাতিসত্তার উদ্বোধন ব্যহত করে বাঙালি জাতিকে দাসানুদাস বানিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা হিসাবে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধন্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রচার অধিকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিক তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন : "They burnt the pakistan flag, tore down the Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah's potrait and burnt his effigy. Instead, they flew the new flag of independent Bangladesh and displayed potraits of Sheikh Mujibur Rahman. The Radio and Television played Tegore's `Soner Bangla` as the new national anthem. It was not just a student prank. Mujib was a party to it. He received a delegation of student leaders at his residence in the morning, allowed them to hoist the Bangladesh flag on his roof-top (the defato president's House) and a salute from the student. rally in front of his house."

জিয়ার কণ্ঠ

২৭ মার্চ সামরিক বাহিনীতে কর্মরত মেজর জিয়াউর রহমান-এর কণ্ঠে ওই বেতার কেন্দ্র মারফত বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে ইংরেজিতে নিম্নবর্ণিত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয় : Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of Bangladesh Liberation Army, hereby proclaims on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh. I also declare, we have already formed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledge to function as per law and constitution. The new democratic government is committed to a policy of non-alignment in international peace. I appeal to all government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nationals of the world. (Bangladesh Swadhinata Judha, Dahilpatra, tritiya khanda, pp. 1)

আজীবন সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত সব ক'টি গণআন্দোলনের সাথে এ কাজ থেকে নিজেকে জননেতা থেকে রাষ্ট্রনায়কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, সঠিকভাবে সংগ্রামের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে তিনি যদি জাতিকে ইপ্সিত লক্ষ্যে নিয়ে না যেতে পারতেন, তা হলে স্বাধীনতার প্রচারক বা পরিকল্পনাকারী বা পতাকার ডিজাইনার বা আদর্শের চিন্তাবিদ হওয়ার দাবি করার মতো সৌভাগ্য কোনো বাছাধনের হতো না।

গতিময় নেতৃত্ব

এখন অনেকেই বড় বড় কথা বলেন তাদের অতীত সকলেরই জানা আছে। তারা ইতিহাস বিকৃত করার 'প্রকল্প' কার্যকর করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আত্মমগ্ন। সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, বঙ্গবন্ধুর গতিময় নেতৃত্ব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণেই আজ অনেকের পক্ষে রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/মহাসচিব/জেনারেল/ব্রিগেডিয়ার হওয়া সম্ভব হয়েছে। ধনেজনে যারা বড়লোক হয়েছেন, বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ না হলে তারা কদাচিত এ ধরনের অধিকারী হতে পারতেন।

সর্বশেষ, কী প্রক্রিয়ায় কে, কী অবস্থায় বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছেন, তার উৎস ইতিহাস বিকৃতি ও অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা সুফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না, সে শুধু সময়ের ব্যাপার। বস্তুত, অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েই নিজের কর্মকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমরা অন্যকে মর্যাদা দিতে পারার মতো দরাজদিলের অধিকারী নই, তাই কূপমণ্ডুকতার আশ্রয় নেই।

সংবিধানের প্রস্তাবনা

অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে, এই বিতর্কটি এখন জিইয়ে রাখার প্রধানতম কারণ হচ্ছে সংবিধানে 'স্বাধীনতা' ঘোষণার তারিখ রয়েছে ২৬ মার্চ। এতদসংক্রান্ত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লেখায় এই তারিখটির উল্লেখ থাকার কারণে সংবিধানের যে মূল 'প্রস্তাবনা' রয়েছে, তাতে কিছু পরিবর্তন করা হয়। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর 'ঐতিহাসিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের' পরিবর্তে 'জাতীয় স্বাধীনতার ঐতিহাসিক যুদ্ধের' কথাগুলো সংযোজন করা হয়। এর ফলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিসত্তার যে সংগ্রাম চলছিল

বিশেষ করে, ১৯৪৮ থেকে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, '৬১-এর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী '৬২-এর আন্দোলন, '৬৪-এর দাঙ্গা প্রতিরোধ, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন, এই সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার একটি প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। কিন্তু 'স্বাধীনতা' ঘোষণার তারিখটি বদল করা সম্ভব হয়নি বা খেয়াল ছিল না। সংবিধানের পরিবর্তিত 'প্রস্তাবনা' নিম্নরূপ : 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ইংরেজিতে "a historic war for national independence was substituted for a historic struggle for national liberation:."

প্রত্যাশিত সুর

তবে, প্রকৃতঅর্থে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল শ্বাশত বাঙালির প্রত্যাশিত সুর : "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এ ছিল আবহমান বাংলার প্রত্যাশাকে এক দফায় রূপান্তরকরণ। হাজার বছর ধরে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, শোষিত, বাংলার মানুষের অন্তরে চিরন্তন যে স্বপ্ন গুমরে ফিরছিল, তা প্রকাশ পেয়েছিল শেখ মুজিবের কণ্ঠে। বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের উত্থান ঘটল শেখ মুজিবের নেতৃত্বে।

"এ দেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার চোখে সোনা,
আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা।"

বঙ্গবন্ধু যেভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন

সরদার সিরাজুল ইসলাম

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের সমাপ্তি 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এর মধ্যে শুধু স্বাধীনতার স্পষ্ট উচ্চারণই ছিল না, বরং যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশও ছিল। বঙ্গবন্ধু নজিরবিহীন অসহযোগ প্যারালাল সরকার পরিচালনার পাশাপাশি বিনা রক্তপাতে ভূ-খণ্ড শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা চালিয়েছিলেন ১৫ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত (২৬ মাচ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া বেতার ভাষণে বলেন যে, আলোচনার নামে শেখ মুজিব আলাদা একটা রাষ্ট্রগঠনের ঘোষণা আদায় করতে চেয়েছিলো।) একই সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুকে মোকাবিলার জন্য গ্রাম-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে জনগণের সশস্ত্র ট্রেনিংও চলছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ২৫ মার্চ দুপুর নাগাদ বঙ্গবন্ধুর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আসছে না। ইয়াহিয়া খান আলোচনার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি না দিয়েই বাঙালি হত্যার নির্দেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা আগেই জানতে পেরে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বঙ্গবন্ধু প্রতিবেশী মোশারফ হোসেনের মারফত চট্টগ্রামে এম আর সিদ্দিকীর কাছে ফোনে চট্টগ্রামকে মুক্ত রেখে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ, শত্রুকে মোকাবিলার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং কুমিল্লা থেকে পাকবাহিনীর হামলা প্রতিরোধের লক্ষ্যে শুভপুর ব্রিজ ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেন। বার্তা নিয়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ড. জাফর সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের কাছে পৌঁছেন রাত সাড়ে আটটায় এবং চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রফিকই প্রথম বিদ্রোহ করেন। মেজর জিয়ার দপ্তর ছিল যোলশহর ২ নম্বর রেলগেটের কাছে। বঙ্গবন্ধুর বার্তা জিয়ার দপ্তরে পৌঁছে রাত এগারোটা নাগাদ। তখন ডিউটি অফিসার ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান জানান যে, মেজর জিয়া পাকবাহিনীর অস্ত্র খালাসের জন্য বন্দরে গেছেন। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান আগ্রাবাদ থেকে জিয়াকে ফিরিয়ে আনেন। নিজ ইউনিটে এসে

মেজর জিয়া সে রাতেই তার পুরো ইউনিট নিয়ে শহর ছেড়ে বোয়ালখালী জেলার করলডাঙ্গা গ্রামে (শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে) পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে প্রসঙ্গ থাক।

২৫ মার্চ দিবাগত রাত বারোটার পরে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাটি (ইংরেজিতে দেয়া) সংকলিত রয়েছে জেনারেল জিয়া কর্তৃক ২৩ আগস্ট ১৯৭৭ তারিখে নিযুক্ত প্রকল্পে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১)। ২৬ মার্চের উক্ত দলিল নিম্নরূপ : "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh whereever you might be and whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ৫ দিন পরে (১৬-১-১৯৭২ইং) বঙ্গবন্ধু নিউইয়র্ক টাইমস এর বিশেষ প্রতিনিধি সিডনি সেনবার্গের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উক্ত ঘোষণা যে রেকর্ড করা হয়েছিল সে তথ্য প্রকাশ করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ঘোষণা কখন তৈরি হলো। সে প্রসঙ্গে জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহম্মদ, সাপ্তাহিক বিচিত্রায় (২৩-৩-১৯৯০) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "মূলত পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয় রাত ১০ টারও পরে। ইকবাল হল থেকে কিছু দূরে গুলির আওয়াজ শুরু হলো। কারেন্ট চলে গেলো। ঠিক এই সময় সিরাজুল আলম খান এলেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে। তিনি বলেন, কিছু সময়ের মধ্যে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সম্ভাবনা আছে। ইপিআর এর পিলখানাস্থ ওয়ারলেস সেট থেকে এ ঘোষরা দেয়া হলো"। তাৎক্ষণিক ঘটনা সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কাজী আরেফ এর ভাষ্য অনুসারে বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক দলিলটি প্রণীত হয় ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগ (সন্ধ্যা ৭টা) এবং রাত ১০টার মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। ১১ ডিসেম্বর ৯১ তারিখে চট্টগ্রামে কাজী আরেফ এই লেখকের কাছে বলেছেন, উল্লিখিত ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে টেপ করা হয়েছিল। রাত ১২টার পরে ঘোষণাটি শুধু ইপিআর নয় বরং টিএন্ডটি ওয়ারলেসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সারারাত ধরে সম্প্রচারিত এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্রই কর্তব্যরত কর্মচারীরা তা টেলিগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহম্মদ চৌধুরীর বাড়িতে বার্তাটি পৌঁছলে সে রাতেই সাইক্লোস্টাইল করে

শহরে বিতরণ এবং মাইকযোগে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ঘোষণাটি দেশের অন্যান্য সব শহর, থানাসহ সব টেলিগ্রাম অফিসে পৌঁছে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ প্রচারের ব্যবস্থা নেন। এ প্রসঙ্গে কট্টর মুজিববিরোধী শ্রী নির্মল সেন 'মা জন্মভূমি' গ্রন্থে (পৃ. ৫২) লিখেছেন- "প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ রাত্রে শেখ সাহেব পাঠিয়েছিলেন বেতার মারফত। ঘোষণাটি ২৬ মার্চ আমাদের থানার ডাকঘরে এসেছিল। আহ্বান এসেছিল শেখ মুজিবের নামেই। আমি নিজের চোখে সে ঘোষণাটি দেখেছি। এ ব্যাপারে কারো ধার করা কথার তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে আমি রাজি নই।"

২৬ মার্চ সন্ধ্যায় বিবিসি'র সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে এবং ২৭ মার্চ এর বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ঘোষণার খবর প্রচারিত হয় (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র চতুর্দশ খণ্ড পৃ. ৪৫১-৪৭২)। হানাদার বাহিনীর জেনারেল নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক "উইটনেস টু সারেন্ডার" গ্রন্থে (পৃ. ৮৫) লিখেছেন—"২৫ মার্চ রাতে যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিও'র সরকারি তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্বপাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন।"

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী ২৬ মার্চ দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা এবং এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টার চালু করে প্রচার করেন। মেজর জিয়া ২৭ তারিখ দুপুর পর্যন্ত ছিলেন করলডাঙ্গা গ্রামে। বেতারকর্মী বেলাল মোহাম্মদ করলডাঙ্গা গ্রামে গিয়ে বেতার কেন্দ্র পাহারার জন্য ২৭ মার্চ সন্ধ্যা নাগাদ মেজর জিয়া এবং তার কিছু সৈনিক নিয়ে আসেন। (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : পৃষ্ঠা ২৭ দ্রষ্টব্য) ঘটনাচক্রে সেই সন্ধ্যায় মেজর জিয়া বেতার ভাষণ দেন, যা শুরু হয়েছিল এভাবে—"The government of the sovereign state of Bangladesh on behalf of our great leader the supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh and the government handed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed..." চারবার মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত মেজর জিয়ার বাণীবদ্ধ টেপটি বাজারে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার প্রথমলগ্ন থেকেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সে সময় চট্টগ্রামে কর্তব্যরত ক্যাপ্টেন রফিকের "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এবং ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়ার মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা উভয়েই শহরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় ২৬ মার্চ এম এ হান্নানের কণ্ঠে এবং ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী শুনতে পেয়েছেন। মেজর মীর শওকত আলী এক সাক্ষাৎকারে (একাত্তরের রণাঙ্গন পৃষ্ঠা ১৬৭) একই বক্তব্য রেখেছেন। মেজর জিয়া ১৯৭২ সালে বিচিত্রা'য় প্রকাশিত (একাত্তরের রণাঙ্গন, পৃষ্ঠা ৪৩ এ সংকলিত) এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "২৭ মার্চ শহরের চারদিকে বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'ছায় রেডিও স্টেশনে এলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণার কথা লিখলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘোষণা বেতারে প্রচার হলো।"

বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বন্দি হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা তৈরি করে টিএ টি/ইপিআর-এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যাবস্থা নিয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে যারা এ ব্যাপারে সন্দিহান তাদের কাছে প্রশ্ন তাহলে সে রাতের সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী সারাদেশে পাঠালো কে? বিবিসি'র সান্ধ্যকালীন অধিবেশনেই বা কিভাবে প্রচার হলো? প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু যদি ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে না পারতেন তাহলে ৭ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ধরা হতো এবং এদেশের মানুষ মুজিবকে কেন্দ্র করে একাত্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তার নামেই মুক্তিযুদ্ধ করেছে। বন্দি মুজিবের জন্য রোজা রেখেছে। মুজিব ও স্বাধীনতা এ দাবি ত্যাগ করতে রাজি ছিল না। যে লোকটিকে কেন্দ্র করে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে, তাকে অস্বীকার করার অর্থ দাঁড়ায় এই দেশটিকে অস্বীকার করা।

সবশেষে জিয়া যদি ২৬ মার্চ রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারতেন তাহলে তার শাসনকালে কালুরঘাট টান্সমিটিং সেন্টারে বড় একটি স্মৃতিস্তম্ভ অবশ্যই বানাতেন।

ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৯২।

স্বাধীনতার ঘোষক কে

অমৃত অধিকারী

আবারো সেই পুরনো বিতর্ক। কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি বিতর্কের অবতারণা করেছেন মীর শওকত আলী। মীর শওকত আলীর পরিচয় তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ৫ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ২৫ মার্চ, '৭১ মেজর মীর শওকত আলী ছিলেন চট্টগ্রামের ষোলশহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এই রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে কয়জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসার পদোন্নতি পেয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন তিনি তাদের একজন। জেনারেল জিয়া, জেনারেল মঞ্জুর , জেনারেল শওকত, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, জেনারেল নাসিম, এরা মুক্তিযুদ্ধের চৌকস বাঙালি অফিসার। স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার এদের সকলকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্বাচিত সরকারের প্রধান দেশের রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কতিপয় চাকরিচ্যুত সামরিক কমকর্তা এবং কিছুসংখ্যক চাকুরিরত কর্মকর্তাদের হাতে নৃশংসভাবে সপরিবারে নিহত হন তখন এরা সকলেই সশস্ত্র বাহিনীর বিশিষ্ট কমান্ডিং পদসমূহে কর্মরত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৫ এর নভেম্বর মাসে সশস্ত্র বাহিনীর হাতেই আর কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাসহ নিহত হন। অন্যান্য সবাই খোন্দকার মুশতাক এবং জিয়াউর রহমানের সময়ও সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। জেনারেল মঞ্জুরের হাতে জেনারেল জিয়া নিহত হবার পর জেনারেল মীর শওকত আলী লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি পান। পরবর্তী পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এরশাদ সরকারের শেষের দিকে তিনি ছিলেন লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার। এরশাদ সরকারের পতনের পূর্বে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে বিএনপি'তে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্য। তাই মীর শওকত আলী স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনা এবং বাংলাদেশের

রাজনীতির উত্থান-পতন সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

স্বাধীনতার ঘোষক কে, বঙ্গবন্ধু না জিয়াউর রহমান, এ প্রশ্ন বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় কেউ চিন্তাও করেনি। আর জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দখলের পরও তার জীবদ্দশায় তিনি নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেছেন বলে কোনোদিন শুনিনি। কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ঘোষণার মাধ্যমে রাতারাতি স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীনতা অর্জন কোনো 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা নয়' যে ছুঁতে পারলেই খেলায় হারজিৎ নির্ধারিত হয়ে যায়। স্বাধীনতা এমন কোনো বিষয় নয় যা যে কোনো বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করে দিলেই দখলদার বাহিনী হাত গুটিয়ে ফেলবে। ঘোষণা করলেই যদি স্বাধীনতা পাওয়া যেতো তাহলে ঢাকা, চট্টগ্রাম সব বেতার কেন্দ্রই তো ২৪ মার্চ পর্যন্ত বাঙালির দখলে ছিল। যে কেউ ঘোষণা দিলেই তো হতো। ২৫ মার্চের নির্মম হত্যাযজ্ঞ তাহলে কেন? ২০ মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালি সেনা-অফিসার চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন (অব.) রফিক, মেজর এম এস এ ভূঞা (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার), ব্রিগেডিয়ার মজুমদার (নিহত) এবং আরও অনেক অফিসার। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ছিলেন তখন চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। মেজর জিয়া (প্রয়াত রাষ্ট্রপতি) ছিলেন সহ-অধিনায়ক। মার্চের ১ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল তা চট্টগ্রামে কর্মরত বাঙালি সেনা-অফিসাররা অনুধাবন করতে পারলে ২৫ মার্চে ইবি-আর-সি সেন্টারে কয়েক হাজার বাঙালি সৈন্যকে নিরস্ত্র করে নির্বিচারে হত্যা করার সুযোগ পেত না পাকিস্তানি হায়েনার দল। তার আগেই সশস্ত্র প্রতিরোধ, অন্তত চট্টগ্রামে গড়া সম্ভব ছিল বলে এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন।

পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বেড়ে ওঠা বাঙালি অফিসাররা তাদের শৃঙ্খলাবোধ তখনও ত্যাগ করতে পরেননি আর সেই সুযোগে পাকিস্তানি জেনারেলরা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সুকৌশলে ২৪ মার্চ দুপুর ১টায় ঢাকায় নিয়ে এসে ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে চট্টগ্রামে স্টেশন কমান্ডার নিয়োগ করে। আর মেজর জিয়া? তৎকালীন ক্যাপ্টেন এম এস এ ভূঞার (বর্তমান ব্রিগেডিয়ার) বর্ণনা অনুযায়ী, "রাত এগারটায় অফিসার কমান্ডিং জানজুয়া হঠাৎ মেজর জিয়াকে এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে বন্দরে যেতে হুকুম দেন। এই রহস্যজনক হুকুমের অর্থ বুঝতে পারেন না মেজর জিয়া। রাত প্রায় সাড়ে এগারটায় জানজুয়া নিজে এসে তাকে নৌ-বাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দরের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেন। রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে যেতে মেজর জিয়ার বিলম্ব হচ্ছিল। মেজর জিয়া যখন আগ্রাবাদ গিয়ে বড় একটা ব্যারিকেডের সামনে আটকে পড়েছেন তখন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তার পিছন থেকে এসে গাড়ি থেকে নেমে মেজর জিয়ার কাছে ছুটে আসেন এবং তাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা কিভাবে শহরে গুলি করে লোক মারছে তার বর্ণনা দেন। উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় খালেকুজ্জামান তখন মেজর জিয়াকে প্রশ করেন, আমরা এখন কী করব? মেজর জিয়া তখন বললেন, 'আমরা বিদ্রোহ করব।' মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে এম এস এ ভূঞা বলেছেন : ২৭ মার্চের সন্ধ্যায় তিনি (মেজর জিয়া) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টারে পৌঁছলেন, যেটি তখনও পর্যন্ত বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক বাঙালিদের আওতার মধ্যে ছিল। মেজর জিয়াকে দেখে উৎসাহ-উদ্দীপনায় ফেটে পড়ল বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা। কিন্তু মেজর জিয়া কী বলবেন। তিনি বিবৃতির পর বিবৃতি লিখে ছিঁড়ে ফেলেন কিন্তু মনমত বিবৃতি তৈরি করা সম্ভব হয় না তার পক্ষে। ওদিকে বেতারে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হচ্ছিল আর পনেরো মিনিট পরে মেজর জিয়া বেতারে ভাষণ দিবেন। ঘণ্টাদেড়েক বিপুল চেষ্টার পর তিনি তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি তৈরি করেন। বলা বাহুল্য, মেজর জিয়া তার প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে হেড অব দি স্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান রূপেই ঘোষণা করেছিলেন । কিন্তু তার ২য় দিনের ভাষণে এ তথ্যই প্রকাশ পায় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। আমি তার সেই মূল্যবান ঐতিহাসিক ভাষণটি এখাণে সম্পূর্ণ তুলে দিলাম ঃ Zia. Provisional Commander in chief of the Liberation Army hereby proclaims, on behalf of our great leader Shiekh Mujibur Rahman the independence of Bangladesh...

এবার দেখা যাক মীর শওকত আলী, শামসুল হুদা চৌধুরী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠক এবং একাত্তরের রণাঙ্গন বই এর লেখকের সাথে স্বাধীনতার ঘোষক সম্বন্ধে কী বলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারে কখন প্রচারিত হয়েছে বলে আপনি বলতে চান। এ প্রশ্নের উত্তরে মীর শওকত আলী বলেন : "এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সবসময় বিতর্ক চলতে থাকে যে জেনারেল জিয়া করেছেন, না আওয়ামী লীগ থেকে করেছেন, আমার জানামতে সব চাইতে প্রথম বোধহয় চট্টগ্রাম বেতারে হান্নান ভাই-এর কণ্ঠেই প্রথম শুনেছিলাম। এটা ২৬ মার্চ '৭১ অপরাহ্ন দু'টার

দিকে হতে পারে। কাজেই যদি বলা হয় প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তাহলে আমি বলব যে, চট্টগ্রামের হান্নান ভাই সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে, পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ '৭১ এ চরম মুহূর্তে প্রতিটি বাঙালির মনেই স্বাধীনতার কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই হিসেবে প্রতিটি বাঙালি সেদিন হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার একজন ঘোষক। কিন্তু কে সেই মহান নেতা যিনি সেদিন অন্তরালে থেকেও প্রতিটি বাঙালিকে যুগিয়েছেন এই সাহস? কার আহ্বানে বাঙালি সেদিন পেয়েছিল স্বাধীনতার প্রেরণা? ৭ মার্চ '৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক শুনিয়েছিলেন? ২৬ মার্চ '৭১ সন্ধ্যা হতে পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের মূল বেতার কেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট টান্সমিটারে অবস্থান করে যারা স্বাধীনতার কথা বলেন, বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করলেন, কে তাদের সেদিনের প্রেরণার উৎস ছিলেন? কার পক্ষে তারা প্রচার করেছিলেন সে সব ঘোষণা, স্বাধীনতার কথা? কাজেই বলুন কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি? কে বা কারা ঘোষক ছিলেন সেটা কি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ছিল না? এই আনুষ্ঠানিকতার বিতর্কে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না?

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! মীর শওকত আলী ১৯৯১-এ এসে সেই বিতর্কেই এমপি হিসেবে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন । স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বন্ধে যে সমস্ত দলিল এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় ২৫ শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী যখন নিরীহ বাঙালিদের ওপর ট্যাংক, মর্টার আর মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তৎকালীন ইপিআর এর ওয়্যারলেস মারফত সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান জানান। পরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ সকালে বিভিন্ন থানায় ইপিআর এবং নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পৌঁছে যায়। তখনকার শাহাজাদপুর থানা ওসি জনাব আবদুল হামিদ ২৬ মার্চ সকাল ৮টায় যে 'ডিকোড' মেসেজ পান তার ফটোকপি সংযুক্ত করা হলো। ফটোকপির উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :

From : Dacca

To : The people of Bangladesh and all of the world.

Pakistani armed forces suddenly attacked EPR of Pakistan and Police forces at Rajarbag from O`hour of 26th March killing laks of unarmed people force battle going on with EPR and police forces in the street of Dacca and peoples

are fighting gallantly for the freedom of Bangladesh every section of people of Bangladesh asked to attack enemy forces at any cost of Bangladesh May Allah bless you all and help in your struggle of freedom.

২৬শে মার্চ উক্ত মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে সিরাজগঞ্জের তৎকালীন এসডিও শামসুদ্দিন সাহেবসহ ওসি আবদুল হামিদ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবদুল হামিদ এখনও জীবিত। অবসর জীবনযাপন করছেন। তার কাছ থেকেই ফটোকপি সংগ্রহ করা হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বই এ উল্লেখ করেন, ২৫ মার্চ রাত্রে সশস্ত্র অভিযান শুরুর সাথে সাথে তিনি এ জাতীয় একটি বেতার বার্তা তার বেতার যন্ত্রে শুনতে পান ।

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের যারা সংগঠক তারা অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁর একাত্তরের রণাঙ্গন বইয়ে এ সম্বন্ধে যে দলিল তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ : "২৬ শে মার্চ, '৭১-এর সকাল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জন্য বয়ে এনেছিল এক সাগর রক্ত, হাহাকার আর শোকের কালো ছায়া। এমনি হতাশার মধ্যে চট্টগ্রামে বিলি হলো বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজি হ্যান্ডবিল। কেউ পেলো কেউ পেলো না, কেউ পড়ল, কেউ পড়ল না। সবাই তখন কম্পিত, শঙ্কিত।"

ইতঃপূর্বে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুল হান্নান অপরাহ্ন প্রায় দু'টার সময় চট্টগ্রাম বেতার থেকে (আগ্রাবাদ) আনুমানিক পাঁচ মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ রেখেছিলেন দেশবাসীর উদ্দেশে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীর আলোকেই ছিল জনাব এম এ হান্নানের এই ভাষণ। স্পষ্টতই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পক্ষে প্রথম বিপ্লবী ভাষণ প্রচারের গৌরব অর্জন করেছিলেন এম এ হান্নান।

"সাড়ে সাত কোটি বাঙালি চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংঘটিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান শুনতে পেয়েছিলেন ২৬শে মার্চ, '৭১ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটের সময়। সান্ধ্য অধিবেশনেই পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের পর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বামীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদটি উপস্থাপন করেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ, '৭১-এর সান্ধ্য অধিবেশনে সদ্য গঠিত এই বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পুনরায়

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করলেন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে লে. জেনারেল এবং বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি)। মেজর জিয়াউর রহমানের সেদিনের ঐতিহাসিক ভাষণটি তার স্বকণ্ঠ বাণীবদ্ধকৃত টেপ থেকে নিয়ে তুলে দেয়া হলো : "The Government of the sovereign State of Bangladesh on behalf of our Great Leader, the Supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed .... May Allah help us, Joy Bangla.

এম এস এ ভূঞার বিবরণী এবং শামসুল হুদা চৌধুরীর বিবরণী অভিন্ন । এম এস এ ভূঞা তার স্মৃতি থেকে জিয়াউর রহমানের ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আর শামসুল হুদা চৌধুরী তা সংকলন করেছেন জিয়াউর রহমানের স্বকণ্ঠ বাণীবদ্ধকৃত টেপ থেকে। ঘটনাপঞ্জী-দিনকাল-পাত্র সবই সমান। তৎকালীন শাহাজাদপুর থানার ওসি আবদুল হামিদের কাছ থেকে সংগৃহীত তারবার্তার ফটোকপির সাথে সুনামগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বক্তব্যের মিল রয়েছে। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি হান্নান চট্টগ্রাম বেতার থেকে যে ভাষণ প্রচার করেন তাও ছিল এ তারবার্তার বাংলা অনুবাদ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক ও আনিসুজ্জামানও এ জাতীয় একটি তারবার্তা ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সকালে প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অথবা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এমনকি জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময় পর্যন্ত যেখানে এ জাতীয় কোনো অবান্তর বিতর্কের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি স্বাধীনতার ৪০ বছর পর কেন এ বিতর্ক? যার পক্ষে এ বিতর্ক সেই জিয়াউর রহমানকে কি এ বিতর্কে বিজয়ী করে তার ইতিহাস নির্ধারিত মর্যাদা বৃদ্ধি করা যাবে? না প্রকারান্তরে তাকে হেয় করা হচ্ছে?

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ যখন বেতারে ভেসে আসে তখন যারা শুনেছিল সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হয়েছিল এই ভেবে যে, আমাদের সাথে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীও যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, মুজিবনগর সরকারের চালিকাশক্তি তাজউদ্দিন আহমদও স্বীকার করেছেন বেতারে মেজর জিয়ার কণ্ঠ

শুনে তিনি দারুণভাবে উৎসাহ বোধ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমানের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তার নামের অদ্যক্ষর নিয়ে সৃষ্ট জেড ফোর্স মুক্তিযুদ্ধের গর্ব। আজ যারা জিয়াউর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধকালীন তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থেকে সরিয়ে নিয়ে জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে 'ঘোষক' প্রশ্নে বিতর্কিত করছেন তারা কি জেনে শুনেই জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তিকে ম্লান করছেন না? কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র যে ২/৩ দিন চালু ছিল তার প্রচার কি দক্ষিণ বাংলা উত্তর বাংলায় শোনা যেতো? তখনকার জনগণ কি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলেনি? বেতার ঘোষণা শুনে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবে এ রকম অবস্থা কি ২৪/২৫ মার্চ বিরাজ করছিল। তাই সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী-রাজনৈতিক কর্মী সকলের উচিত মীমাংসিত সত্যকে বিতর্কিত না করে অতীতকে স্বীকার করে, অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের চলার পথ মসৃণ করা।

স্থপতি এবং ঘোষক

মযহারুল ইসলাম

একটি দেশের স্বাধীনতার প্রকৃত স্থপতি সে দেশের জনগণ। কিন্তু জনগণ সমষ্টি মাত্র। সমষ্টির প্রতিভূ হিসেবে একজন বা কয়েকজন থাকেন এর অগ্রভাগে। বাংলাদেশেও এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন । তিনি আর কেউ নন শেখ মুজিবুর রহমান, সমগ্র জাতি যাকে বঙ্গবন্ধু বলে বুকে টেনে নিয়েছিল। যদি প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি আমরা অনুগত হই, তবে এই সত্যটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে ভাস্বর হয়ে উঠে। তবে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে নিধন করবার পর থেকে রাষ্ট্রীয় ও বেশ কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ইতিহাসকে বিকৃত করবার জঘণ্য প্রয়াস এমনভাবে চলছে যে, আজ স্বতঃসিদ্ধ এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কেও আমাদের লিখতে হয়, হিটলারী তৎপরতায় প্রলিপ্ত সুদীর্ঘ দেড় দশককাল যাবৎ অব্যাহতভাবে ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্রকে রুখতে হয়। বিগত পনের বছর যাবত এই অপশক্তি সমগ্র জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। ইতোমধ্যে সরলমতি কিশোর ও যুবকদের মধ্যে ইতিহাস বিকৃতির এক সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিবেকবান মানুষ মাত্রেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

দেশে দীর্ঘকাল সত্যিকার গণতন্ত্র অনুপস্থিত থাকার কারণে জাতীয়জীবনে যতোসব গ্লানি, যতোসব কদর্যতা, বিকৃতি এবং স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ইতিহাস বিকৃতির কাজটি আবার ক্ষমতাহীন অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও বিএনপি তার দলগত অবস্থান এবং সরকারী মঞ্চ থেকে যেভাবে বিকৃত ইতিহাসকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করবার হীনমন্যতা দেখিয়ে চলেছে, তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, অনভিপ্রেত। যদি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ অন্যান্যের শুভবুদ্ধির উদ্রেক না হয়, যদি তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করেন, তারা গণতন্ত্রের সুফল থেকে দেশকে বঞ্চিত করবেন, তৈরি হবে ইতিহাস বিকৃতির কারণে পারস্পরিক অবিশ্বাস। ইতিহাসই তাদের নিক্ষেপ করবে

আঁস্তাকুড়ে। কেননা সত্য তার আপন শক্তিতে একদিন না একদিন সমুন্নত হয়ে উঠবেই। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের নৈতিক দায়িত্বও বটে।

বিএনপি এর দলগত হীনমন্যতা আজ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্থলে বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে প্রতিপন্ন করবার অপপ্রয়াস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দীর্ঘদিনের আপসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে, রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ববাংলাকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি জানতেন যে, প্রথম থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের পথে গেলে তা সফল হবে না। ছয়দফা আন্দোলনটিও ছিল মূলত এই সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে বলিষ্ঠ এক পদক্ষেপ। শেখ মুজিবের সমগ্র নিরলস প্রয়াস ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধিকার অর্জন, স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি রক্তক্ষয় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন এবং যখন সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে তখন নিজেই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তার ৭ই মার্চের ভাষণে এই আহ্বান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়া ষাটের দশকজুড়ে বঙ্গবন্ধু বারবার কারাবরণ, পাকিস্তানের প্রায় চব্বিশ বছর আয়ুকালে এই এক আপসহীন নেতার প্রায় পনের/ষোল বছর কারাবাস, আগরতলা ষড়যন্ত্র, ছয়দফার আন্দোলন, ঊনসত্তরের সমগ্র পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান এবং অনমনীয় মনোভাব, সত্তরের নির্বাচন এই মহান নেতার পক্ষে গণরায় ইত্যাদির কোনো মূল্যই নেই, মূল্য আছে কেবল এক পেশাদার সৈনিকের এক মুহূর্তের ঘোষণার, এমন কথা কেবলমাত্র বাতুলেরাই বলতে পারে। বলতে পারে যারা ইতিহাসের তথ্যের প্রতি চোখ বন্ধ করে একটি উন্মাদনার আশ্রয়ে উন্মত্ত।

জিয়াউর রহমানের যে ঘোষণাকে পুঁজি করে এমন উন্মাদনা তার যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে বহুবার বিশ্লেষণ করেছেন চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অন্যতম উদ্যোক্তা জনাব বেলাল মোহাম্মদ। বেলাল মোহাম্মদ জানিয়েছেন, কিভাবে ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমানকে খুঁজে পেয়ে বেতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন, কিভাবে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন ইত্যাদি। বেলাল মোহাম্মদের লেখায় আরো স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জিয়ার একদিন পূর্বে অর্থাৎ

২৬ মার্চ মধ্যাহ্নে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হান্নান সাহেব বঙ্গবন্ধু প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি এই একই বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে পাঠ করেছিলেন। অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে যে ক'জন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন জনাব আবদুল হান্নান। অথচ বিএনপি কারসাজি করে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জিয়াকে প্রথম ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে যতো গোলমালের অবতারণা করেছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও তাঁকে প্রথম ঘোষকের কৃতিত্ব দেয়া যাবে না। বেলাল মোহাম্মদ এবং তার লেখাগুলোই এর সাক্ষী।

মওলানা ভাসানী একবার স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ নয়) দাবি করেছিলেন। দাবিটি ঘোষণা নয়, বিবৃতি হিসেবে কাগজে এসেছিল ১৯৭০ সালের ৭ ও ১০ ডিসেম্বর যথাক্রমে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ও পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টির মধ্যে ১৬৭টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টির মধ্যে ২৯৮টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করার পরে ছাত্ররা একাত্তরের ৩রা মার্চ যে 'জয় বাংলা' শীর্ষক একটা ইশতেহার প্রকাশ করে তাতে প্রথমে আছে "স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা ও কর্মসূচি"। অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে একথাও লেখা আছে - "স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদশ ঘোষণা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক"। একাত্তরের ২ মার্চ ছাত্ররাই নতুন পতাকা উত্তোলন করে। ওই ইশতেহারটির ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। তবে ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা ঘোষণা সবকিছুরই পুরোভাগে ছিলেন একজন, তিনি মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান।

মহল বিশেষ বিশেষত বিএনপি অপপ্রচারে লিপ্ত যে, বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। কথাটি আদৌ সত্য নয়। তিনি ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রিতে সহকর্মী ও দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করেন 'আজ থেকে (অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম লগ্ন) বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। একে যেমন করেই হোক শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।" বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ সকল এমপি ও নেতৃবৃন্দের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। এছাড়া তৎকালীন গণভবনে সযত্নে রক্ষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি আমি আমার ' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি। ঘোষণাটি এই—Declaration of War of Independence : pak Army suddenly attacked EPR Base at Pilkhana, Rajarbag police line and killing citizens. Street battles are going on in every

street of Dhaka-Chittagong. I appeal to the Nations of the World for help. Our Freedom Fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask police EPR Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight. No compromise. Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland. convey this message to all Awami League leads. workers and other patriots and lovers of freedom may Allah bless you. Joy Bangla. (Sheikh Mujibur Rahman).

সেই সংকটময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য ওয়ারলেসের মাধ্যমে যাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয় তাদের নাম :

1. Management and guidence by : A.K.M.A. Hakim A.E.W.
2. Recieved and transmitted by : Md. Jalal Ahmed (TTR). ESW
3. Aided By : Giashuddin, EX, E.P.R., T.T.R.
4. Aided by : Md. shafiqul Islam, E.S.W.
5. Aided by : Abul Kashem Khan T.T.R.
6. Aided by : Abul Fazal. Cashier.

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো এই দলিলটি কি অবস্থায়, কোথায় আছে অথবা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে কি না জানি নে। যদি ধ্বংস করা হয়ে থাকে তবে জাতির জন্য দুর্ভাগ্য। অন্যান্য আরো কিছু ঐতিহাসিক এবং প্রত্যক্ষদর্শীর গ্রন্থ উল্লেখ করে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

তবে একটি গ্রন্থের উল্লেখ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। গ্রন্থটির নাম : "Witness to surrender (Oxford U. Press 1977), লেখক সিদ্দিক সালিক। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাস করে সালিক পাক আর্মিতে যোগ দেন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় পাক

আর্মির পাবলিক রিলেশনস অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর যুদ্ধবন্দি হয়ে দু'বছর ভারতে থাকেন ও ফিরে গিয়ে লে. কর্নেল পর্যন্ত উন্নীত হন। প্রত্যাবর্তনের পর তার তথ্যপূর্ণ ও অত্যন্ত সংযমী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে সালিক শেখ মুজিবকে কিভাবে আটক করা হয় এবং কেমনভাবে ও কোনো কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব পাকবাহিনী যুদ্ধ আরম্ভ করে, ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে শেখ মুজিব যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যে ঘোষণাটি সালিকের ওয়ারলেসে ধরা পড়েছিল, সে কথাও আমাদের শত্রুপক্ষের এই লেখক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—

"When the first shot had been fired, the voice to sheikh Mujibur Rahman came faintly through an wavelength close to that of official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a prerecorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to the Peoples Republic of Bangladesh." (Witness to Surrender p. 75).

শেখ মুজিব যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এই সত্য ঘটনাটি যে সব গ্রন্থে লিখিত হয়েছে তার সবগুলোকে যদি কেউ অস্বীকার করতে চান করতে পারেন। আমরা যারা ২৫ মার্চের রাত্রিতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম এবং স্বাধীনতা ঘোষণার সার্বিক আয়োজন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আমাদের সেই সাক্ষ্য যদি কেউ উড়িয়ে দিতে চান, দিতে পারেন। কিন্তু সালিক যে তথ্যটি পরিবেশন করেছেন তার সত্যতা অস্বীকার বা উপেক্ষা করবার কোনো উপায় নেই। কেননা তিনি আমাদের শত্রুপক্ষের লোক, যিনি শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকে রুখতে চেষ্টা করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া বা বিএনপি'র স্তাবক ও অনুসারীবৃন্দ যাবতীয় লেখক ও প্রত্যক্ষদর্শীকে মনে করতে পারেন যে তারা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের যাদু বলে আচ্ছন্ন, তারা সবাই শেখ মুজিবকে বড় করবার জন্যেই স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার বিষয়ে তার পক্ষে লিখেছেন বা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সালিক? তার তো কোনো স্বার্থ নেই? শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বের দ্বারাও তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন না। তাছাড়া তিনি যে বস্তুটির দোহাই দিয়েছেন সেটি একটি যন্ত্র মাত্র, যার কোনো পক্ষ নেই, সেই যন্ত্রেই শেখ মুজিবের কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণার বাক্যগুলো ধরা পড়েছে। সালিক একেবারেই নিরাসক্তভাবে, নিরাবেগ চিত্তে 'witness to surrender' গ্রন্থে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তার সম্মুখে ঘটিত যাবতীয় ঘটনাবলির উল্লেখ করেছেন, তিনি যা

দেখেছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা সঞ্চয় করেছেন সে সবের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনায় কারো মনোরঞ্জনের কোনো ব্যাপার নেই অতিরঞ্জনের কোনো অবকাশ নেই, ঘটনাকে বিকৃত করবার সামান্যতম অভিপ্রায় কোথাও নেই। অতএব বঙ্গবন্ধু যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন সেই কথাটি তার যন্ত্রে যেভাবে ধরা পড়েছে সে কথাই সিদ্দিক সালিক জোর দিয়ে বলেছেন। কেবল ব্যক্তি নয়, যন্ত্র কথা বলেছে। ব্যক্তির সাক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যন্ত্রের নির্ভুল সাক্ষ্য। এর পরেও যদি কেউ বলেন যে, মাঠ থেকে ধরে আনা একজন সৈনিক যিনি ধরে আনবার একঘণ্টা পূর্বেও স্বাধীনতার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং একারণে তার কৃতিত্ব সর্বাধিক, তাহলে তাকে কেবল করুণা করা যায়। এ কখনো ঐতিহাসিক সত্য হয় না।

'স্বাধীনতার ঘোষণা' এবং মীর শওকত আলীর 'হাসি' শিরোনামে অধ্যাপক রাজীব হুমায়ুনের একটি অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধ ১৬ আষাঢ়, ১৩৯৮ তারিখে আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত হঁয়েছে। এই প্রবন্ধপাঠে আমাদের মনে হয়েছে যে, মীর শওকত তার পূর্বাপর উক্তিতে এবং বোকার হাসি হাসাতে একজন ক্লাউন হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। মীর শওকত আলী যাব প্রেমে অন্ধ, সেই জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় তখনই বেলাল মোহাম্মদ তার একাধিকবার লিখিত প্রবন্ধে কিভাবে মেজর জিয়াকে বেতার ঘোষণায় রাজি করিয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং জিয়া নিজে এই লেখাগুলোর কোনো প্রতিবাদ তার জীবদ্দশায় করেননি।

ইংরেজি ঘোষণাটি ওয়ারলেসে যাদের কাছে পাঠানো হয় তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বিশিষ্ট রাজনৈতিক সহচর চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী তা লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু তার প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে, ঘোষণাটি কেবল প্রেরণ করেই তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি। তিনি টেলিফোনে জহুর আহমেদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকারে এই ঘোষণার কথা এবং কর্মপন্থা কী হবে, তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জহুর আহমেদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তিনি এই ঘটনার সত্যতা আমার নিকট স্বীকার করেছিলেন। মরহুম জহুর আহমেদ চৌধুরী আমাকে একথাও বলেছিলেন যে, তিনিই ঘোষণার একটি কপি জনাব হান্নানকে দিয়েছিলেন এবং হান্নান সাহেব এই ঘোষণাই বঙ্গানুবাদ করে চট্টগ্রামে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে পরে শুনিয়েছিলেন। অর্থাৎ ঘোষণাটি যে চট্টগ্রামে প্রেরিত

হয়েছিল সাক্ষ্য প্রমাণে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ঘোষণাটি ওয়্যারলেসে প্রেরণের সময় যে সিদ্দিক সালিকের সেনসিটিভ ও সফিস্টিকেটেড Wavelength রেডিও ট্রান্সমিটারে ধরা পড়েছিল এমন অনুমান সত্য বলে বিবেচিত হতে পারে, কেননা দুটো সময়ই ছিল প্রায় অভিন্ন। সালিক বলেছেন যে, যখন প্রথম গোলাগুলি শুরু হয় সেই সময় অফিসিয়াল পাকিস্তান রেডিওর পাশাপাশি একটি Wavelength Transmiter এ স্পষ্টভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ ভেসে আসে যা, স্পষ্টভাবেই পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়। গোলাগুলি যে রাত্রি বারোটার পরে পরেই শুরু হয়েছিল। এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ আজগর খান, ঐতিহাসিক প্রবোধ চন্দ্র এবং আরো অনেকে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উল্লিখিত আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে ও বর্বর পাকিস্তানি সেনারা যে পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে তার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ আক্রমণের পরে পরেই ঘোষণাটি ওয়্যারলেসে প্রেরণ করা হয়েছে, সময় রাত্রি বারোটার পর। সালিক কর্তৃক সময়ের উল্লেখ থাকায় বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত ঘোষণাটিই যে সালিকের যন্ত্রে ধরা পড়েছিল এমন সিদ্ধান্ত প্রায় অভ্রান্ত। ঘোষণাটি যে যন্ত্রে ধরা পড়েছিল এ সম্পর্কে জনাব সালিকের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে এবং তা সকল সন্দেহের বা অনুমানের ঊর্ধ্বে। এতএব, বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। যারা ইতিহাসকে বিকৃত করতে বদ্ধপরিকর কেবলমাত্র তারাই এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

আগস্ট ১৯, ১৯৯১।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু

তপন কুমার দে

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পরই তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা ওয়্যারলেস ও ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ সারা প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন : পাকবাহিনী অতর্কিতে ২৫ মার্চ আমাদের আক্রমণ করলু। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রাম জানালাম, বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক যাতে প্রতিটি থানা, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে সেইজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একটু সময়ে, একটু মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো?

অধিবেশনে আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঘোষণা করেছিলনে এবং যে ঘোষণা মুজিবনগর থেকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছিল, একই সঙ্গে এই গণপরিষদ তাতে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৭ জুন ৬ দফার বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক গণসমাবেশে বক্তব্য দেয়ার সময় বলেন "২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার বর্বরবাহিনী আমার ওপর আক্রমণ চালায়। সেদিন রাতে আমার

অবস্থা যে কেমন ছিল, সেটা কেবল আমিই জানি, আমি জানতাম ঘর থেকে বের হলেই আমাকে গুলি করে মারবে। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিন্তু বাংলার মাটিকে আমি ছাড়তে পারি নাই। রাত ১১টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে ও আওয়ামী লীগ নেতাদের হুকুম দিলাম বের হয়ে যাও। যেখানে পার এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খবরদার স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো।"

রাতে আমি চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠালাম। আগে যাকে ইপিআর বলা হতো, তাদের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামে। পিলখানা হেডকোয়ার্টার্স তখন শত্রুরা দখল করে নিয়েছে। ওদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি যখন পিলখানায় যোগাযোগ করতে পারলাম না। তখন আমি চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ করে বললাম, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমরা বাংলার সব জায়গায় ওয়ারলেসে খবর দিয়ে দাও। পুলিশ হোক, সৈন্যবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, যে যেখানে আছে। পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন। তারা আমার কথা মতো খবর পৌঁছিয়েছিল।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন : ২৫শে মার্চ তারিখে আমি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম, আমি যখন বাংলার মানুষকে ডাক দিলাম, তখন আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সহকর্মীরা আমার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক, লক্ষ লক্ষ কৃষক, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, রক্ত দিয়েছে। আর কারো কথায় নয় শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকেই তারা জীবন দিয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাস কোনোদিন মিথ্যা করতে নাই। আমার সহকর্মীরা যারা এখানে ছিল, তারা সকলে জানতো যে ২৫ মার্চ রাতে কী ঘটবে। তাদের বলেছিলাম, আমি মরি আর বাঁচি সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ৭ মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব—কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন পৃ. ৩৮-৩৯)।

বঙ্গবন্ধুর বাসার হাজী গোলাম মোর্শেদ স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন : ২৫ মার্চ, '৭১-এর মধ্য রাতের দিকে একটি টেলিফোন আসল। গোলাম মোর্শেদ টেলিফোন ধরেন। টেলিফোনকারী বঙ্গবন্ধুকে চাইলেন। গোলাম মোর্শেদ তার পরিচয় জানতে চাইলেন। টেলিফোনকারী বললেন যে বঙ্গবন্ধুকে বলুন আমি

সেই লোক যাকে বঙ্গবন্ধু তার একটি বাণী পাঠানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গোলাম মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে জানালেন সে কথা। বঙ্গবন্ধু নিজে টেলিফোন না ধরে গোলাম মোর্শেদকে ধরতে বলেন, টেলিফোনকারীকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ জানালে উত্তরে তিনি জানালেন বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচার করা হয়ে গেছে এবং ট্রান্সমিটার দিয়ে তিনি এখন কী করবেন তা জানতে চান। মোর্শেদ বঙ্গবন্ধুকে এসে একথা জানালেন। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনকারীকে ট্রান্সমিটার নষ্ট করে পালিয়ে যেতে বললেন। মোর্শেদ টেলিফোনকারীকে বঙ্গবন্ধুর সব নির্দেশ জানিয়ে দিলেন। (স্বাধীনতার ঘোষক, ইমন সরকার পৃ. ৩০)।

ড. ওয়াজেদ মিয়া লেখেন : বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলদা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআর ওই বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআর-এর ওই সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। (বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ড. ওয়াজেদ মিয়া, পৃ. ৮১)।

শেখ হাসিনার কথা থেকে পাওয়া যায় ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ২৫ মার্চে মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ ৩-৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান সাহেবকে বার্তা পাঠানো হয়। তার জন্য তারা ব্যবস্থা করেছিলেন। (ঐ)

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. এ আর মল্লিক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, ২৬ মার্চ হান্নান ও এম আর সিদ্দিকীর সাথে টেলিফোনে আমার কথা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে আমাদের শোনানো হয়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়। দুপুর দেড়টার দিকে ওই কেন্দ্র থেকে হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা পাঠ করেন। (আমার জীবন কথা, ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, এ আর মল্লিক, পৃ. ৬৫)।

ড. এ আর মল্লিক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান নিজ নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। আমার মনে আছে তিনি বলেছিলেন "আই মেজর জিয়া ডু হেয়ারবাই ডিক্লার' ইত্যাদি। সাথে সাথে আমি আপত্তি জানাই। আমি হান্নান সাহেবকে ফোনে বলি যে জিয়ার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম থাকা প্রয়োজন। মেজর জিয়া পরে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে তাঁর পক্ষে থেকে (আমার জীবন ও কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। এ আর মল্লিক, পৃ. ৬৬।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে শ্রী নির্মল সেন তার লেখা 'মা জন্মভূমি' গ্রন্থের ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন : ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে মেজর জিয়াউর রহমান একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ। মরহুম জিয়াউর রহমান নিঃসন্দেহ কৃতিত্বের দাবিদার। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতেই এই ঘটনাটি বিবেচ্য। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। যদিও এই ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। এ ছাড়াও একটি ঘোষণা ২৬ মার্চ রাতে শেখ সাহেব পাঠিয়েছিলেন বেতার মারফত। ঘোষণাটি এসেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নামে। আমি নিজ চোখে সে ঘোষণা দেখেছি। এ ব্যাপারে কারও তৈরি করা কথা বা তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে আমি রাজি নই। আমি জিয়াউর রহমানের অমর্যাদা করতে চাই না। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের তার সীমাবদ্ধতা ও তার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। একটি কথা স্বীকার করতে হবেই যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নামে। শ্রী নির্মল সেন একই গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন : আজ স্বীকৃতি দেয়া ভালো যে, আমরা বামপন্থীরা বাঙালি উঠতি শিক্ষিত মানুষের মন-মানসিকতা বুঝতে পারিনি। আমরা আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দলিল বলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করিনি যে এই ৬ দফা রুখবার জন্য আইয়ুব সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এক শ্রেণীর বামপন্থীরা নিজেদের হুলিয়া প্রত্যাহার করেছেন। প্রকাশ্য রাজনীতিতে এসেছেন ৬ দফা বিরোধিতা করার মুচলেখা দিয়ে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর এই নেতারা যদি বলতে চান যে তারই এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, তা হলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে কি? আমরা মেহনতি মানুষের কথা বলি। কিন্তু ১৯৭১ সালে এদেশের মেহনতি মানুষের আস্থা আমাদের ওপর ছিল না। তাদেরও নেতা ছিল শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আব্দুল হক তার এক লেখায় উল্লেখ করেন : আজ সকালে উঠেই শুনলাম শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন অসহযোগ চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং যেভাবে সম্ভব পাকিস্তানি সেনার প্রতিরোধ করতে বলেছেন। বিপ্লবী বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার করা হলো। (আব্দুল হক, লেখকের রোজনামচায়, চার দশকের, রাজনীতি পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ, ১৯৫৩-৯৩, নূরুল হুদা সম্পাদিত, পৃ. ২০১)।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া লিখেছেন : মেজর জিয়া বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তার স্বাধীনতা ঘোষণায় বলেছিলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রয়েছেন। অন্যদিকে তখন পাকিস্তান বেতার থেকে বার বারই জানানো হচ্ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে তাকে আটক রাখা হয়েছে। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে অবশ্য এ ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু সুস্থ আছেন এবং যথাসময়েই বেতারে তাঁর কণ্ঠ শোনা যাবে।

এ ধরনের পরস্পরবিরোধী খবরে সারা বিশ্বেও তখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবু এটা কেন করতে হয়েছিল? তার কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির কাছে একটি ব্যক্তি মাত্র নন। তিনি নিজেই একটি ইতিহাস, বাংলাদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতীক, সংগ্রামী চেতনার উৎস। সেদিন সংগ্রামী বাঙালি জাতির প্রাণে তড়িৎ সঞ্চার করার জন্যে এই একটি নাম ব্যবহার না করে উপায় ছিল না। কাজেই ২৬ মার্চ থেকে যে রক্তক্ষয়ী, দীর্ঘ, তিক্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলো, সেই লড়াইয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধরণকে টেনে আনার জন্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ যদি সত্যি সত্যিই জানতো এবং বিশ্বাস করতো যে বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে নেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি দস্যুদের হাতে বন্দী রয়েছেন, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই দেখা দিত বিশৃঙ্খলা, হতাশা। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কাজ করতো নিরুৎসাহ, সন্দেহ, সংশয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধ শুরুতেই পঙ্গ ও দুর্বল হয়ে পরতো। এই কারণে মিথ্যা জেনেও সংগ্রামী ঐতিহ্য ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতীক এই নামটিকে মুক্তিযুদ্ধের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিলে। (মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস, মেজর এম এস এ ভূঁইয়া, পৃ. ২৭, ২৮)।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র পাঠক জনাব এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ ও প্রচার করলেন তৎকালীন মেজর জিয়া। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা বাণীর আলোকে জনাব বেলাল মোহাম্মদদের সহযোগিতায় তৈরি একটি মুসাবিদা ২৭ মার্চ, '৭১ মেজর জিয়াকে দিয়ে পাঠ করানো হয়। উক্ত মুশাবিদার ইংরেজি ভাষায় টেপ রেকর্ডকৃত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ : "গভর্নমেন্ট অব দি সোভারেন স্টেট অব বাংলাদেশ অন আওয়ার গ্রেট লিডার, দি সুপ্রীম কমান্ডার

অব বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমান উই হেয়ার বাই প্রোক্লেম ইন্ডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্যাট দি গভর্নমেন্ট হেডেড বাই শেখ মুজিবুর রহমান ইজ দি সোল লিডার অব দি ইলেকটেড অব সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন পিপুল অব বাংলাদেশ অ্যান্ড দি গভর্নমেন্ট হেডেড হিম ইজ দি অনলি লেজিটিমেট গভর্নমেন্ট অব দি পিপুল অব দি ইন্ডিপেনডেন্ট সেভারেন স্টেট অব বাংলাদেশ হুইচ ইজ লিগালি অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল ফর্মড অ্যান্ড ইজ ওয়ার্দি অব বিং রিকগনাসড বাই অল দি গভর্নমেন্টস অব দি ওয়ার্ল্ড। আই দেয়ার ফোর আপিল অন বি অব আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবুর রহমান টু দি গভর্নমেন্টাল অব অল দি ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিজ টু রিকগনাইজ দি লিগাল গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ অ্যান্ড টেক ইফেকটিভ স্টেপ টু স্টপ ইমিডিয়েটলি দি আর্মি অকুয়েশন ফ্রম পাকিস্তান। টু ডাব আউট দি লিগালি ইলেকটেড রিপ্রেজিন্টেটিভস অব দি মেজরিটি অব দি পিপুল। দি গাইডিং প্রিন্সিপল অব এ নিউ স্টেট উইল বি ফাস্ট নিউট্রালিটি সেকেন্ডনিচ গ্রান্ড থার্ড ফ্রেন্ডশিপ টু অব অ্যান্ড ক্রমিটি টু নান। হে আল্লাহ হ্যালপ আস। জয় বাংলা'' উপরিউক্ত বাণীবদ্ধ টেপের বিষয়বস্তু বাংলায় নিম্নরূপ :

আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আমরা এতদ্বারা স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আগে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগণের একমাত্র বৈধ সরকার যা আইন সম্মতভাবে গঠিত হয়েছে এবং যা পৃথিবীর সব সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৫০)।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যাবেলা কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কর্মতৎপরতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সংক্ষিপ্ত বার্তাটি সংবাদের আকারে পাঠ করেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। হান্নান সাহেব অধিবেশন চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে তার ভাষণ প্রচার করেন। পরদিন ২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে মেজর জিয়া ও আরও কয়েকজন পৃথক পৃথকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন এবং এ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর

জিয়ার কণ্ঠ শোনা যায় ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ ও ৩০ মার্চ। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আবদুল মতিন, পৃ. ২৪) ।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যথা সময়েই তিনি বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই তো ২৬ মার্চ ৭১-এর আগ মুহূর্তে এবং ২৫ মার্চ-এর শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যা শুরু করে। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী ছেড়ে দেয়ার পরমূহূর্তেই বন্দি করে হানাদার পাক সৈন্যরা। এ ব্যাপারে ৮ মে '৭১ জামায়েতে ইসলামের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লিখলো ''অধৈর্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গত ২৬ মার্চ সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এটে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। সামরিক সরকার তা জানতে পেরেই ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাঁর সে পরিকল্পনা নস্যাৎ করেছেন এবং পাকিস্তানকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। কেবল ৭ মার্চ ও ২৬ মার্চই নয়। ২৩ মার্চ, '৭১ তারিখেও অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্রী দিবসেও বঙ্গবন্ধু বাংলাকে স্বাধীন বাংলা রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। এইদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশের সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাঙালি জনগণ পাক সরকারের নির্দেশ অমান্য করে। দৈনিক নিউজ ডে পত্রিকার বিজ্ঞ সাংবাদিক এ বি এম মূসা কর্তৃক পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে গিয়ে ১৯৭১-এর বাংলার গণহত্যার নায়ক জেনারেল টিক্কা খানের সাথে গৃহীত সাক্ষাৎকারের অংশ প্রণিধানযোগ্য। গত ১৯ এপ্রিল, '৯২ দৈনিক নিউজ ডে পত্রিকায়, ফেস টু ফেস উইফ টিক্কা খান শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত সাক্ষাৎকারে অংশবিশেষ স্বনামধন্য কলামিস্ট শ্রদ্ধেয় আনিসুজ্জামান সাহেব গত ১১ মার্চ, '৯৩ দৈনিক খবরের ৫ম পৃষ্ঠায় ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারে অনীহা কেন? শীর্ষক পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছেন। জনাব এ বি এম মূসার এক প্রশ্নের উত্তরে খান বলেন, "মুজিব ডিক্লেয়ার্ড ইন্ডিপেনডেন্স অন টুয়েন্টি থার্ড মার্চ অ্যান্ড এস্কড বেঙ্গলি আর্মি অফিসার্স টু রিভল্ট''। জনাব মূসা টিক্কা খানকে প্রশ্ন করেন কিন্তু আপনি কেন বলেছেন যে মুজিব ২৩ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জবাবে টিক্কা খান বলেন 'অন টুয়েন্টি থার্ড ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান ফ্লাগ দেয়ার ওয়াজ বাংলাদেশ ফ্লাগ এভরিহয়ার, কর্নেল ওসমানি ওয়াজ ট্রেনিং দি ইউনিভারসিটি ভয়েজ, মুজিব হ্যান্ড কমপ্লিট কন্ট্রোল । হি হ্যাড স্পটড সাপ্লাইজ টু দি ক্যান্টনমেন্ট''।

অনুবাদ : ২৩ মার্চ প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গায় পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। কর্নেল ওসমানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজিব ক্যান্টমেন্টের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জনাব মূসার প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল টিক্কা খান বলেন—"মুজিব হ্যাড সেট টু অল দি বেঙ্গলি আর্মি অফিসার্স টু রিভল্ট"। জনাব মূসা প্রশ্ন করেন—অন টুয়েন্টি থার্ড মার্চ? জবাবে টিক্কা খান বলেন, অন টুয়েন্টি থার্ড অ্যান্ড ল্যাটার অন সিক্সথ মার্চ দে রিভল্ট ফাস্ট অ্যাট জয়দেবপুর অ্যান্ড ল্যাটার ইন চিটাগাং।

বঙ্গানুবাদ : মুজিব সকল বাঙালি সামরিক অফিসারদের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য নির্দেশ পাঠান।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মালেক উকিল বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় নোয়াখালী সার্কিট হাউস ময়দানে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট নাগরিক এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাই। নির্ধারিত সময়ের আগেই সার্কিট হাউস ময়দান এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। উক্ত সমাবেশে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার জন্য দলমত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানাই। উপস্থিত সবাই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে হঠাৎ করে জেলা প্রশাসক জনাব মনযুরুল করিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আমার হাতে দেন। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬)।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে সাবেক সচিব মনযুর-উল-করিম বলেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত্রে প্রায় মধ্যরাতের পর আমি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আসা একটি ওয়্যারলেস মেসেজ পাই। সেখানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা ছিল। পাশের জেলা কুমিল্লাতে যোগাযোগ করে জানতে পারি তাঁরাও অনুরূপ বার্তা পেয়েছেন। পরে পাকিস্তানি সৈনারা কুমিল্লার জেলা প্রশাসক শামসুল হক খানকে হত্যা করে। আমি পরদিন ২৬ মার্চ সকালে নোয়াখালী সার্কিট হাউসের সামনে উপস্থিত জনতাকে বার্তাটি পরে শোনাই। তিনি আরো বলেন, আমার ধারণা হয় ঢাকায় যে ট্রান্সমিটিং থেকে এই ওয়্যারলেস বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল সেখানে কেউ বেঁচে নেই। পাকিস্তানি সৈন্যরা সম্ভবত সবাইকে হত্যা করেছিল। ২৫ মার্চ

গভীর রাতে নোয়াখালীর পুলিশ ইন্সপেক্টর এস ইউ খান চৌধুরী একটি বার্তা পেয়ে সাথে সাথেই পাঠিয়ে দেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল মালেক উকিল সাহেবের কাছে (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস, একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৫০, ৫১)।

২৬ মার্চ রাতে হঠাৎ চট্টগ্রাম বেতারের মিটারে ঘোষণা করা হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের সাথে যে আলাপ আলোচনা করেন তা ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের হঠকারিতার ফলেই এই ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে গত রাতে বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া সর্বত্রই নিরীহ জনসাধারণের ওপর অতর্কিতে হামলা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন—পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যে কোনো সংকটজনক অবস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৬ মার্চ, '৭১ সালে আলাদাভাবে জেনারেল ওসমানীকে সিলেট থেকে এনে গোপনে ইপিআর এবং অন্যান্য জায়গায় যারা ছিলেন তাঁদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য বলেছিলেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন—ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধু আমাকে নিয়ে জেনারেল ওসমানীর সাথে মিরপুরে একটি বাড়িতে বসেছিলেন। কাজেই পূর্ব প্রস্তুতি আমাদেরও ছিল।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ আরো বলেন—হানাদার বাহিনীর সম্ভাব্য আঘাত প্রতিহত করার জন্য সংগোপনে জেনারেল ওসমানীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু একটা কাজ করেছিলেন। তাকে দিয়ে কিছু কিছু বাঙালি সামরিক অফিসারকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। প্রয়োজনে প্রতিরোধ যুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৪০-৪৩)

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, "২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় কী ঘটেছে তা জানি না। সকালে ঢাকা বেতারে ভিন্ন কণ্ঠ। সশস্ত্র লড়াই অতি নিকটে।' থানা থেকে অস্ত্র নিয়ে এলাম। দুপুরে সিরাজগঞ্জ ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে চিঠিসহ পিয়ন এল। এতে লেখা ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শত্রুদের

সঙ্গে লড়াই করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপস নাই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৩২)।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ শ্রীসুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন—২৬ মার্চ, '৭১ আমি একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামের প্রেরকের ঠিকানায় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ছিল। এই টেলিগ্রামটি পাওয়া মাত্র জনসভা করলাম। তিনি আরো বলেন, টেলিগ্রামখানা ছিল ইংরেজিতে। তাতে বাংলা অর্থ হয় : আমরা আক্রান্ত, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। তোমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত কর। শ্রীসুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আরো বলেন, আমি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে ওই নির্দেশ পাই। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে এ ধরনের নির্দেশই আশা করেছিলাম। টেলিগ্রামখানাকে আমি, জাতীয় নির্দেশ হিসেবেই ধরে নিয়েছিলাম। জনসভা করে আমি ওই টেলিগ্রাম সেখানে পাঠ করে জনতাকে শুনিয়েছিলাম। (একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃ. ৩৭৯-৩৮০)।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী ছাপানো হ্যান্ডবিল আকারে চট্টগ্রামে বিলি করা হয়েছিল ২৬ মার্চ ৭১ সকালের মধ্যে। ২৬ মার্চ বিকেলেও এমনি শত শত হ্যান্ডবিল চট্টগ্রামে বিলি করা হয়েছিল। এই হ্যান্ডবিলে বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল—২৬ মার্চ, '৭১-এর রাতে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। ওয়্যারলেসযোগে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙ্গর করা এক বিদেশি জাহাজে প্রথম গৃহীত হয়েছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী টেলিফোনযোগে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীকে জানিয়েছিলেন। জনাব চৌধুরী ওই রাতের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর বাণী হ্যান্ডবিল আকারে ছেপে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং একই সাথে ত্বরিত ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য প্রত্যেক জেলা

প্রশাসককে নির্দেশ দিয়েছিলন। ২৫ মার্চ ৭১ দিনগত রাত ছিল ঠিকই কিন্তু রাত ১২টা পার হলেই যে পরবর্তী ক্যালেন্ডার ডেট হয় এটা অনেকেরই খেয়াল থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৩৬)।

১৯৮০ সালে জেনারেল এম এ জি ওসমানী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি। বঙ্গবন্ধুই সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, পৃ. ৩৩)।

জেনারেল ওসমানী অপর এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন—২৫ মার্চ রাত ১০টায় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন আপনাকে যেন কোনো অবস্থাতেই ধরতে না পারে। তিনি আমাকে যুদ্ধ পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। জেনারেল ওসমানী জাতীয় সংসদে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রাসঙ্গিক বিতর্কে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ১৯৮১ সালে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন—বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর স্মরণ সভায় জেনারেল ওসমানী বলেন—বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদাহরণ সৃষ্টিকারী শীর্ষতম ব্যতিক্রম, তিনি একমাত্র মহান বাঙালি যিনি বিবেক ব্যবসা করেনি। (স্বাধীনতার ঘোষক, ইমন সরকার, পৃ. ৩১)।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাজারবাগ ও পিলখানায় পাকিস্তানি আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আইনজীবী আবুল মনসুর আহমেদ বলেন, ২৫ মার্চ, '৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করে। আমাদের নেতাকে বন্দি করে তাদের দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই আমাদের নেতা ফর্মালি স্বাধীনতা ঘোষণা করে সহকর্মীদের মুজিবনগরে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। ২৬ মার্চ, '৭১-এ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে তাঁর নির্দেশে বাঙালি সৈন্য ও জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ত্রধারণের কথা ঘোষণা করা হয়। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৩৪)।

১৯৯২ সালের ৩১ মার্চ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের এক আলোচনা সভায় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাবেক বিমানবাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার বীর উত্তম স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করার অসঙ্গত দাবি খণ্ডন করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দেশব্যাপী তাঁর ঘোষণা শোনা যায়নি। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন পৃ. ৩৩-৩৪)।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে চট্টগ্রামের প্রথম বিদ্রোহী সৈনিক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেজর রফিক বলেন—লাখো মানুষের কণ্ঠে মানব গর্জনের মতো ধ্বনিত হতে লাগল 'জয় বাংলা'। কি যে জাদু মাখা ছিলো এই স্লোগানে। এর ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিধি নিরূপণের ক্ষমতা বুঝি আর কারো নাই। গণঅভ্যুত্থানের সময় এবং যুদ্ধ চলাকালে এ স্লোগান বাঙালির জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। জীবন বাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এর উদ্দীপনা উক্তির তুলনা হয় না, তাই জয় বাংলা জয় ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। "মেজর রফিক আরো বলেন—সেদিনের সভায় শেখ মুজিবের দেয়া ভাষণ ছিলো বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। গভীর আবেশ, নির্ভুল যুক্তি এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনাপূর্ণ এ ভাষণে অকুতোভয় শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আর যদি একটা গুলি চলে তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায় ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি। আরো দেবো, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, মেজর রফিক, পৃ. ৪৫, ৪৬, ৫০)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এই মন্তব্য করে এম আর আখতার মুকুল বলেন—তাই সে রাতেই ২৬ মার্চ তিনি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বত্র বেতার যোগে পাঠাবার জন্য টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাম অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিকটেশন দিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম এ হান্নানের কাছে এই বাণী যথাসময়ে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধুর ডিকটেশনটি ছিল নিম্নরূপ : "দি পাকিস্তান আর্মি হ্যাজ অ্যাটাক পুলিশ লাইন অ্যাট রাজারবাগ অ্যান্ড ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস হেড কোয়ার্টার অ্যাট পিলখানা অ্যাট মিড নাইট। গেদার স্টেংথ টু রোজস্ট অ্যান্ড প্রিনেয়ার ফর এ ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নায়ক, স্বাধীনতার ঘোষক। আর সেজন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সময় পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি শেখ মুজিবুরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন—এই নবজাতক রাষ্ট্রের তিনি জনক বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চিন্তা তাকে কেন্দ্র করে। (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, মেজর রফিক, পৃ. ৩১০)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিরোধ সংগ্রামীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাংবাদিক সাপ্তাহিক যায়যায়দিন পত্রিকার সম্পাদক শফিক রেহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ভাষণ না দিলে এদেশ স্বাধীন হতো না। (দৈনিক খবর, ১-৯-৯৭)।

"জিয়ার জন্মদিন : বিটিভির অনুষ্ঠানে ইতিহাস বিকৃতি" শীর্ষক এক নিবন্ধে জয়নাল আবেদিন একাধিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ড. রওনক জাহানের "পাকিস্তান ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান" গ্রন্থে বলা হয়েছে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মওদুদ আহমদের "বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনামি" গ্রন্থের ২৫৭ পৃষ্ঠায় মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়। "মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস" গ্রন্থের ৭০৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনীর আক্রমণের কথা ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে হরিরামপুর থানায় পৌঁছলে সেখানকার দেশপ্রেমিক জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। "বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাস" গ্রন্থের ৫০১০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ সকাল ৮ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মঞ্জু পান এবং তিনি তাঁর বার্তাটির অনুলিপি পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর ও ভোলায় পাঠিয়ে দেন। বাংলা ১৩৯৯ সনে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বর্ষপঞ্জির ২৬ মার্চের পাতায় লেখা হয়েছে : ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রেরণ।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সারা বাংলাব্যাপী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ আন্দোলনে সেনাবাহিনীতে চাকরিরত সাধারণ বাঙালি সৈনিকদের মধ্যেও বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তারাও আস্তে আস্তে স্বাধীনতার মোহমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন। তবে অফিসারদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের অনেকেরই এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা সংকোচ ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেজর জিয়া। তার বিধবা পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর তার যে জীবন বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, তা থেকেই এই উক্তির সারবত্তা মিলে।

এই জীবন বৃত্তান্তে বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন মেজর জিয়া বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তখন বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে চট্টগ্রাম পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সামরিক অফিসারদের হাতে বন্দি ছিলেন। এই তথ্যই প্রমাণ করে যে, মেজর জিয়া কোনো পূর্ব পরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেননি। হঠাৎ করেই তাকে যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। এবং এই হঠাৎ করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাতে মেজর জিয়া তার পত্নীকেও বলে যতে পারেননি। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাকে তার অন্যতম সহকর্মী মেজর রফিক যে জোর করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে নিয়ে গেছেন, এটা দিবালোকের মতোই সত্য। তা না হলে মেজর জিয়া যদি পূর্ব পরিকল্পনা মতো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেন তা হলে তিনি তার তৎকালীন তরুণী পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ও শিশু পুত্র তারেককে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ভিতরের বাসায় রেখে যেতেন না। আগেই তাদের সরিয়ে দিতেন। বেগম খালেদা জিয়াকেও এই নয় মাস হানাদার বাহিনীর অফিসারদের হাতে বন্দি জীবনযাপনকালে এতো নির্যাতন ভোগ করতে হতো না। মেজর জিয়ার অন্যান্য সহকর্মী ও সেক্টর কমান্ডারগণ যেমন মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর জয়নাল আবেদীন ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান প্রমুখ পূর্ব পরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেছেন এবং সেই মোতাবেক তাদের পরিবার পরিজন স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের আগেই ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কারো স্ত্রী পুত্র কন্যাদের পাক হানাদারদের হাতে বন্দি থাকতে হয়নি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারকে বেশ কয়েকটি চাপের মধ্যেই কাজ করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর র‍্যাংকের যে সব অফিসার এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের কেউ কেউ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে তারা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, সে সব সুযোগ সুবিধার জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জলিল ও মেজর তাহের এ ধরনের কোনো চাপ না দিলেও যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধ শেষে দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে নেবার একটা প্রচেষ্টা চালায়। মেজর জিয়া ছিলেন এ প্রচেষ্টার প্রধান হোতা। (একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, নাজিমুদ্দিন মানিক, পৃ. ৬৪ : ৬৭।

মেজর জিয়া যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি সে সম্পর্কে কিছু প্রমাণ মেলে অধ্যাপক আবু সাইয়িদের লেখায়। তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীর প্রথম চিফ অব স্টাফ নিয়োগ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে মেজর জিয়ার কথাবার্তায় ও কার্যকলাপে তার রাজনীতিবিরোধী মনোভাব ধরা পড়েছিল। তাছাড়া ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। তাই মেজর জিয়া সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তাকে ডিঙ্গিয়ে কে এম সফিউল্লাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়। সরকার সশস্ত্র বাহিনীত্রয়ের প্রধান সেনাপতি নিয়োগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটা চিরাচরিত নিয়ম। (বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্ট স. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ৯৩-৯৪)।

মেজর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক পণ্ডিত ও দার্শনিক অধ্যাপক আহমদ শরীফ লেখেন—জিয়াউর রহমানও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, তার ছিল ইসলাম ও পাকিস্তানপ্রীতি, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি বলে তাকে হত্যা করবে আশঙ্কায় তিনি মুক্তিযোদ্ধা হন। এবং প্রথমে নিজের নামে ও পরে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকায় তৈরি বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ আরো বলেন, "তার ইসলামপ্রীতি ও অখণ্ড পাকিস্তানপ্রীতির সাক্ষ্য প্রমাণ হচ্ছে চার নীতিভিত্তিক সেকুলার সংবিধানকে তিনি করলেন বিসমিল্লাহ জড়িত এবং পাকিস্তানপন্থী ইসলাম পছন্দ রাজাকারদের করলেন তার শাসন ও প্রশাসনের সহযোগী ও বিশ্বস্ত সহচর। (সময় সমাজ মানুষ, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, পৃ. ২৫)।

মেজর জিয়া শুধু পাকিস্তানি দালালদের মন্ত্রিসভায় নেয়াই নয়, তিনি ক্রমশ পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি ছিল, অখণ্ড পাকিস্তানের টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পত্তির অর্ধেক প্রাপ্য বাংলাদেশের। পাকিস্তানকে সে সব টাকা-পয়সা ধন-সম্পত্তি বাংলাদেশকে ফেরত দিতে হবে। জিয়া সাহেব কিন্তু ঠিক তার উল্টো পথে যাত্রা শুরু করলেন। বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের যে সব সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয়েছিল তিনি সেগুলি পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে দিলেন। কিংবা সেজন্য দিলেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনার কথা তিনি একবারও মুখ ফুটে বললেন না। বরং ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি গেলেন পাকিস্তান সফরে। সে সময় পাকিস্তানের

সংবাদপত্রসমূহে খবর বেরুলো : প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনে আগ্রহী। সংযুক্ত পাকিস্তান গঠনের কথাটা তখন আবার বাজারে চালু হলো। (বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি জিয়া পর্ব, পরেশ সাহা, পৃ. ৩৮)

মেজর জিয়ার পাকিস্তান প্রীতি সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক আবদুল মতিন লেখেন—ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর জিয়া মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত সাম্প্রদায়িক শক্তি ও পাকিস্তানপন্থী রাজাকারদের রাষ্ট্রীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর চার মূলনীতিভিত্তিক বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আবদুল মতিন, পৃ. ৮৫)।

মেজর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী না হয়েও সময় ও পরিবেশের চাপে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ লেখেন, ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল তেলিয়াপাড়ার হেডকোয়ার্টারে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি সামরিক অধিনায়কগণ সমবেত হন। সেখানে উপস্থিত সামরিক অধিনায়কদের মধ্যে ছিলেন কর্নেল ওসমানী, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর কে এম শফিউল্লাহ, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী, লেঃ কর্নেল আবদুর রব প্রমুখ। এ সভায় বাঙালি সামরিক অধিনায়কের মধ্যে থেকে কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্তে প্রকাশ্যে কোন বিরোধিতা দেখা না দিলেও ভিতরে ভিতরে কোনো কোনো সামরিক অফিসারের মধ্যে এ বিষয়ে স্পষ্টতই দ্বিমত ছিল। কারণ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের দাবিদার ছিলেন মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর কে এম শফিউল্লাহ। মেজর জিয়া কোনোরূপ যুদ্ধ বা সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশগ্রহণ না করে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিপ্লবী সরকারের প্রধান বলে নিজেকে ঘোষণা করেন এবং প্রায় একই সময়ে সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। তেলিয়াপাড়ার সামরিক অধিনায়কদের বৈঠকে উপস্থিত হয়েই মেজর জিয়া অতি সহজেই বুঝতে পারেন যে সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে তার বেতার ঘোষণা তার জন্য শুভ প্রতিক্রিয়া বয়ে আনেনি। মেজর জিয়া সভায় হাজির হয়ে বুঝতে পারেন যে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব বা মুক্তিবাহিনীর সেনাপতির পদ দখল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা ইতোমধ্যেই মেজর খালেদ মোশাররফ

এবং মেজর কে এম সফিউল্লাহ সমঝোতামূলক ঐক্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মেজর সফিউল্লাহ ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফের কাছাকাছি লোক। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে চাকরিরত অবস্থায়, জিয়াউর রহমান বাঙালিদের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার রাজনীতি সচেতন খালেদ মোশাররফের নিকট স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র নেতৃত্বদান মেজর জিয়া ছিলেন অগ্রহণযোগ্য। শফিউল্লাহ খালেদের সমঝোতায় ক্ষুব্ধ মেজর জিয়ার নিকট ওই অবস্থায় কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় সামরিক নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়টিতে সম্মতি জ্ঞাপন ব্যতীত অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। (জেনারেল জিয়ার রাজত্ব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ৯-১০)।

মেজর জিয়ার বিশ্বাসই ছিল না যে, সত্যি সত্যি পাকিস্তানিরা তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। সেজন্য ২৬ মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রাম বন্দরে এম ভি সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ নামানোর কাজে সাহায্য ও তদারকি করার জন্য রওনা হন। পথিমধ্যে জানতে পারেন পাকিস্তান আর্মি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কেন্দ্র আক্রমণ করে বহু সেনা অফিসারকে হত্যা করেছে। তখন মেজর জিয়া সটকে পড়েন। মেজর জিয়া যখন চট্টগ্রাম হতে পটিয়ার দিকে রিট্রিট করেন সে সময় মেজর রফিক বিপদ ও বাধা সত্ত্বেও বীরত্বের সঙ্গে চট্টগ্রামে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মেজর জিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে হিরো বনে যান। (জেনারেল জিয়ার রাজত্ব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ৬)।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মেজর জিয়া তার সমসাময়িক বাঙালি অফিসারদের সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতেন, এর কারণ ছিল বেশি সুযোগ সুবিধার আশা। সাচ্চা পাকিস্তানি না হলে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশা ছিলো কম। সুযোগ সুবিধার সোনার চাবিটা ছিল পাকিস্তানি অফিসারদের হাতে। তারা সুযোগ সুবিধা দিতেন তাদের পছন্দসই সামরিক অফিসারদের। আর এই পছন্দের মাপকাঠি ছিলো পাকিস্তানিপ্রীতি এবং বাঙালি বিদ্বেষী। এক্ষেত্রে মেজর জিয়া ছিলেন তাদের পছন্দসই ব্যক্তি। মেজর জিয়া তার চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, চিন্তা চেতনায়- একজন শুদ্ধতম পাকিস্তানি হিসেবে গড়ে ওঠার সামান্য সুযোগটুকু হাতছাড়া করেননি। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আস্থাভাজন হওয়ার ক্ষেত্রে মেজর জিয়ার নিরলস প্রচেষ্টার দাসানুগ আচরণ তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সামরিক অফিসারদের অনেকের নিকট দৃষ্টিকটু

হলেও এক্ষেত্রে তাদের করার কিছুই ছিলো না। বাঙালিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ প্রভুভক্ত গর্বোদ্যত এই তরুণ সামরিক অফিসারটি গোপন সার্ভিস রেকর্ডের মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়েই কর্তা ব্যক্তিদের নজরে আসতে সমর্থ হন, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী ও বাঙালি রাজনীতিবিদ, আমলা, সামরিক অফিসারদের মধ্য হতে তাদের একান্ত অনুগত্য বাধ্যানুগত বিশ্বস্ত বসংবদ সৃষ্টি চেষ্টায় সর্বদাই তৎপর ছিলেন। সামরিক ক্ষেত্রে মেজর জিয়ার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড ও পাকিস্তানপ্রীতির দৌলতে এবং সামরিক কর্মকাণ্ডে তার স্বাভাবিক নিয়মনিষ্ঠা আচার আচরণ ইত্যাদি মিলিয়ে ক্যাপ্টেন জিয়া অচিরেই পাকিস্তানি সামরিক অধিনায়কদের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। সেই জন্যই ১৯৫৮ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পরপরই বাঙালি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ও ছাত্রদের সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্বে মেজর জিয়াকে জেনারেল আইয়ুব খান বেছে নিতে ভুল করেননি। আইয়ুবের আশীর্বাদ নিয়ে মেজর জিয়া আইয়ুবের পক্ষে কাজ করার দায়িত্ব নিয়ে সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তা হয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পোস্টিং পান। সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ক্যাপ্টেন জিয়া পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। ১৯৯৫ সালে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে জিয়া প্রায় দুই বছর পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কর্মরত থাকাকালে পাঞ্জাবি সামরিক কর্তৃপক্ষের আরো বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন। তারই ফলে ১৯৫৯ সালে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে মেজর জিয়াকে বেশ কিছুদিন দিনাজপুরে অবস্থান করতে হয়। এখানেই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বেগম খালেদার সাথে তার পরিচয় এবং পরিণয়। বিয়ের বেশ কিছু মাস পর তদানীন্তন শাহবাগ হোটেলে বৌ-ভাত অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসনের অধীনে অতিথি আপ্যায়নের বিধি মেজর জিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। (জে. জিয়ার রাজত্ব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ৩৪)।

মেজর জিয়ার পাকিস্তান প্রেমপ্রীতি থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ তিনি পাকিস্তানি সাচ্চা পরিবেশের মধ্য দিয়েই বড় হয়েছেন। কলকাতার হেয়ার স্কুলে মেজর জিয়ার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জিয়ার পিতা মনসুর রহমান চাকরি করার সুবাদে পূর্ববাংলায় না এসে পাকিস্তান চলে যান সপরিবারে। জিয়ার বয়স তখন বার বছর। বাংলার বুকে শুরু হয় ভাষার জন্য রক্ত দান ১৯৫২ সালে। বাংলায় যখন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার বাংলা ভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, মেজর জিয়া তখন করাচিতে উর্দু

শিখতে ব্যস্ত। কাজেই ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কোনো ধারণা বা ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও মর্মবাণী ধারণ করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিলো না। জিয়া ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে একজন অফিসার ক্যাডেট হিসেবে বিশেষ কমান্ডো ট্রেনিং লাভ করেন। ওই কলেজে এবং একাডেমীতে পরিবেশগত পরিমণ্ডল এমনই ছিলো যে খাঁটি পাকিস্তানি না হলে ওই কলেজে ঢোকা একজন বাঙালির পক্ষে সম্ভব ছিলো না। মেজর জিয়ার সুবিধা ছিলো এই যে তাকে কোনো সময় বাংলা বলতে হয়নি এবং বাঙালি বলে পরিচয় দেয়া ছিলো তার একেবারেই অপছন্দ। এই অপছন্দের দিকটিই তার চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতির বিশ্বস্ত মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একজন খাঁটি পাকিস্তানি হিসেবে মেজর জিয়ার গায়ে 'বাঙালি' বা প্রাদেশিকতার গন্ধ না থাকায় পাকিস্তানি সামরিক অধিনায়কদের পছন্দের লোক হতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। অনেকেই তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে উর্দু বাচনভঙ্গির যে আমেজ লক্ষ করেন, তাদের হয়তো অজানা যে, মেজর জিয়া যে স্কুলে বা কলেজে অধ্যয়ন করেছেন, সে সব প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা তার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। কিশোর জীবনের মানস গঠনের প্রাক্কালে পিতার চাকুরিসূত্রে বাঙালি সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন, আত্মীয় পরিজন থেকে সিটকেপড়া এবং বাংলাদেশের নিয়ম চেতনার বিপরীতে একটি ভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতির মধ্যে মেজর জিয়ার শৈশব জীবন শুরু হয়। করাচি একাডেমী স্কুলে ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন আচরণগত দিকের সাথে খাপ খাইতে গিয়ে এবং তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রতিযোগিতায় জিয়ার কিশোর জীবন বাঙালিদের মানস গড়নে গড়ে উঠেনি। (জেনারেল জিয়ার রাজত্ব, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃ. ১-২)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে যে ডাক ও ঘোষণা দিয়ে ওয়্যারলেস মেসেজটি পাঠান তা পৌঁছে যায় বাংলার আনাচে-কানাচে। এ সম্পর্কে কয়েকটি জেলার কথা উল্লেখ করা হলো।

কিশোরগঞ্জ : ২৬ মার্চ ভোরে কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগের বরাবর সদর থানা ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পৌঁছে।

চুয়াডাঙ্গা : ২৫ মার্চ রাতেই তার বার্তাটি আওয়ামী লীগ নেতা সংসদ সদস্য ইউনুস আলী এডভোকেটের হাতে পৌঁছে যায়।

গাজীপুর : ২৬ মার্চ সকালে স্থানীয় তার অফিস থেকে বঙ্গবন্ধুর পাঠানো রাতের বার্তাটি তার অফিসের কর্মচারীরা নেতাদের কাছে পৌঁছে দেন।

টাঙ্গাইল : কাগমারী ওয়্যারলেস কেন্দ্রে বার্তাটি প্রথম ধরা পরে। ইংরেজিতে পাঠানো বার্তাটি কাগমারী ওয়্যারলেস কেন্দ্র থেকে টাঙ্গাইল থানায় পাঠানো হয়। থানা থেকে জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে খবর পাঠানো হয়। খন্দকার আসাদুজ্জামান ও খন্দকার আব্দুল বাতেন সহ জেলার নেতৃবৃন্দ তা প্রচার করেন। অপরদিকে মির্জাপুরের গোড়াইয়ে অবস্থিত ক্যাডেট কলেজের ওয়্যারলেসেও ধরা পড়ে। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ফজলুর রহমান খান তা গ্রহণ করেন এবং মাইকযোগে সারা জেলায় প্রচার করেন।

মানিকগঞ্জ : সদর থানার ওয়ারলেস কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ সংকলিত বার্তা ধরা পড়ে। বার্তা পাওয়ার সাথে সাথেই মানিকগঞ্জ ট্রেজারি থেকে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে ছাত্র যুবকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সিলেট : সিলেটে পুলিশ ওয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর ১টি বার্তা দেওয়ান ফরিদ গাজীর কাছে আসে। কিন্তু সিলেটের পুলিশ সুপার তা গোপন করে ফেলে। একজন কনস্টেবল ব্যাপারটা জেনে ফেলেন এবং নেতাদের কাছে মূল বক্তব্যটি পৌঁছে দেন।

শেরপুর : ২৫ মার্চ সকালে সংগ্রাম পরিষদের অফিসে স্বাধীনতার বার্তাটি পৌঁছে দেন ওয়্যারলেস কেন্দ্রের কর্মীরা। নিউ মার্কেটের সামনে এক বিশাল সমাবেশে বার্তাটি পড়ে শোনানো হয়।

বরিশাল : বরিশালে ২৬ মার্চ সকালে পুলিশের বেতার কর্মীদের কাছ থেকে বার্তাটি পাওয়া যায়। বার্তাটি পাওয়ার সাথে সাথে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলা সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নোয়াখালীর পুলিশের রেঞ্জ ইন্সপেক্টর এস ইউ খান চৌধুরী বার্তাটি পেয়ে সাথে সাথেই পাঠিয়ে দেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিলের কাছে। একই সাথে জেলা প্রশাসক মনযুর উল করীমও একই বার্তা পান। পরদিন ২৬ মার্চ সার্কিট হাউসের সামনে এক সমাবেশে জেলা প্রশাসক নিজে বার্তাটি পড়ে শোনান। এই রকম বেশ কয়েকটি জেলার প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু করার বার্তাটি প্রায় সকল জেলায় ও মহকুমাতেই পৌঁছিয়েছিল। সেখানে সিলেটের মতো ঘটনা থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ সিলেটের পুলিশ কর্মকর্তা ওয়্যারলেসের বার্তাটি পাওয়ার পর লুকিয়ে ফেলেছিল। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস : একটি অনুসন্ধান : মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৫০)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ড. মযহারুল ইসলাম লেখেন—২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন—বাংলার মানুষ কারও করুণার পাত্র নয়। আপনার শক্তির দুর্জয় বলেই তারা মুক্তি ছিনিয়ে আনবে। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন—'মনে রাখবেন সর্বাপেক্ষা কম রক্তপাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন তিনিই সেরা সিপাহশালার।' মুজিব বলেন—'মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবই। বাংলার মানুষকে আর পরাধীন করে রাখা যাবে না।

ওইদিন বঙ্গবন্ধু আরো বলেছিলেন—আগামীকাল সমস্যার সুরাহা না হলে বাঙালি নিজের পথ নিজেরাই বেছে নিবে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে কোনো ষড়যন্ত্র দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দাবি আদায় না পর্যন্ত চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। বঙ্গবন্ধু বলেন—আমার মাথা কেনার শক্তি কারও নেই। আমি বাংলার মানুষের সাথে শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করতে পারবো না।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাইতো ক্যাপ্টেন রফিক ২৩ মার্চ, '৭১-এ জনাব এম আর সিদ্দিকীকে ঢাকায় যাবার অনুরোধ করে বলেন—"শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে তাকে তার সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করার অনুরোধ জানাতে বললাম। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার আড়ালে বাংলাদেশে সৈন্য ও রসদ আনতে থাকে। তাদের কার্যকলাপে সন্দিহান হয়ে মুজিব চিন্তা করতে থাকেন ঢাকার বাইরে কোন গোপন স্থান হতে স্বাধীনতার মন্ত্র ব্রডকাস্ট করে দেশবাসীকে নির্দেশ দেয়া যায় কিনা। এমতাবস্থায় ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার মোক্ষম সময়ের জন্য ধৈর্য ধারণ করেও তিনি পূর্ব সতর্কতাস্বরূপ ২৪ মার্চ, '৭১-এর রাতেই চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন হানাদার বাহিনীর যে কোনো সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

২৫ মার্চ-এর রাত ১২টার আগে হানাদার পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ঢাকার পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালিয়ে বাংলার গণহত্যা শুরু করে। ঢাকা শহরে আগুন লাগিয়ে পোড়াতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে রাত ১২টার পরে অর্থাৎ ২৬ মার্চ, '৭১-এর শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ছেড়ে দেবার পর মুহূর্তেই হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে।

চরম ধৈর্যসহকারে গণতান্ত্রিক পন্থায় বাংলার স্বাধীনতা সূর্যকে বাঙালির হাতের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গণতান্ত্রিকতা বজায় রাখতে পেরেছে সেটা মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কৃতিত্ব। আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ বৈধ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মতানুসারে, "যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয় এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনগণের ইচ্ছানুসারে ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারে"। (স্বাধীনতার ঘোষক, কে ইমন সরকার, পৃ. ২৬-২৯)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম "স্থপতি এবং ঘোষক" শীর্ষক এক নিবন্ধে স্বাধীনতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হওয়ার পর এই ঘোষণাটি ইংরেজিতে তৈরি হয়। ঘোষণাটি ওয়্যারলেসে পাঠাবার পর যাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়, তাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর বিশিষ্ট রাজনৈতিক সহচর ও চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী।

ড. মযহারুল ইসলাম বলেন : বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন যে, ঘোষণাটি কেবল প্রেরণ করেই নিশ্চিত হতে পারেনি। তিনি টেলিফোনে জহুর আহমদ চৌধুরীকে এই ঘোষণার কথা ও ভাবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে, তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জহুর আহমদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তিনি এই ঘটনার সত্যতা আমার নিকট স্বীকার করেছিলেন। মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী আমাকে একথাও বলেছিলেন যে, তিনি ঘোষণার একটি কপি জনাব হান্নানকে দিয়েছিলেন এবং হান্নান সাহেব এই ঘোষণাটি বঙ্গানুবাদ করে চট্টগ্রামের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে একক শক্তিশালী এবং কার্যকর রাজনৈতিক

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে কাজী ফজলুর রহমান লিখেছেন—গত রাত বারোটায় আতিক টেলিফোন করে বলল, শুনছেন শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে। (দিনলিপি একাত্তর, কাজী ফজলুর রহমান, পৃ. ২১)।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা যখন সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন তখন করাচিতে অ্যান্থনি ম্যাসকারেন হাসের পাশে বসা শেখ মুজিব সক্রোধে বলেন আমাদের স্বাধীন হতে হবে। আমাদের স্বাধীন স্থল, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এসব দেখব।

দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীর কাছে যাতে অসংলগ্ন মনে না হয় সেই দিকে লক্ষ রেখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। ১৯৬৯ সালে সোহরাওয়ার্দী-ফজলুল হক সাহেবের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন—"আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ। এটা ছিল মুজিবের স্বাধীনতাকামী মনের বহিঃপ্রকাশ। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ২৮)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, "২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হলো চট্টগ্রাম রেডিও থেকে। (স্মৃতি অম্লান ১৯৭১, আবুল মাল আবদুল মুহিত পৃ. ৩৫)।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে জাসদ নেতা কাজী আরিফ বলেন, ১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান একটি গোপন বৈঠকে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে ডাকেন এবং স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্যে ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করার নির্দেশ দেন। ২১ জানুয়ারি উল্লিখিত ৪ জনসহ তাজউদ্দিন আহমদকে নিয়ে শেখ মুজিব দ্বিতীয় বৈঠকে মিলিত হন। শেখ মুজিব বলেন, আমি যদি না থাকতে পারি, তাজউদ্দিন আহমদ সরকার গঠন করবে। তাজউদ্দিন আহমদের সাথে যোগাযোগ রেখে আরো সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলবেন।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার ঘোষণা, ইশতেহার ও প্রস্তাব পাঠ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই সভায় বক্তৃতা করেন। সভার প্রস্তাবে বলা হয়; স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করা হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অন্যদিকে ইশতেহারে বলা হয় : আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হলো। ৫৪ হাজার বর্গমাইলে ৭ কোটি মানুষরে এই আবাসভূমি রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম

কমিটি ও মুক্তি বাহিনী গঠন করে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন—বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করবো। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের আলাদা শাসনতন্ত্র রচনার আহ্বান জানান। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস, একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ২৯-৩০, ৩১)।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে খন্দকার কামরুল হুদা তাঁর "স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শেখ মুজিব" নামক গ্রন্থে ইপিআর-এর ওয়্যারলেসযোগে মধ্যরাতে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন, ২৫ মার্চ মধ্যবর্তী রাত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিআরের ওয়্যারলেস যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খন্দকার কামরুল হুদা তার গ্রন্থের "বীর চট্টলার প্রতিরোধের বীরগাথা" অধ্যায়ে মেজর জিয়ার আগমন অংশে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা সম্পর্কে লেখেন , ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসভবনে একটা ওয়ারলেস মেসেজ আসে। তাতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণা সেই রাতেই বাংলায় সাইক্লোস্টাইল করে বিলি করা হয়। এ গ্রন্থে আরো লেখেন, আসলে ওটা ছিল ডা. নুরুন্নাহার জহুর কর্তৃক গৃহীত ম্যাসেজ যা তিনি লিখে নিয়ে মধ্যরাতেই একাধিক কপি করে সংগ্রাম পরিষদের নেতাসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেন। যেহেতু বিপর্যস্ত ও অস্থির অবস্থার কারণে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ওয়্যারলেস স্টাফদের যোগাযোগ ছিল না কিংবা ডা. নুরুন্নাহার জহুরের সাথে অজানা নেতৃবৃন্দের ঘোষণা সম্পর্কে সরাসরি কথাবার্তা তথা বাণীর আগমন সূত্র সম্পর্কে পরস্পর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ হয়নি বা এ সবের প্রয়োজনীয়তা তখন কেউ অনুভব করেননি, তাই অনেকেই মনে করেছিলেন এটা ওয়ারলেস স্টাফরাই রাতে জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছেন ওয়্যারলেস মেসেজ গ্রহণকারী স্টাফরাই বলেছেন তারা বাণীটির ব্যাপারে রাতে শুনেছেন কিন্তু সকলেই তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন।

১৯৯৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা থেকে প্রকাশিত সৈয়দ নূর আহমদ লিখিত, "ইতিহাস কথা বলে"। গ্রন্থে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে অপরদিকে রাতের অন্ধকারে পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে আটক করে। ঐ রাতেই বন্দি হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ৩২ নং রোড ধানমন্ডি হতে। ২৫ মার্চ রাতেই ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন, 'পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা নগরীর নিরীহ মানুষ ইপিআর সেনাবাহিনী ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা চালিয়েছে। এর

প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো। আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যান। আমরা অবশ্যই জয় লাভ করবো। আল্লাহ আমাদের সহায়। জয় বাংলা।

১৯৭৬ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মেজর জিয়ার বাণীর উদ্ধৃতি, আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী সেনাপতি শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে একটি সার্বভৌম আইনানুগ সরকার গঠন করেছি যা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী কাজ চালাতে প্রতিশ্রুত। সুতরাং আমরা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী দেশের প্রতি আইনসঙ্গত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। (১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত) ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের সংবাদ ম্যাগাজিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা শিরোনামের শেষ প্রচ্ছেদে একটি বাণী প্রচারিত হয়। বাণীটি ছিল : পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরে লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্যে চান। কোনো আপস নেই—জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমানের উক্ত বাণীটির নীচে লেখা রয়েছে চট্টগ্রাম ইপিআর ওয়্যারলেস ঘাঁটি এবং জহুর আহমদ চৌধুরীকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাণী—যারা এই বাণী গ্রহণে ও প্রেরণে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন এ কে এস এম এ হাকিম, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, আবুল ফজল ও সফিকুল ইসলাম। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৬ শিক্ষা বছরের জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্ধারিত "বাংলাদেশের ইতিহাস" পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদে

স্বাধীনতা ঘোষণা'' উপশিরোনামে উল্লেখ করা হয়। বন্দি হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার একটি লিখিত বাণী চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরীসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম "স্বাধীন বাংলা বেতারে'' এটি প্রচার করা হয়। ২৭ মার্চ অষ্টম রেজিমেন্টের মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন। তখন থেকে শুরু হয় ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ। (স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু প্রামাণ্য দলিল, মুহাম্মদ শামসুল হক- পৃ. ১৯-২৪)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এটা জেনারেল ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পাকিস্তানি বিভিন্ন রাজনীতিবিদ এবং সমর নায়কদের বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। খুনি পাক-চক্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রেডিও পাকিস্তানে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান তার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেশদ্রোহিতামূলক কাজ করেছেন। তারা একটা সমান্তরাল সরকার চালাতে চেষ্টা করেছেন। শেখ মুজিব যে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা একটা ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই লোক এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু আর তাঁরা পূর্বপাকিস্তানকে দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করতে চান। তিনি দেশের ঐক্য ও সংহতিকে আক্রমণ করেছেন এ অপরাধের শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

এরপর ২৮ জুন জেনারেল ইয়াহিয়া খান রেডিওতে আর একটি ভাষণ দেন জাতির উদ্দেশ্যে। ঐ ভাষণে তিনি বলেন : আমি যখন রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকের জন্য চেষ্টা করলাম তখন একথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে মুজিব তার দাবিতে কোনো পরিবর্তন করতে রাজি নন। আর তার দাবিটা ছিল সোজা কথায় বলতে গেলে বিচ্ছিন্নতার দাবি। শেখ মুজিব আগে থেকেই মনস্থির করেছিল যে তিনি দেশকে দুটি অংশে বিভক্ত করবেন। কৌশলে হলে ভালো না হলে বল প্রয়োগ করে। একদিকে মুজিব আমাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল আর অন্যদিকে তিনি ও তার দলের লোকেরা বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা চেয়েছিল যে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশ নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস ১টি অনুসন্ধান মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৬৮-৬৯)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং তিনি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এটা জনাব ভুট্টোর বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয়। জনাব

ভুট্টো বলেন : পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি জনসাধারণের ভুল পথে চালিত করেছিলেন এবং প্রকৃতই তিনি পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাস করেন না। ২৩ মার্চ চূড়ান্ত খেলা দেখানো হয়। বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। তাছাড়া জাতির পিতার প্রতিকৃতি পদদলিত করা হয়। ১৯৬৬ পূর্ব পাকিস্তানকে দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পৃথক করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জনাব ভুট্টো আরো বলেন : সাড়ে সাত কোটি লোকের দেশকে বক্তৃতা স্লোগান এবং অন্যভাবে উৎসাহিত করে বিভক্ত এবং ধ্বংস করা যাবে না। তিনি বলেন, যেখানে নাইজেরিয়ার মতো দেশ একটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন হতে দিল না সেখানে পাকিস্তানও দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড হতে দিতে পারে না। (স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু, ড. আনোয়ারুল ইসলাম পৃ. ১৯৬)।

কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাইয়ুম খান বলেন যে কেবলমাত্র তার দলই শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার ৬ দফার খোলাখুলি বিরোধিতা করেছে এবং ৬ দফার সম্পর্কে দেশকে হুশিয়ার করে দিয়েছে। আজ এটি স্পষ্ট হয়েছে যে ৬ দফা আসলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচি এবং শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের এজেন্ট। স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু ডা. আনোয়ারুল ইসলাম, পৃ. ১৯৮)। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক তার উইটনেস টু সারেন্ডার বইতে বেতারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন। ভারতে নিয়োজিত দি ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর লোশাকের বই পাকিস্তান ক্রাইসিস থেকে তিনি নিম্নে বর্ণিত উদ্ধৃতি দেন :

যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো ঠিক সেই মুহূর্তে সরকারি মালিকানাধীন পাকিস্তান রেডিওর তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। শেখ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর বাণী নিশ্চয় ইতোপূর্বে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হয়েছিল। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন পৃ. ১৯)।

বিদেশি পত্রপত্রিকা থেকেও প্রমাণ মিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সব খবরা-খবর প্রকাশ হয়েছে তাতে এর একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারিতে "লন্ডন টাইমস" লিখেছেন শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত বিবৃতিতে পূর্বপাকিস্তানের পরিবর্তে "বাঙালি" জাতির কথা উল্লেখ করেন। ২৪ ফেব্রয়ারি লিভারপুল ডেইলি পোস্ট" মন্তব্য করেন হোয়াইট হলে এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তান নিজেকে স্বাধীন বাঙালি মুসলিম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে এখন আর পূর্বপাকিস্তানের কথা বলছেন না, বলছেন বাঙালি প্রজাতন্ত্রের কথা। হোয়াইট হলে এটা অনুধাবন করা হচ্ছে যে বৃটিশ সরকার একটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশ বিভক্তির মারাত্মক সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা ২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তাতে লিখেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় তাড়াহুড়ো করে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, আওয়ামী লীগ মার্চ মাসের ৭ তারিখে একটি জনসভা অনুষ্ঠান করা এবং এই সভায় তিনি বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের দাবি প্রদান করবেন। তিনি স্বাধীনতা দাবি করবে কিনা একথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন অপেক্ষা করুন।

১৯৭১ সালের ৯ মার্চ লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাম পত্রিকা মন্তব্য করেন শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা একরকম ঘোষণাই করেছেন ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদত্ত ৪ দফা দাবির মধ্যেই এ কথা লুকায়িত রয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব তাঁর আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলন বলে অভিহিত করে জাতীয় পরিষদে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেন যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেন না। একই দিনে ডেইলি টেলিগ্রাফ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন আমরা ইতোমধ্যই পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান এর সম্ভাব্য নামকরণ শুনছি যা বাংলাদেশ কিংবা বঙ্গভূমি হতে পারে। এর পতাকাও বানানো হয়েছে।

১৩ মার্চ 'লন্ডন ইকোনমিস্ট লিখেছেন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ২৫ মার্চ তারিখে গণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জবাবে শেখ মুজিব চারটি শর্ত আরোপ করেন যা তাঁর এবং আওয়ামী লীগ অধিবেশনে যোগদানের পূর্বেই পূরণ করতে হবে। আওয়ামী লীগের ওই শর্ত প্রেসিডেন্টের মেনে নেওয়া অসম্ভব।

১৪ মার্চ ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নতুন দাবি করা নির্দেশের বরাত দিয়ে মন্তব্য করেন। মিস্টার মুজিবুর বলেছেন যে তিনি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেছেন।

১৫ মার্চ নিউইয়র্ক ভিত্তিক "টাইম" সাপ্তাহিক রিপোর্ট করে পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার পিছনে যে মানুষটি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। গত সপ্তাহে ঢাকায় শেখ মুজিব "টাইম" এর সংবাদদাতা ডন কার্গিনকে বলেন, বর্তমানে পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। সমঝোতার আর কোনো আশা নাই। (স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু ড. আনোয়ারুল ইসলাম, পৃঃ ২১৭-২১৮)।

১৬ মার্চ লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা তার সংবাদদাতা মার্টিন এডনির পাঠানো প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে জানায় সারা পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত অন্যান্য কমিটির মতো সংগ্রাম পরিষদেরও আলোচনার বিষয় ছিল তাদের বিবেচনায় ইতোমধ্যেই স্বাধীন হয়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। ৫৮টি গ্রাম থেকে প্রায় শ-তিনেক লোক সংগ্রাম পরিষদের একটি শাখায় একত্রিত হয়েছে। তারা প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত এবং এর জন্য তারা এমন একজন গ্রামবাসীর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে যুদ্ধবিদ্যা যার একমাত্র অধিকার।

২৪ মার্চ হংকংভিত্তিক ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ পত্রিকা লেখে : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন পশ্চিম পাকিস্তানে তার পরবর্তী উদ্যোগের কথা ভাবছিলেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান তার ঢাকার বাড়িতে আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, এটাই শেষ দফা। শেখ মুজিবের বাসভবন বাংলাদেশের পতাকা এবং বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। একথার কী অর্থ তা জিজ্ঞেস করায় তিনি সেই স্লোগানটি দিয়ে তার জবাব দিলেন যে তিনি হাজার হাজার বার জনতার সামনে উচ্চারণ করেছেন জয় স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা, দীর্ঘ জীবিত হোক। (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৭০-৭১)।

মেজর জিয়া কর্তৃক ২৭ মার্চ, '৭১-এর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রচার সম্পর্কে বিবিসি-এর সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেন হাস বলেন, জিয়া এমনকি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী হিসাবেও তার খ্যাতিকে কাজে লাগিয়েছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে এর ত্রিশ ঘণ্টা আগেই অন্য একজন স্বাধীনতা ঘোষণা একই বেতার কেন্দ্র থেকে প্রদান করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যে বাঙালি জাতিকে মুক্ত স্বাধীন করার লক্ষ্যে আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন সে বিষয় ওয়াশিংটন ইভিনিং স্টার পত্রিকায় লেখা হয় শেখ মুজিবুরই হচ্ছেন একমাত্র বাঙালি নেতা যার ইজ্জত ও ব্যক্তিগত বিরাট সমর্থন রয়েছে এবং তিনি দেশকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে অন্যকোনো সমাধান তার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া খুবই মুশকিল হবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ সর্বাগ্রে প্রচার করে বার্তা সংস্থা ইউ এন আই। এই সূত্র থেকে সংবাদটিও ভারতে বিভিন্ন সংবাদপত্র, আকাশবাণী, রেডিও অস্ট্রেলিয়া এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। সংবাদটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দিল্লিস্থ স্টেটম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৫ মার্চ, '৭১-এর শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৩ মার্চ, '৭১-এর প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বেতারে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৫ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার খবর প্রচার করা হয়। দিল্লির অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ওয়্যারলেস পাকিস্তানি বেতারের খবর ধরা পড়ার সাথে সাথে উক্ত খবর আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ওয়্যারলেসে পাঠিয়ে দেয়া নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় হয়। ২৭ মার্চ, '৭১ তারিখেই উক্ত খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ছবিসহ প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে ২৭ মার্চ, '৭১ তারিখে লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকার হেডলাইন ছিল হ্যাভি ফাইটিং অ্যাজ শেখ মুজিব ডিক্লার্স ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টস হ্যাভ পুশভ শেখ মুজিব টু হিজ ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স।

২৫ নভেম্বর, '৭১-এ ওয়াশিংটন পোস্ট লিখলো তবুও পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব বাংলার পূর্ণ কর্তৃত্ব করায়ত্ত করতে পারেনি। উপরন্তু বাঙালির প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেও পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমিয়ে রাখতে পারেনি।

২৬ মার্চ, '৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বিশিষ্ট সুধী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার ডেটলাইন ঢাকা শীর্ষক স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন। সে সময় চট্টগ্রাম রেডিও থেকে ঘোষণা হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম। ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের শুরুতে

বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ নির্দেশ জারি করে দিয়েছিল। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। (স্বাধীনতার ঘোষক কে ইমন সরকার, পৃ. ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৫৬, ৫৭)।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় বিবিসি থেকে মন্তব্য করা হয় বাংলাদেশে যা কিছুই ঘটুক না কেন শেখ মুজিবুর রহমান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন—মানুষটি হিসেবে যিনি না হলে বাংলাদেশের জন্মই হত না।

আমরা বাঙালি জাতির সৌভাগ্যবান প্রজন্ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এই প্রজন্মেই আবির্ভাব হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো এক ক্ষণজন্মা মহানায়ক। এই মহানায়ক জন্মসূত্রেরই বাংলা ভূখণ্ডের বাঙালি জাতিকে সুযোগ্য নেতৃত্বদানের মাধ্যমে স্বশাসিত সার্বভৌম দেশে পরিণত করেন। (স্বাধীনতার ঘোষক কে ইমন সরকার, পৃ. ৫৭)।

স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ আছে কি?

ডা. এস এ মালেক

একজন বাঙালি মেজর, যিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কর্মরত এবং ২৫ মার্চেও যিনি হানাদার বাহিনীর জন্য প্রেরিত অস্ত্র সোয়াত জাহাজ থেকে খালাশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কোথাও কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না, এমনকি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক বাহিনীর যেসব বাঙালি অফিসার সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের সঙ্গেও যার কোনো যোগাযোগ ছিল না, তিনি হঠাৎ কী করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন তা বোধগম্য নয়।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা সকলেই ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। এই যুদ্ধের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। ভাষা আন্দোলন, ৬-দফা আন্দোলন, '৭০-এর নির্বাচন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নেতৃত্ব ছিল সর্বাগ্রে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাতিসত্তায় রূপান্তরিত করে জাতিরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি নিজেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর অবস্থানে পৌঁছানো আর কোনো বাঙালির পক্ষে সম্ভব নয়। জাতীয় স্বাধীনতা তাঁরই অবদান। তাঁর জন্ম না হলে হয়তো বাংলাদেশ স্বাধীনই হতো না। এটাই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস, এর বিপরীতে যাই প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হোক না কেন তা ইতিহাসগ্রাহ্য নয়।

১৯৭০-এর নির্বাচনে ৬ দফায় ম্যান্ডেট নিয়ে একচ্ছত্রভাবে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুই বাংলার মানুষের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই পাকিস্তানি শাসকরা জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসতে না দিয়ে কালক্ষেপণ করে যখন পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলায় সৈন্য আনার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে প্রকৃত অর্থেই তিনি জনগণের নির্বাচিত

প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ শাসন করেন ও প্রায় একটা প্যারালাল, সরকার গঠন করে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও পাকিস্তানের অস্তিত্ব তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি। আসগর খান তাই পূর্ব বাংলা সফর করে মন্তব্য করেছিলেন, একমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া আর কেউ পাকিস্তান টিকিয়ে রাখতে পারবে না। শেখ মুজিবের রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য শাস্তি হবেই এ বলে জেনারেল ইয়াহিয়া তাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের পর মাত্র ৩৫টি বছর কেটেছে, এখনো কয়েক কোটি মানুষ জীবিত আছেন, যারা স্বচক্ষে দেখেছেন বঙ্গবন্ধু কী করে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উল্কার মতো ছুটে তার ৬ দফা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাকে বাংলার মানুষ তাদের প্রাণের দাবি হিসেবে গ্রহণ করে যেকোনো ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ১৬৯ আসনর ভেতর ১৬৭ আসন পেয়ে তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে একচ্ছত্রভাবে নেতৃত্ব দেন। তিনিই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এবং তার অবর্তমানে মুজিবনগর সরকার তাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে। জেনারেল জিয়ার সংশ্লিষ্টতা ছিল শুধু ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে। একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তিনি মুজিবনগর সরকারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যেমনটা করেছিলেন অনেক বাঙালি সামরিক কর্মকর্তারা।

কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার যে কথা বিএনপি থেকে বলা হয়ে থাকে, প্রকৃত অর্থে তা যে কী ছিল তার ব্যাখ্যা তো জেনারেল জিয়া নিজেই দিয়ে গেছেন। প্রথমবারের ঘোষণা তো তিনিই সংশোধন করে পরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা দেন। একটা স্বাধীন বেতার কেন্দ্র পাওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার পর তাদের কাছে যখন প্রতীয়মান হয় যে একজন সামরিক অফিসারকে দিয়ে ঐ ঘোষণা পাঠ করাতে পারলে অন্তত বাংলাদেশের সব সামরিক অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তখনই তারা মেজর জিয়াকে অনুরোধ জানান। দ্বিতীয়ত, যেহেতু বঙ্গবন্ধু স্বকণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যেতে পারেননি বা তার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব ছিল না সে কারণে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার বার্তাটি যদি একজন সামরিক কর্মকর্তাকে দিয়ে প্রচার করা যায় তাহলে তা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে। এ কারণেই তখন মেজর জিয়াকে কাছে পাওয়ার কারণে তাকে দিয়ে ঐ ঘোষণা দেওয়ানো হয়।

তবে এ ঘোষণা দিতে গিয়ে মেজর জিয়া এমনই এক অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাতে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তিনিই যেন মুক্তিযুদ্ধের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। কেননা তার বোধহয় ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধুকে হানাদার বাহিনী হত্যা করেছে, তাই তিনি সেই সুযোগ নিয়ে নিজেকেই সরকার ও সামরিক বাহিনী প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে তা আবার পরিবর্তন করে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তাকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়। তিনি ভালো করেই জানতেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার রাজনৈতিক বা আইনগত অধিকার তার নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই জনগণের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে, পাক সরকার যখন তাকে সংসদে বসতে না দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মূলত এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে, বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধু হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করার নির্দেশ প্রদান করেন। হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ইপিআরের ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন ও বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় টেলিগ্রামের মাধ্যমে তা পৌঁছে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় বাঙালি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা বিদ্রোহ করেন ও বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেকে হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি পর্যন্ত আক্রমণ করেন। এরূপ অনেক মেজরের নাম উল্লেখ করা যাবে যারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পরপর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন ও অনেক জায়গায় তাদের খতম করেন। মেজর জিয়া যখন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তখন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ চলছিল, কিন্তু তার কোথাও তাকে সংশ্লিষ্ট হতে দেখা যায়নি। ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে মুজিবনগর সরকারের অধীনে চাকরি নেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেসব যুদ্ধ হচ্ছিল তার কোথাও তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার আগেই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি সামরিক অফিসার, পুলিশ, আনসার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন তার কোথাও তাকে দেখা যায়নি। তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে নিজের জীবনের নিরাপত্তা রক্ষায় তখন ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন নিজেকে সরকার ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন তখন কি কোনো সেনাবাহিনী তার নিয়ন্ত্রণে ছিল বা এমন কোনো সরকার তখন গঠিত হয়েছিল যার নেতৃত্বে তার পক্ষে থাকা সম্ভব ছিল। তখন সরকার বলতে বঙ্গবন্ধু

ও তার নির্দেশনাকে বোঝাতো এবং সে সরকারের পরিচালনায় ছিলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। পরবর্তী সময়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে তিনি তার অবস্থা অনুধাবন করতে পেরে ওই সরকাররে অধীনে চাকরি নিয়ে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে ওই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। কখনো একবারো তাকে বলতে শোনা যায়নি যে যেহেতু তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন অতএব তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত নায়ক।

১৯৭১-এর ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক এই ঘোষণার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা কি আর কারো ঘোষণার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল বা তার কোনো প্রয়োজন ছিল। জেনারেল জিয়া তো নিজে কোথাও বলেননি যে, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বরং বিচিত্রায় লিখিত প্রবন্ধে তার বক্তব্য হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ও জাতির জনক হিসেবে তিনি বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করেন। এরপর '৭৫-এ প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষমতায় আসে। তারাই জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য জেনারেল জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনে সেই কালুরঘাটের রহস্যাবৃত ঘোষণাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে বেশ কিছুটা সফল হয়। জিয়ার অবর্তমানে তার ভাবমূর্তি ব্যবহার করে ও জেনারেল জিয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গ কাজে লাগিয়ে সুদীর্ঘ দেড় দশক বিএনপি বাংলাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাস বিকৃতির মতো অপকৌশল তারা কাজে লাগিয়ে তাদের অবস্থান বেশ কিছুটা শক্তিশালী করে বারবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে। এখনো সেই ধারা অব্যাহত আছে। তা না হলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ জেনারেল জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে মেনে নিতে পারে কি? মওলানা ভাসানীর মতো নেতাও বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কেননা বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের সকলেই তখন জানতেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ২৩ বছরের বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাসই তা প্রমাণ করে অথচ ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে বিএনপি ইতিহাস বিকৃতির যে কাজটা শুরু করেছে তা সমগ্র জাতির জন্য লজ্জাকর। এ কারণে বিদেশি মেহমানদের অনেক সময় বিব্রতবোধ করতে হয়। বহির্বিশ্ব যেমন বিবিসি এখনো বঙ্গবন্ধুকে

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রচার করে থাকে। তবে জেনারেল জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর বাক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া এখন ততোটা সক্রিয় নয় যা শুরু করা হয়েছিল খালেদা জিয়ার পূর্ববর্তী সরকারের আমলে। '৯৬-এ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রায় স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল ওই প্রক্রিয়া। খালেদা জিয়া পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ায় ও স্বাধীনতাবিরোধী জামাত তাদের সঙ্গে থাকায় ওই প্রক্রিয়া অর্থাৎ মিথ্যাচার আবার সক্রিয় করা হয়েছে। যতোদিন তারা ক্ষমতায় থাকবে ততোদিন ওই মিথ্যাচার অব্যাহত রাখবে, ক্ষমতাচ্যুত হলেই ইতিহাস পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। তাই এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা করার বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

একটা জনগোষ্ঠীকে এভাবে সংঘবদ্ধ করে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে একটা পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামে পৌঁছে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন আর কোনো নেতা সফল করে যেতে পারেননি। এ কারণেই তিনি জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এমন অনেক নেতা আছে তবে ঐ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাতিসত্তায় রূপান্তরিত করার একমাত্র কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। তার জন্ম না হলে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতো না এটা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ দেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের ধারা তিনি সূচনা করেন। ধর্মভিত্তিক, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের রাজনীতির বিপরীতে এ দেশে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গড়ার চিন্তা ও চেতনায় তিনিই উদ্বুদ্ধ হন।

স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জেনারেল জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তাকেই বঙ্গবন্ধুর বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো যাবে এরূপ চিন্তা ও চেতনার বশবর্তী হয়েই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সুদীর্ঘ দিন অপপ্রচার চালানো হয়। যখনই বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়েছে তখনই ইতিহাস বিকৃতি ঘটেছে। পাঠ্যপুস্তকে জেনারেল জিয়াকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে অস্বীকৃতি ও পরে চার জাতীয় নেতার একজন হিসেবে জিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। জেনারেল জিয়াকে জাতির জনক হিসেবে অভিহিত করা না হলেও বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গবন্ধুর অস্বীকৃতি অসম্ভব হওয়ার কারণেই তাকে চার জাতীয় নেতার একজন বলে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। তবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরও

পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারসমূহ তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে, জাতির জনক হিসেবে তাকে অস্বীকৃতি জানানোর সপক্ষে দেশে-বিদেশে কোটি কোটি টাকা অপচয় করে প্রচারকার্য চালিয়েছে। তবে কোনো সুফলই অর্জিত হয়নি। জিয়া ঠিক তার অবস্থানে রয়েছেন, আর বঙ্গবন্ধু স্বমহিমায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত আছেন। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিশেষ করে স্বাধীনতা শত্রু জামাত তার সরকারের অংশীদারিত্ব পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঠিক পূর্বের মতো এমনকি তার চেয়েও বেশি অপপ্রচার চালানো হয়। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। বঙ্গবন্ধু জাতির জনক এমনকি বিবিসি জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার পর মাত্র সাড়ে ৩ বছরের মাথায় প্রতিবিপ্লব সফল হওয়ায় বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার শত্রুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হওয়ায় তারা যা ইচ্ছা তাই বলছে ও করছে। নির্লজ্জ মিথ্যাচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তো কয়েকটি কথা প্রায় মুখস্থ কবিতার মতো অনর্গল বলে থাকেন। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে বেশি করে বলতে শোনা যায়। এতোকিছু করেও জাতির জনকের স্থলে অপর কোনো বিকল্প নেতা খাড়া করা সম্ভব হয়নি। আর যতোদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকবে ততোদিন তা সম্ভব হবে না। এ কারণে আবার ক্ষমতাসীন হলে তারা বাংলাদেশটাকেই পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করবে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বাংলাদেশের জন্ম, সে বাংলাদেশ ক্ষমতাসীনরা স্বীকার করে না। স্বীকার করে না তাদের দোসর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি। তারা চায় বাংলাদেশকে একটা ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে। এ কারণেই তাদের আমলে বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র বানানোর স্লোগান উঠেছে। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যা কিছু অর্জন তা বর্জন করা হয়েছে। আর এখন এই দেশটাকে একটা মৌলবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে পারলেই তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধু সবকিছুকেই অস্বীকৃতি জানাতে পারে। যারা জাতিসত্তায় বিশ্বাস করে না তারা জাতির জনককে বিশ্বাস করবে কেন। এ কারণে বঙ্গবন্ধু ওদের কাছে গুরুত্বহীন। ওরাই বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল এখনো করে। বাংলাদেশ, বাঙালি, জাতীয়তাবাদ, বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলার কোনো কিছুই ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ওরা '৭১-এর

পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চায়। বাংলাদেশকে প্রকৃত অর্থে পাল্টে দিয়েই ওরা সে প্রতিশোধ নিতে চায়। তাই ওদের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন। সে কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এসবের প্রবর্তন, এটাই বর্তমান বাস্তবতা। স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির এসব বিবেচনায় নিয়েই রাজনীতি করা প্রয়োজন। প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী, স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী চক্রের এই চক্রান্ত প্রতিহত করতে না কারলে সত্য সত্যই বাংলাদেশ থাকবে না। আর বাংলাদেশ যদি না থাকে তবে বঙ্গবন্ধু থাকবেন কী করে।

বাংলাদেশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বাধীনতার স্বপক্ষের সর্বাত্মক ঐক্য ছাড়া লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এ কারণেই জাতীয় ঐক্যের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জন যেমন কঠিন, স্বাধীনতা সংরক্ষণ আরো কঠিন। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ প্রতিপক্ষের হুমকির সম্মুখীন। জাতির জনককে হারিয়ে স্বাধীনতার ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা তার ওপর আঘাত হানছে তাকে আরো দুর্বল করতে। এখনই সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা মোকাবিলা করা।

ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক

মোহাম্মদ সেতাব উদ্দিন

আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছি। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও আমরা বঙ্গবন্ধুর নামেই মুক্তিযুদ্ধ করেছি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান এবং পরিচালনার জন্য ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে যে রাজনৈতিক সরকার গঠিত হয় সে সরকারে রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এমএজি ওসমানী। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেহেতু পাকিস্তানে জেলে বন্দি ছিলেন সেহেতু উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে যুদ্ধকালীন ৯ মাস দায়িত্ব পালন করেন।

আমরা জানি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন এবং তারই নামে সার্বিক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত জয় বাংলা স্লোগানই ছিল আমাদের পথনির্দেশক। আর তাই যুদ্ধক্ষেত্রে এই 'জয়বাংলা' স্লোগানই আমাদের শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনককে সপরিবারে হত্যার পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে উল্টোদিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। জয় বাংলা স্লোগানকে নির্বাসিত করা হয়েছে। সে সুযোগ সুবিধামতো সময়ে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে অত্যন্ত সঙ্গোপনে জাতির জনকের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক পদবিটি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানীর কাছে ট্রান্সফার করা হয়েছে। অথচ দেখবেন ১৭ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধের সরকার গঠনের পর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে গার্ড অব অনারে স্যালুট দিচ্ছেন। (টিভি ফুটেজে স্বাধীনতা দিবসে দেখানো হয়)।

আরও পরে সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তার স্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। তারপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর আরেক অভিনব অপচেষ্টা। বিএনপি এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলো দলের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়ার নামের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে দেয় 'স্বাধীনতার ঘোষক' কথাটি। যেন স্বাধীনতার ঘোষক শব্দ দুটি বাদ দিয়ে জেনারেল জিয়ার নাম উচ্চারণ করা হারাম। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সব মানুষই জানত বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার ঘোষক, বঙ্গবন্ধুই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। আর এখন প্রিন্ট মিডিয়াসহ সব বেতার-টিভিতে প্রচার হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের 'সর্বাধিনায়ক' জেনারেল এমএজি ওসমানী।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন, অবিলম্বে এ ইতিহাস বিকৃতি স্থায়ীভাবে বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। জরুরি ভিত্তিতে আদেশ জারি করে কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য তা প্রিন্ট মিডিয়াসহ সব বেতার-টিভিতে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, 'মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক' ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল এমএজি ওসমানী। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করি।

স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক

বাহাউদ্দীন চৌধুরী

স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে একটা অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল বিএনপি। মহামান্য হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক রায়ে এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে। এজন্য তারা এজন্য তারা সারা দেশবাসীর অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা লাভ করেছে। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে জনগণনন্দিত বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক নয়। রায়ে বিচারকগণ ২০০৪ সালের প্রকাশিত ও মুদ্রিত মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র-এর তৃতীয় খণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ দীর্ঘ শুনানি শেষে এ রায় দেন।

স্বাধীনতার ঐতিহ্য সঙ্কলন ১৯৮২ ও ২০০৩ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশ করে। ২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র ' পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৫ খণ্ডে রচিত এ দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বলে উল্লেখ করা হয়। তৃতীয় খণ্ডের এ অংশটুকুর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০ এপ্রিল হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা এমএ সালাম।

আদালত রায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ড বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে তা প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। হাইকোর্টের এ আদেশ কার্যকর করতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয় আদালত।

রায়ে বলা হয়, জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তার নির্দেশে ১৯৭৮ সালে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের লক্ষ্যে হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে নয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক রচিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সঙ্কলন গ্রন্থটি সঠিক ও তথ্যনির্ভর। ১৯৮২

সালে তথা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তা প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালেও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্কলনেও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়। কপিরাইট আইনানুযায়ী এ গ্রন্থের সর্বস্বত্ব তথ্য মন্ত্রণালয়ের।

কিন্তু ২০০৪ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সঙ্কলন পুনর্মুদ্রণের নামে সংশোধন করে প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি যেসব তথা উল্লেখ করেছে তা অসত্য। তারা ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রয়াত তাজউদ্দিন আহমদের বক্তব্যের শেষাংশ তুলে ধরে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালান। কিন্তু তাদের বক্তব্যের সব অংশ ও ঘটনা পর্যালোচনা করলে প্রকৃতভাবে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ সকাল হওয়ার পূর্বে দেশের সব স্বাধীনতাকামী জনগণের কানে পৌঁছে গিয়েছিল।

হাইকোর্ট রায়ে বলেছে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ডে বেআইনিভাবে যাঁরা ইতিহাস বিকৃতি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারবে। আদালত স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস সব পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে প্রকৃত ইতিহাস অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে আদালত।

মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক বলে অভিহিত করেছেন। ওই প্রবন্ধে কোথাও তিনি নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে উল্লেখ করেননি। বরং তার লেখায় তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন—এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে করে জিয়াউর রহমানের সততা প্রকাশ পায় বলে আদালত মন্তব্য করে। এছাড়া জিয়াউর রহমান কখনও নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করেছে—এমন কোনো দলিল বা প্রমাণ আদালত খুঁজে পায়নি।

উদাহরণ দিয়ে আদালত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের শাসনামল বিচার করলে দেখা যায়, তৎকালীন রাজা-বাদশারা কখনও নিজেরা ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা বা যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে তাকালেও এ ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রতি ক্ষেত্রেই শাসনকারী বা রাজার

পক্ষে কেউ ফরমান জারি করতেন। জিয়াউর রহমানের দেয়া ঘোষণাও এ ধরনের ছিল। আদালত রায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবন ও ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ দেয়া ভাষণসহ গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য রায়ে তুলে ধরে।

বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে আদালত বলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস খুঁজে বের করতে হলে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের দিকে নজর দিতে হবে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি। এর পরে জিয়াউর রহমান তাঁর লেখায় এবং ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল চেয়ে করা রিটে বিচারপতি এমএম হক শেখ মুজিবকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করেন।

রায়ে আরও বলা হয়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকার, সংবিধানের মূল প্রস্তাবনা, বিজয় দিবসের ঘটনাসহ সব ক্ষেত্রে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ২০০৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় বর্ণিত জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তথ্য সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংবিধান অনুযায়ী, সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু করা হলে তা আইনানুযায়ী বাতিল হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তানসহ বাংলাদেশে ২৬ ও ২৭ মার্চের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায়নি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিযেছেন। বরং শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুন হান্নান, বেলাল মোহাম্মদ ও জিয়াউর রহমান—সবাই শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছেন।

এই রায়ের পরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উল্লিখিত খণ্ডটি প্রত্যাহারের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। সম্পূর্ণ রায়টি পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সম্পর্কিত প্রত্যয়ন কর্মটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, মিথ্যা তথ্য সংযোজন ও সংবিধানবিরোধী সিদ্ধান্তের জন্য প্রত্যয়ন কমিটির সদস্যদেরও বিচার হওয়া উচিত। প্রত্যয়ন কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন যে, তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী প্রত্যয়ন কমিটির মতো অগ্রাহ্য করে নিজের ইচ্ছামতো তথ্য সংযোজন করেছেন। প্রতিমন্ত্রী অবশ্য তার প্রতিবাদ করে বলেন যে, প্রত্যয়ন কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই বাস্তবায়ন করা হয়েছে, একটি শব্দও পরিবর্তন করা হয় নাই।

উল্লেখ্য, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তার অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ করা হয়। তখন তিনি নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেননি বরং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির পিতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি তাঁর মৃত্যুর পরে করেছেন তার পত্নী বেগম খালেদা জিয়া তাবেদার এমাজউদ্দীনের মতো তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে। স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য বিএনপি ঘরানার ইতিহাসবিদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি প্রত্যয়ন কমিটি করা হয়। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রথমেই এই প্রত্যয়ন কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাই তিনি এই মিথ্যা তথ্য সংযোজনের সঙ্গে জড়িত নন। বাকি সদস্যবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, ব্যরিস্টার মঈনুল হোসেন, ডক্টর কামাল সিদ্দিকি, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর একেএম মহসিন, প্রফেসর আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ, প্রফেসর জসিমউদ্দিন আহমদ, প্রকল্প পরিচালক আব্বাস আলি মিয়া কেউই এই বিষয়ে পরিবর্তিত অংশের প্রতিবাদ করেননি। নানারকম বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে পারঙ্গম ডক্টর এমাজউদ্দীন আহমদও চুপ ছিলেন। এখন ডক্টর এমাজউদ্দীন আহমদ হঠাৎ সাধু সেজে বিবৃতি দিচ্ছেন মানুষ কি তা বিশ্বাস করবে? এইসব বুদ্ধিজীবী সরকারের বিবিধ সুবিধা যথা রাষ্ট্রদূত ও যুগ্মসচিবের মর্যাদার কমিশনের সদস্য, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ও নানাবিধ সুবিধা নিয়ে সরকারের তাঁবেদারি করেছেন। এখন তাদের হঠাৎ সাধু সাজার চেষ্টা মানুষ কি বিশ্বাস করবে?

এমাজউদ্দীনসহ এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর মিথ্যাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ এদেশের শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলছে। সামান্য ব্যক্তিস্বার্থের জন্য তারা যে-কোনো অনৈতিক কাজ করতে পারেন বলে মানুষের ধারণা হচ্ছে। জাতির ভবিষ্যতের জন্য বিষয়টি খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

আশা করব, স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে আর কোনো বিতর্ক তৈরি করবে না বিএনপি। জিয়াউর রহমান তার নিজের লেখায় বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক মেনে নিয়ে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণই ছিল 'গ্রিন সিগনাল।' চট্টগ্রামে তাঁর সহকর্মী মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীও এই কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ তার লেখায় সুস্পষ্ট তথ্য দিয়ে বলেছেন যে, তারাই জিয়াউর

রহমানকে দিয়ে ২৭ মার্চ ঘোষণাটি পুনরায় পাঠ করিয়েছিলেন। এর আগে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা হান্নান ও বেতারকেন্দ্রের আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান যখন আমাকে মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখনও বলেছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেননি। কথাটা সত্যি।

আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনীতিবিদ-সাংবাদিক শ্রী নির্মল সেন লিখেছেন যে, তিনি স্বচক্ষে বঙ্গবন্ধুর ওয়্যারলেস মেসেজের কপি গ্রামের পোস্ট অফিসে দেখেছেন। তাছাড়া, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান জানানোর পরে অন্যকোনো ঘোষণার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? ৭ মার্চই তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসমুদ্রে রমনা রেসকোর্স ময়দানে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন, "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোল।" বস্তুত ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যেসব অর্বাচীন বুদ্ধিজীবী ইতিহাস পাল্টে দিতে চাইছে তারা ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। ইতিহাস আঁস্তাকুড়েই তাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এইসব অনৈতিক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্যই ধিক্কার ও ঘৃণা। সংবিধানের অবমাননাকারী এইসব ঘৃণিত ব্যক্তিদের অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্য।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ দিন শেষে নৃশংস গণহত্যার মাধ্যমে পাকবাহিনী ঢাকাকে পরিণত করে এক নরকপুরীতে। আলোচনার ফলাফল জানতে যখন দেশবাসী উদগ্রীব, তখন ইয়াহিয়া খান রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন। ওই আক্রমণকে বলা হয় আপারেশন সার্চলাইট। ওই সময়ে আমি চট্টগ্রামে। রাতে জামিল চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনযোগে কথা বলে জানতে পারলাম ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করার সময় নির্দেশ দিয়ে গেছেন যেন প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ঢাকা শহরকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সৈন্যরা শহরের সব ব্যারিকেড সরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে বিডিআর, পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করে । চারদিকে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। টেলিফোনে শুনতে পারলাম মুহুর্মুহু রকেট, মেশিনগান ও কামানের আওয়াজ। পরে জানলাম সেই কালো রাতে হত্যা করা হয় ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, প্রফেসর এম মুনিরুজ্জামান, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সিনিয়র লেকচারার ড. ফজলুর রহমান খান, সিনিয়র লেকচারার এম এ মোকতাদির, লেকচারার অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, লেকচারার এম আর খান খাদেম, লেকচারার শরাফত আলী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র লেকচারার ড. মোহাম্মদ সাদত আলী ও সিনিয়র শিক্ষক মোঃ সাদেককে। এ ছাড়াও ওই কালরাত্রিতে এস এম হল, জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলের বহুসংখ্যক আবাসিক ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ব্যারিকেড রচনাকারী জনতা, রেসকোর্স মন্দিরবাসী, নিঃস্ব বস্তিবাসী কেউই এই হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বস্তুত সেই রাত্রিতে হত্যার তাণ্ডব নৃত্যই চলেছে পাকবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে। খেলা হয়েছে রক্তের হোলি। সংহতি রক্ষার নামে কী অদ্ভুত পাশবিক নৃশংস কর্মকাণ্ড। কিন্তু শুধু কি মানুষ ? পাকবাহিনীর হাতে সেই রাতে অগ্নিদাহ হয়েছে জনতার কণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পিপলস অফিস। অগ্নিদাহ হয় নয়াবাজার বস্তি, কাঠের আড়ত।

আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে, কোথায় কেমন আছে তা জানার আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম। ওই রাতেই আমি আমার অনুজপ্রতিম বাবলুকে নিয়ে আন্দরকিল্লাস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে ছুটে গেলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী , এম আর সিদ্দিকী, এম এ মান্নান, এম এ হান্নান প্রমুখ। তাদের ঢাকার পরিস্থিতির কথা বললাম। তারা বঙ্গবন্ধুর খবর জানতে চাইলেন। আমি জানি না বলে জবাব দিলাম। তারপর সবাই মিলে কর্মসূচি তৈরি করলাম।

১. লালদীঘির পাড়ে গণজমায়েত করা এবং সবাইকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে ওখানে আসার আহ্বান। ২. পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করার মাধ্যমে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া। ৩. বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন মাইকে তা প্রচার করা।

২৬ তারিখ আওয়ামী অফিস সংলগ্ন সামী রেস্টুরেন্টের পেছনের রুমে বসে আমি, আতাউর রহমান কায়সার, ডা. জাফর এবং এম এ হান্নান রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এই মর্মে স্বাধীনতার ঘোষণার ড্রাফট তৈরি করা হলো এবং এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানকে কয়েকজন ভলান্টিয়ারসহ একটি জিপে করে আগ্রাবাদে অবস্থিত তদানীন্তন পাকিস্তান রেডিও স্টেশনে পাঠানো হলো। তিনি দুপুরের দিকে এই ঘোষণা পাঠ করলেন। এভাবে যে যেদিকে পারে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলো। এর আগে ১৫ মার্চ লালদীঘির মাঠে শিল্প সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিতে অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ রচিত এবারের সংগ্রাম নাটক অভিনীত হয় পরের দিন ১৬ মার্চ সফিনা মাহবুব মুন্নির পরিচালনায় লালদীঘির মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিরোধের গান নামক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম আমার সোনার বাংলা গানটি গাওয়া হয়।

২৬ মার্চ প্যারেড ময়দানে একটি বড়ো সমাবেশ করা হয়।

একটি বিরাট মিছিল এসে যোগ দিলো। আমি একটি কবিতা পড়লাম। তখন শুনতে পারলাম পাকিস্তানি বাহিনী এম ভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওনা হচ্ছে।

মেজর রফিকের ভাষায়—পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলাম, প্রথম গাড়িতে করে মেজর জিয়া পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। তার কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে এম ভি সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার জন্য তিনি রওনা হয়েছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চট্টগ্রামস্থ নিউ মার্কেট

শাখার ম্যানেজার কাদের যখন আমার বার্তা নিয়ে ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দপ্তরে যান তার আগেই মেজর জিয়া তার কমান্ডিং অফিসারের আদেশে ষোলশহর থেকে বেরিয়ে পড়েন। রেজিমেন্টের ডিউটি অফিসার আমার বার্তাটি পান। খবর পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজামান মেজর জিয়াকে থামানোর জন্য পোর্টের দিকে রওনা হয়ে যান। ২৫ মার্চ রাত তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। ২০ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা এরই মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল স্টোরের ওপর হামলা চালায়। ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য ও অফিসারবৃন্দ তখনো এ খবর জানতে পারেননি। পূর্বে উল্লিখিত দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান যখন আগ্রাবাদ পৌঁছেন তখন মেজর জিয়া সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যারিকেড পরিষ্কার করছিলেন। খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা জানালে মেজর জিয়া ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্ট লাইনে ফিরে আসেন এবং তার অফিসারদের সঙ্গে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেন।

ইউনিট লাইনে ফিরে মেজর জিয়া এবং তার অফিসাররা কমান্ডিং অফিসারসহ অবাঙালি অফিসারদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নেন। অবাঙালি অফিসারদের গ্রেপ্তার পর্ব শেষ হওয়ার পরই তাদের কাছে ক্যান্টনমেন্টের হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে। ২৬ মার্চ আকাশবাণী থেকে শোনা গেলো রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। গান শেষেই ঘোষিত হলো, একটি ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বেসামরিক জনগণেরও প্রচণ্ড লড়াই চলছে ঢাকার রাজপথে। খবরে জানতে পারলাম, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের অফিসার কমান্ডিং বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে একটি হেলিকপ্টার এসে তুলে নিয়ে গেছে। কোথায় তুলে নিয়ে গেছে কেউ জানে না। তার পরিবারকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। বাবর ও সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসে শ্রমিকদের অসম্মতি এবং পথে ব্যারিকেড তৈরি, ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহ এবং পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম পরিষদ গঠনই ছিল চট্টগ্রামে আমাদের প্রাথমিক কাজ।

ইতোমধ্যেই রেডিওতে কর্মরত আমার স্নেহভাজন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ আল ফারুক কালুরঘাটে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা এবং সাহসের সঙ্গে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। সবাই শুনতে পেলো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী কেন্দ্রের প্রথম ঘোষণা। কাশেমের ঘোষণার পর বাজলো 'জয় বাংলা, বাংলার জয়, হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়' সমবেত কণ্ঠের গান। গান থেমে গেলে আবার ঘোষণা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি'

এবারের কণ্ঠ সুলতানুল আলমের। আবার সমবেত কণ্ঠের গান—কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল।

'জেগেছে এই জনতা' গান শেষ হলে কবি আবদুস সালামের কণ্ঠে কুরআনের বাণী শোনা গেলো। কবি সালামের বক্তব্য শেষ হতেই আবদুল্লাহ আল ফারুকের কণ্ঠে শোনা গেলো একটি জরুরি ঘোষণা। ঘোষণায় বলেছিল, গত রাত ১২টায় বর্বর পাকবাহিনী ঢাকার পিলখানায় অতর্কিত হামলা চালিয়েছে, এতে লাখ লাখ মুক্তিকামী বাঙালি শহীদ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, যুদ্ধ চলছে সর্বত্র, সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের কাছ থেকে আমরা এখন সাহায্য প্রার্থনা করছি, জয় বাংলা।

২৭ মার্চ রাত ৮টার দিকে আমরা মেজর জিয়াকে নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হলাম। তিনি প্রথমে ইংরেজিতে নিজেকে সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে পরিচয় দিয়ে একটি ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা শোনার পরপরই এ কে খান টেলিফোনযোগে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, জিয়ার এই ঘোষণা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। লোকে মনে করবে বোধহয় বাঙালি কোনো মেজর ক্ষমতা দখল করেছে। তাই ইংরেজি ঘোষণার পরেই মেজর জিয়া বলিষ্ঠ কণ্ঠে যে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন তা নিম্নরূপ।

"আমি মেজর জিয়া, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। দেশের সর্বত্র পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। প্রিয় দেশবাসী, আপনারাও যে যেখানে আছেন হাতের কাছে যা কিছু পান তাই দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ইনশাল্লাহ, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এই সঙ্গে আমরা বিশ্বের সকল মুক্তিকামী দেশ থেকে আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি, 'জয় বাংলা"।

এই ঘোষণা জনগণের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এর ফলে রাস্তায় মিছিলের পর মিছিল বেরোতে শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ জোরদার হয়ে ওঠে। কয়েকদিনের মধ্যে বেতার কেন্দ্রের ওপর বোমা বর্ষিত হয়।

ইতোমধ্যে শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং জহুরুল কাইয়ুমের আকুতি-মিনতি

অগ্রাহ্য করে পাক সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তারবরণ করেছেন। তার একমাত্র যুক্তি আমাকে না পেলে তারা ঢাকাকে ধুলায় মিলিয়ে দেবে। আমরা যখন প্রায়ই

বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন এই কথা বলে জনসাধারণের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করছি, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের একটি পত্রিকায় গ্রেপ্তারকৃত বঙ্গবন্ধুর ছবি ছাপিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে নেই। তাতে জনসাধারণের মধ্যে বেশ হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। ২৯ তারিখের মধ্যে পাকবাহিনী চট্টগ্রাম শহর দখল করে নেয়। সকল নেতৃবৃন্দ এম আর সিদ্দিকী, এম এ হান্নান, আবদুল্লাহ আল হারুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আর মল্লিক, আলী আহসান, জহুর আহমদ চৌধুরী সবাই গহিরা গ্রামের কুণ্ডেশ্বরী ভবনে আশ্রয় নিলেন। ওখানে অবস্থান করছিলেন কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকার এক সাংবাদিক। তাকে আগরতলা পাঠিয়ে সবাই যাতে আগরতলায় যেতে পারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার অনুমতি নেওয়া হলো। অনুমতি পাওয়ার পর সবাই রামগড়ের পথ ধরে ওপারে চলে গেলেন। আমি তখনো মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার পাঠানোর কাজে ব্যস্ত। আমার বাড়িতে তখন ছোট মামার পরিবারসহ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন মিলে প্রায় ৫০ জন আশ্রয় নিয়েছে। আবদুল্লাহ আল হারুন আওয়ামী লীগের একজন নেতা, আমার মামাতো ভাই। সে আমাকে কোনো খবর না দিয়ে ওপারে চলে গেলেন। আমার ভারি অভিমান হলো। আমি পরে সুযোগ পেয়েও আর ওপারে গেলাম না। সরকারের খাতায় বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে আমার নাম উঠেছিল ১৯৪২ সালে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। সেই খাতাটি পাকিস্তান আমলে বর্ধিত হতে হতে একাত্তর সালে বোধহয় কয়েকটি মহাকাব্যে পরিণত হয়েছিল।

দিনে দিনে শহরের অবস্থা অবনতির দিকে। রাস্তা-ঘাটে পাকবাহিনী অবস্থান নেওয়া শুরু করলে আমি ২৮ মার্চ শহরের বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে গ্রামে চলে যাই। ইতোমধ্যে পাকবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় আমার শহরের বাড়ি লুট করে। লোহার আলমারি ভেঙে আমার স্ত্রীর গয়নাপত্র এবং ঘরের মালামাল কয়েকটি সুটকেসে ভরে নিয়ে যায়। আমার দারোয়ানকে নৃশংসভাবে মারধর করে আমি কোথায় জানতে চায়। ঘরের দরজা জানালা ভেঙে বাড়িটি একটি পোড়ো বাড়িতে পরিণত করে । বাড়িতে অবস্থান করছিল আমার এক আত্মীয় বাবলু। তাকেসহ আমার গাড়িটিও লুট করে নিয়ে যায়। আমার সমৃদ্ধ লাইব্রেরি পাউডার ছড়িয়ে জ্বালিয়ে দেয়। তাতে আমার প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থ, চৌদ্দ বছরের রাজনৈতিক ডায়েরিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এভাবে একাত্তর সালে পাক হানাদার বাহিনী গোটাদেশকে একটি নরকপুরীতে পরিণত করে। তখন প্রায় ১ কোটির মতো লোক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি সুযোগ পেলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যাইনি।

বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে যখন পাক হানাদার বাহিনী আমাকে আমার ফটো সহকারে খুঁজছিল চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায়। তখন আমি আত্মগোপন অবস্থায় কুলশীতে এক বোনের বাড়িতে ছিলাম। আমি যাওয়ার পরেরদিন সেনাবাহিনী ওই বাড়ি ঘিরে ফেললো। সবাইকে ঘরের বাইরে এনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাল। আমিও দাড়ি, গোঁফ, ছেঁড়া লুঙ্গি ও জামা পরিহিত অবস্থায় সেই লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা প্রথমে জিজ্ঞেস করল—কিসকো ভোট দিয়া। সবাই বলল, মুসলিম লীগকো। তারপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে সবার শরীরে আঘাত করে বলল, আগার তুমলোক মুসলিম লীগমে ভোট দিয়া তো আওয়ামী লীগকো এতনা ভোট ক্যায়সে মিল। তারপর প্রশ্ন করল, হামলোগকো খবর মিলা ইদার এক মুক্তি হ্যায়। সবাই এর উত্তরে 'না' বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন সিপাহি ব্রাশফায়ার করতে উদ্যত হওয়ার ক্ষণকালের মধ্যেই এক বেলুচি মেজর এসে আমাদের রক্ষা করল। সে যেন এক অলৌকিক ঘটনা

আর শহরে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে আমার এক চাচাতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাসে করে কক্সবাজারের দিকে রওনা হলাম। বাসে আমরা প্রায় ২৫ জনের মতো যাত্রী ছিলাম। পথে পথে বাস আটকালো হানাদার বাহিনীর লোক। প্রথমে কালুরঘাটে বাসে উঠে দুজন যাত্রীকে সন্দেহজনক মনে করে বাস থেকে নামিয়ে নিলো এবং নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করল। এভাবে পটিয়া, দোহাজারী এবং অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় কখনো দুজন কখনো তিনজন যাত্রীকে নামিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

অবশেষে আমরা পৌঁছলাম আমিরাবাদে। যখন আমিরাবাদে পৌঁছলাম, তখন যাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৫ জনে । আমরা শুনতে পেলাম, দক্ষিণাঞ্চলে হানাদার বাহিনী অপারেশন চালাচ্ছে। তাই ড্রাইভার আর এগুতে চাইল না। আমি ও আমার চাচাতো ভাই বাস থেকে নেমে রাস্তার ধারে একটি চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। এমন সময় একজন বৃদ্ধ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি মাহবুব উল আলম চৌধুরী? আমি তাকে পাকিস্তানি চর মনে করে বললাম, না, আমি মাহবুব উল আলম চৌধুরী নই। আমার নাম আবদুর রহিম। তিনি বললেন, আমার নামও এখন আবদুল করিম। কিন্তু আমি ডা. সুখেন্দু দাশের বাবা। তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, গতকাল হানাদার বাহিনী আমাদের এলাকায় অপারেশন চালিয়ে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। আমার পরিবারে আমি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি বেবিট্যাক্সি ভাড়া করে চকোরিয়ার ইলিশিয়া গ্রামের দিকে রওনা হলাম। ইলিশিয়া পৌঁছে দেখলাম, রাস্তার ধারে একটি লোকসমাবেশ। সবাই প্রাণরক্ষার জন্য আল্লাহু আকবর এবং পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে। হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করছেন এবং স্থানীয় রাজাকারদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ছেন। ইলিশিয়া আমার আত্মীয় বাড়ি। তারা পেশায় জমিদার। আমাকে মূল বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে তাদের এক খামারবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা।

খামারবাড়িতে গিয়ে দেখলাম সেখানে অনেক পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে দেখলাম মাথায় গামছা বেঁধে বাঁশের টুকরি তৈরি করছেন। তিনি আমাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মাসখানেক পর আমাদের ওপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এলেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাদের সঙ্গে ওপারে পাড়ি দেওয়ার সময় পাহাড় অতিক্রম করতে গিয়ে মধ্যপথে প্রাণ ত্যাগ করলেন। আমিও ওপারে আর গেলাম না। অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ওই গ্রামে অবস্থান নিয়ে তাদের কাজে সহায়তা করতে লাগলাম। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমি ওখানেই ছিলাম।

ইথারে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেই টিক্কা খান গণহত্যার নির্দেশ দেন

মুসা সাদিক

২৫ মার্চের গণহত্যার রাতে বাংলার যে আইখম্যান জেনারেল টিক্কা খান ঢাকার বুকে ঘুমন্ত লাখ লাখ মানুষের ওপর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাজার হাজার পাকিস্তানি সেনাকে লেলিয়ে দিয়েছিল এবং শত শত কামান-বন্দুকের গোলা-বারুদের দলায় হাজার হাজার বাঙালির রক্ত-মাংস মিশিয়ে দিয়েছিল, ১৯৮৮ সালের ৩১ ডিসেম্বরে পাঞ্জাবের গভর্নর হাউসে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। সেই কুখ্যাত গণহত্যার নায়ক টিক্কা খানের সেই মহাহত্যাযজ্ঞের ওপর এদেশে কেউ বিষাদ সিন্ধু বা 'মেঘনাদবধ' বা ইলিয়ড-এর ন্যায় মহাকাব্য রচনা করেননি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ক্ষুদ্র দেশের রাজধানী ঢাকা নগরীর ওপর আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ২৫ মার্চের আঁধার রাতে নিষ্পাপ অসহায় লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত নর-নারী, শিশু-যুবক ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ওপর হাজার হাজার রক্তপিপাসু পাকিস্তানি হায়েনা যে হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা হিটলারের হায়েনা নাৎসি গেস্টাপোদের ৬০ লাখ ইহুদি হত্যার নৃশংসতাকেও হার মানায়। পাকিস্তানি জল্লাদ জেনারেলরা ঢাকায় ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যার কী ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিলেন এবং সেই রাতে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় কোনো পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তা জানার এক অপূর্ব সুযোগ আমার জীবনে আসে ১৯৮৮ সালে। আমি তখন রাষ্ট্রপতির ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে একটি প্রেস টিম নিয়ে ঢাকা থেকে করাচি লাহোর হয়ে ইসলামাবাদে গিয়েছিলাম। বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক দি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব উল আলম এবং তদানীন্তন ঢাকা টিভির জনপ্রিয় আইন-আদালত অনুষ্ঠানের পরিচালক রেজাউর রহমান উক্ত প্রেস টিমের সদস্য ছিলেন। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মানব ইতিহাসের বর্বরতম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের জল্লাদ টিক্কা খানকে বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিদের আসনে উপবিষ্ট দেখি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় কিভাবে তিনি

সেই নিষ্ঠুর গণহত্যা শুরু করেছিলেন সেই অজানা তথ্য উদঘাটনের লক্ষ্যে আমি তার সাক্ষাৎকার নিতে এগিয়ে যাই। জেনারেল টিক্কার সম্মতি মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ইসলামবাদের হোটেল 'হলিডে ইন' থেকে দুপুরের পর পরই আমি এবং এডভোকেট রেজাউর রহমান দু'জনে রওয়ানা হই। আমরা দু'জনে সন্ধ্যায় তার পাঞ্জাবের সরকারি 'গভর্নরের হাউসের' দোতলায় তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্যে উপস্থিত হই। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে টিক্কা খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গসহ অনেক বিষয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। আমি ইংরেজিতে প্রশ্ন করছিলাম এবং তিনি উর্দুতে উত্তর দিচ্ছিলেন। আমি ইতোপূর্বে আমাদের সাংবাদিক দলের করাচি সফরকালে পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টের সেক্রেটারি জেনারেল করাচি সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা হাবিব খান ঘোরি এবং পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক নিসার ওসমানীর সাথে আমার পূর্ব আলোচনার জের ধরে জেনারেল টিক্কা খানকে প্রশ্ন করলাম—মি. ঘোরি এবং মি. ওসমানী বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ '৭০-এ পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি অ্যাকশন সমর্থন করেনি। দুই দশক পর আপনি কি মনে করেন তা ন্যায় ছিল?

জেনারেল টিক্কা খানের উত্তর : একাত্তরের সংকটের জন্য কিছু লোক সেনাবাহিনীকে দায়ী করেছে, আবার কেউ কেউ দায়ী করেছে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। গোলাম আজম সাহেবসহ সাধারণ মানুষ এখনো মনে করেন না আমরা ভুল করেছি। ঠিক কবে আপনি ঢাকায় গণহত্যা শুরু করলেন—প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি কোনো গণহত্যা করাইনি। আমাদের টহলদার বাহিনীর ওপর গোলাবারুদ নিয়ে হামলা করার জন্য জগন্নাথ হলে কিছু অবাঞ্ছিত লোক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এরপর আমি জগন্নাথ হলে কিছু সৈন্য পাঠাই। এটা সত্য যে তাতে কিছু হিন্দু লোক মারা যায়। এরপর কিছু কিছু সংঘর্ষ হয়। তাতে আমাদেরও কিছু লোক মারা গেছে এবং মুক্তিবাহিনীর লোকও মরেছে। সেখানে দু'পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তাতো গণহত্যা নয়।

টিক্কার জ্বলজ্যান্ত মিথা জবাবে আমি ও রেজাউর রহমান বিস্মিত হই। কেননা, পাকিস্তানি আর্মি বাংলাদেশে লাখ লাখ লোক হত্যা করেছে যার শুরু জেনারেল টিক্কা করে গেছেন, তা কে না জানে? এ নিয়ে পাকিস্তানে কমিশন গঠিত হয়েছে এবং '৭১-এ এখানে জেনোসাইড ও রেপ করার সুনির্দিষ্ট কারণে উক্ত কমিশন পাকিস্তান আর্মির অনেককে কোর্ট মার্শাল করার জন্য সুপারিশ করে। যদিও তা কার্যকর হয়নি।

তাহলে তার বক্তব্য অনুযায়ী ২৫ মার্চ রাতে তিনি গণহত্যা করেননি, তাহলে তিনি ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কেন গ্রেফতার করলেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে টিক্কা বলেন : আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি ব্যান্ড রেডিও এনে বলল স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন। আমি নিজে রেডিওতে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম, কারণ, শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর আমি ভালো করেই চিনতাম। যে ঘোষণা তখন দেশদ্রোহিতার শামিল ছিল। সেক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প ছিল না। শেখ মুজিব যদি তাজউদ্দিনের সঙ্গে ভারত চলে যেতেন তাহলে তারা কী করতেন জানতে চাইলে তিনি বলেন : আমি ভালো করেই জানতাম শেখ মুজিবের মতো নেতা তার নিজের লোকদের ছেড়ে যাবেন না কোথাও। আমি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য ঢাকার সমস্ত জায়গায় প্রতিটি বাড়িঘরে এমনকি প্রতিটি কোণায় কোণায় তল্লাসি চালাতাম। তাজউদ্দিনের মতো অন্য কোনো নেতাদের আমার গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা ছিল না এজন্য তারা সবাই খুব সহজেই ঢাকার বাইরে চলে যেতে পেরেছিল।

হ্যাঁ, চেঙ্গিস খান, হালাকু খানের বংশধর টিক্কা খান দৃঢ় স্বরে '৭১-এর ২৫ মার্চ রাতের কথা বললেন যে, শেখ মুজিবকে সে রাতে না পাওয়া গেলে তিনি ও তার ফৌজ ঢাকার এবং বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কারবালার শোক বইয়ে দিতেন। শেখ মুজিবকে না পাওয়া গেলে হায়েনারা ২৫ মার্চের রাতে ঢাকার কোন ঘর, এমনকি ক্ষুদ্র কোনো কোণও তারা ছাড়তো না। বাংলাদেশের দীর্ঘ নয় মাসে তারা ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করে, কিন্তু শেখ মুজিবকে ২৫ মার্চ তাদের হাতের মুঠোয় না পেলে চেঙ্গিস খান-হালাকু খানের বংশধররা নয় মাসে নয়, শেখ মুজিবের জন্যে হন্যে হয়ে নয় দিনে কোটি লোক হত্যা করে দিতো। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার বুকে পানির ঢেউ থাকতো না, রক্তের ঢেউ জেগে উঠতো।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, বিশ্ববাসী সাক্ষী, সকল ঝড়-তুফান থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে রক্ষা করেছেন। ২৫ মার্চ তিনি গণহত্যাকারী টিক্কা খানের আক্রোশ ও ছোবল থেকে লাখ লাখ ঢাকাবাসী তথা দেশবাসীকে বাঁচানোর জন্য হিমালয়সম সাহস নিয়ে ৩২ নম্বর বাড়িতে অপেক্ষা করেছেন। কেউ জানতো না সে রাতে তাকে গ্রেফতার করা হবে, না হত্যা করা হবে? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আলোচনা চলাকালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনের ব্যাপারটিকেও টিক্কা খান সেনাবাহিনীর রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে উল্লেখ করেন। টিক্কা খান ২৫ মার্চের আর্মি

অ্যাকশন ও হত্যাযজ্ঞ—এধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ভারতের মদদ, কিছু চরমপন্থী ছাত্রনেতা, তাজউদ্দিন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু নেতাকে দায়ী করেন যারা শেখ মুজিবকে গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করে। যদিও ওইসব পশ্চিম পাকিস্তানিদের নাম উল্লেখ করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। মেজরিটি ভোটে নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে নেওয়া, জেলখানায় তার সেলের পাশে কবর খোঁড়া, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ—এভাবে তাকে হেয় করার অভিযোগ অস্বীকার করে টিক্কা খান বলেন, আমরা শেখ মুজিবকে হেয় করিনি । আমরা তাকে হত্যা করিনি, তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। টিক্কা খান নয় বাঙালিরাই তাকে মেরেছে।

২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানি মিলিটারির অ্যাকশন, গণহত্যা পাকিস্তানকে টুকরো করেছে এবং এর জন্য টিক্কা খান দায়ী—এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেনারেল টিক্কা খান তার তখনকার ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, দেশ ভাঙার জন্য আমি দায়ী নই। আমি আমানতের কোনো খেয়ানত করিনি। গভর্নর হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল সংবিধান ও দেশের ঐক্য অটুট রাখা। এটা না করলে গভর্নরের ইমপিচমেন্ট অথবা ফাঁসি হতে পারে। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। গভর্নর হিসেবে আমার আর কোনো অপশন ছিল না। '৭১-এ পাকিস্তানি আর্মি কর্তৃক ২ লাখ নারী ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনাকে টিক্কা খান অ্যাবসার্ড বলে অস্বীকার করেন। বলেন, টোটাল আর্মিই দুলাখ ছিল না। কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে বাবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাদের ক্যারিয়ার, এমনকি জিন্দেগিও বরবাদ করা হয়েছে। মিলিয়ন মিলিয়ন নিরপরাধ বেসামরিক মানুষ হত্যা করেছে পাকিস্তান বাহিনী। টিক্কা খান তা অস্বীকার করে বলেন, একাত্তরে কোনো গণহত্যা ঘটেনি। অ্যাকশনে উভয় তরফে হতাহত হয়েছে। তবে অপারেশনে কিছু সাধারণ মানুষ মারা যেতে পারে। এর জন্য দায়ী স্থানীয় নেতারা ও পিস কমিটি। তারা পাকিস্তানি আর্মিকে ব্যবহার করে জাতিগত বা ব্যক্তিগত শত্রুতা মিটিয়েছে। একাত্তরে গণহত্যা, ধর্ষণের দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচার দাবি করছেন বাংলাদেশের জনগণ। এই তালিকায় টিক্কা খানের নামও রয়েছে—একথা শুনে তিনি বলেন, আমার নাম যুদ্ধাপরাধী তালিকায় থাকবে কেন। আমি তো পূর্ব পাকিস্তানে মাইনে পাওয়া গভর্নর ছিলাম। পাকিস্তান ভেঙেছে বলে টিক্কা খানের আফসোস শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কেন আপনাদের সেনাবাহিনী ২ লাখ মা-বোনকে ধর্ষণ করল, হাজার হাজার সন্তান জন্ম দিলো, কিন্তু তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো?

মুক্তিযোদ্ধার তেজ নিয়ে উচ্চারিত আমার সেই নির্মম কঠোর সত্য প্রশ্নবাণের মুখে মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম রক্তপিপাসু ৩০ লক্ষ বাঙালির গণহত্যাকারী টিক্কা খানের হম্বি-তম্বি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল এবং তিনি বিধ্বস্ত অবস্থায় তার মাথা হেট করে ফেললেন। মনে হলো, তার পাপের ও অপরাধের ভারে বাঙালি জাতির সামনে তিনি তার মাথা নত করলেন। নরহত্যার পাপ থেকে নর হত্যাকারীরও যে মুক্তি নেই, ৩১ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের গভর্নর হাউসে ৩০ লাখ নর হত্যাকারী নরাধম টিক্কা খানের চেহারায় তা ফুটে উঠলো। টিক্কা অপরাধীর মতো নিরুত্তর মুখে তার ডানে-বামে ফালুক-ফুলুক করে তাকাতে লাগলেন। এসি ড্রইরুমে অকস্মাৎ তিনি ঘামতে লাগলেন এবং নিস্তেজ হয়ে পড়লেন । এ অবস্থা লক্ষ করে জেনারেল টিক্কার চেহারা গড়নের ছিপছিপে একান্ত সচিব সাক্ষাতকার শেষ হয়েছে বলে দিলেন। আমরা উঠে পড়লাম।

বাংলাদেশে ৩০ লাখ বাঙালি নর-নারী হত্যা ও দুলাখ মা-বোনের ইজ্জত হরণের বিশ্বধিকৃত জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল নিয়াজি, জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ হানাদার এক লাখ পাক সেনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে গণহত্যা, ধর্ষণ, গুম, নিপীড়ন, অগ্নিসংযোগ ও সম্পদ লুণ্ঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা জাতীয় স্বার্থে ও বিশ্ব মানবজাতির স্বার্থে অত্যাবশাক ও জরুরি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ন্যুরেমবার্গে হিটলার, গোয়েবলস প্রমুখ যুদ্ধাপরাধীদের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রায়ালের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা, বৃটেনসহ ইউরোপের জাতিসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্ধ-শতাব্দী পরেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কারণ, মানবজাতির অগ্রগতি ও বিকাশ তারা নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে বদ্ধপরিকর। যুদ্ধাপরাধীদের বিষাক্ত থাবা থেকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাকে তারা রক্ষা করতে চায় এবং স্বর্গ থেকে মর্তে আসা মানবজাতির অমৃত সুধা ভালোবাসার পুণ্যালোকে বিশ্ব মানবজাতিকে আলোকিত করে তুলতে চায়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বিশ্ব মানবজাতি সেই পুণ্যময় আলোকরশ্মিতে ঝলমল করে উঠবে। বাঙালি জাতির জীবনে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস সেই স্বর্গীয় আলোকরশ্মিতে ঝলমল করে ওঠা মানবজাতির এক হীরন্ময়-পুণ্যময় দিন।

ইতিহাস ঋজু, স্বচ্ছ

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

দেশের কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর (?) বুদ্ধি জিলাপির প্যাঁচের মতো। বুদ্ধির কোথায় শুরু, কোথায় শেষ—তা সাধারণের বোধগম্য হয় না। প্যাঁচালোদের কেউ রাজনীতি করে, আবার কেউবা রাজনীতির পরজীবী। এ জিলাপি আঁতেলরা একেকজন একেক ঘরানার। কিন্তু নিজেদের মধ্যে একধরনের একাত্মতা রয়েছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলেই মাত্র বিভেদের চির প্রকাশ পায়। স্বার্থ-সংঘাতের কারণেই সাকা চৌধুরী বলে ফেলেছিলেন রাজনীতির এক হলুদ চরিত্রের কথা। হলুদ এমন এক মশলা, যা সব রান্নাতেই লাগে। চিকেন, গরু, খাসি, বড় মাছ, ছোট মাছ, শাকসবজি, তরিকতকারি, ডাল, খিচুড়ি—সব রান্নাতেই হলুদ আবশ্যকীয় উপাদান। হলুদের দোষ দিয়ে লাভ কি? সব রান্নাই হলুদকে সাদরে গ্রহণ করে। রাজনীতির এ হলুদ হলেন ব্যারিস্টার মওদুদ। দেশের স্বাধীনতার পর অপরাধের দায়ে জেলে ছিলেন। শ্বশুর-ভাগ্য তার ভালো। তার শ্বশুর ছিলেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন। কবি গিয়ে ধরলেন বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির কবি ছিলেন। সাহিতের কবিদের বড়ই সম্মান করতেন তিনি। বিশেষ করে পল্লীকবির প্রতি শ্রদ্ধাবশত বঙ্গবন্ধু কবি জামাতাকে মুক্ত করে দিলেন। পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক পাঁচমিশেলি রান্নার সময় হলুদ দরকার হলো। পাওয়াও গেল। বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিকভাবে উৎখাত করার জন্য যে দল গঠিত হলো, মওদুদ সাহেব সে দলের মধ্যমণি হলেন। জিয়া সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী হলেন। জেনারেল জিয়ার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। অল্পদিনেই তিনি চিনে ফেললেন। হঠাৎ একদিন বের করে দিলেন মন্ত্রিসভা থেকে, দল থেকেও। তাতে কি। রাজনৈতিক ভেজিটেবল তো আবারও রান্না হবে। তখন হলুদ লাগবেই। এ মশলা তো বাদ দেয়ার উপায় নেই। বেশি দেরি হলো না। জেনারেল জিয়া নির্মমভাবে নিহত হলেন চট্টগ্রামে। তারই পছন্দ করা সেনাধ্যক্ষ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করল। ওস্তাদের পদাংক অনুসরণ করে রাজনৈতিক দল বানালেন। হলুদ লাগবে। হাতের কাছেই পাওয়া গেল। এরশাদের দলে হলুদ মশলা হয়ে মিশে গেলেন মওদুদ। মন্ত্রী হলেন।

প্রধানমন্ত্রী হলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, মন্ত্রী থাকাকালে ছিলেন শিল্পমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হলেও শিল্পমন্ত্রীই রইলেন। এমনকি ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেই রইলেন। এ অনন্য রাজনৈতিক-শিল্প শিল্প ত্যাগ করতে রাজি নন। রাজনীতির ডিশ যেমন হলুদের মাজেজা বোঝে, তেমনি তিনিও শিল্প মন্ত্রণালয় আর শিল্পপতিদের সংসর্গের আস্বাদ পেয়েছিলেন। আরও ওস্তাদি দেখিয়েছেন তিনি। এরশাদ গণআন্দোলনে পড়ে গেলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। ক্ষমতা গেল। তাতে কি। হলুদত্ব তো যায়নি। তখন বিএনপির হাল ধরেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। খালেদা জিয়া বড় শত্রু মনে করতেন জেনারেল এরশাদকে। তাকে জেলে পুরলেন। মামলা দিলেন। কিন্তু জেনারেল এরশাদের নিকটতম রাজনৈতিক সহচর মওদুদ সাহেব বেঁচে গেলেন। শুধু বেঁচেই ও গেলেন না হলুদ মশলা হয়ে নতুন করে রান্না করা বিএনপির ফিক্সড ভেজিটেবল দলে মিশে গেলেন। আবার মন্ত্রী হলেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি হেরে গেল। ব্যারিস্টার সাহেবও নিজ আসনে হেরে গেলেন। তাতে কি। হলুদ গুণে গুণান্বিত ফ্লেক্সিবল ব্যক্তিটি নোয়াখালী ছেড়ে ম্যাডামের পরিত্যক্ত বগুড়ার আসনটি বাগিয়ে নিলেন। দক্ষতার এখানেই শেষ নয়। সংসদে ম্যাডামের পাশে বসার ব্যবস্থাও পাকাপাকি হয়ে রয়েছে। ব্যারিস্টার সাহেবের এ অদ্বিতীয় দক্ষতার কাছে হার মানার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সাকা চৌধুরী মওদুদ সাহেবের বহুরূপী চরিত্রের কথা বলে ফেলেছেন। সাকা চৌধুরী ক্রুদ্ধ হলেও মওদুদ সাহেব রাগ দেখাননি। মুচকি হেসে হজম করে ফেলেছেন।

সর্পিল চরিত্রের মানুষরা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে চলে যায়। ইতিহাসে স্থান পায় না। কারণ ইতিহাস ঋজু, স্বচ্ছ। তবু সর্পিল বুদ্ধিজীবীরা (?) ইতিহাসের কথা উচ্চারণ করে। হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধু, মেজর জিয়া নহেন।' কিছু সর্পিল আঁতেল নড়েচড়ে উঠেছে। শুধু ইতিহাসকেই নয়, বিচারালয়কেও দংশন করতে চাচ্ছে। আঁতেলদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্যও রয়েছেন।

একজন বলেছেন এটা ইতিহাসের বিষয়, হাইকোর্টের এখতিয়ারবহির্ভূত। বিষয়টি অবশ্য ইতিহাসের। বঙ্গবন্ধু তো ইতিহাসেরই এক মহানায়ক। কিন্তু হাইকোর্ট তো ইতিহাস দেখেননি। ইতিহাস লিখবেন ঐতিহাসিকরা। তারা লিখেছেন। এখনও লিখছেন, ভবিষ্যতেও লিখবেন। হাইকোর্ট সংবিধানের বিশ্লেষক, আইনের ভিত্তিতে রায় প্রদান তার দায়িত্ব। এ এখতিয়ার হাইকোর্টের, ঐতিহাসিকের নয়। সাংবাদিকের নয়। রাজনীতিকের নয়। বুদ্ধিজীবীদের নয়।

হাইকোর্ট তার আইনি দায়িত্বই পালন করেছেন মাত্র। এতটুকু সীমা অতিক্রম করেননি।

সরকার আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সরকার আইনের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ কাজ করতে পারে না। রাজনৈতিক মিথ্যা প্রচারণা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। সরকারি প্রকাশনায় যেহেতু মিথ্যা তথ্য সংযোজিত হয়েছিল, সেহেতু একজন সংক্ষুব্ধ নাগরিক হাইকোর্টে মামলা করলেন। হাইকোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। বাংলাদেশ সংবিধানের উৎস হলো মুজিবনগর ঘোষণা। ওই ঘোষণাবলেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। সেই মুজিবনগর ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবেই লিখিত রয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রায় সব আসনে জয়ী সাংসদদের অবিসংবাদিত ও আইনসম্মত নেতা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই ছিল মুজিবনগর সরকারের ঘোষণার ভিত্তি। স্বাধীনতা ঘোষণার ডকুমেন্ট বাংলাদেশ সংবিধানের শুধু ভিত্তিই নয়, অংশও। এ গেল আইনের কথা।

আইনের আরেকটি বিষয় আছে, যাকে বলা হয় সার্কামাস্ট্যানসিল এভিডেন্স বা পরিস্থিতিগত প্রমাণ। একাত্তরের পরিস্থিতিগত প্রমাণের মধ্যে দেখা যায়—ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস সিচুয়েশন রুম ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্থানীয় সময় ৩টা ৫৫ মিনিটে প্রচার করে যে, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন খ. রেডিও পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রকাশ করেছিল যে, স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা, বাংলাদেশের সংবিধান এবং পরিস্থিতিগত এভিডেন্স—এসব কিছুই প্রমাণ করছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই আইনের ভিত্তিতেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষক। হাইকোর্ট আইনের বিশ্লেষক হিসেবেই রায় দিয়েছেন। এটি হাইকোর্টের জুরিসডিকশনস, মৌলিক ক্ষমতার প্রয়োগ ও বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন। তবে হ্যাঁ, কখনও কখনও কোনো কোনো ঘটনা ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। সে অর্থে হাইকোর্টের এ রায়টি হয়তো ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। কারণ এ রায়ের মাধ্যমে একটি মিথ্যাচার আইনগতভাবে প্রত্যাখ্যাত হলো। একটি মিথ্যার প্রাসাদ ধসে পড়ল। মিথ্যাচারটি মিথ্যাচার হিসেবেই ইতিহাসে লেখা হবে। সত্যকে সত্য হিসেবেই ধারণ করবে ইতিহাস। কারণ ইতিহাস ঋজু। ইতিহাস স্বচ্ছ।

ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা এবং ইতিহাস কর্তৃক মিথ্যাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়ার ঘটনা বর্ণিত রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। সর্বকালে। সর্বস্থানে। সর্ববিষয়ে। তেমনই একটি বিকৃতি ও সত্য উদঘাটনের ঘটনার উল্লেখ করছি ইতিহাসের পাতা থেকে।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর (রা.) মৃত্যুর পর দুরাত্মা এজিদ ক্ষমতা ছিনতাই করল। আগের রেওয়াজ মোতাবেক খলিফা নির্বাচন না করে, এজিদ নিজেকে খলিফা ঘোষণা করল এবং হজরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.) পুত্র হজরত ইমাম হোসেনকে (রা.) সপরিবারে হত্যা করল (যা আমাদের দেশের ১৫ আগস্টের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়)। খেলাফত রক্ষার নামে নবীজীর বংশধর হত্যার ঘটনাটিই সম্ভবত ইসলাম ধর্মের নামে রাজনীতি চর্চার প্রথম উদাহরণ। শত্রু নিধনের পরও এজিদ সংশয়মুক্ত হতে পারল না। সে দেখল যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক উক্তি (যা হাদিস নামে পরিচিত) তার কাজকর্মের বিপক্ষে যায় এবং তার ছিয়াছত বা রাজনীতির সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ। যে দুরাত্মা নবীজীর (সা.) বংশধর হত্যা করতে পারে, তার পক্ষে নবীজীর (সা.) আদর্শ এবং বাণী হত্যা করা তো সহজ কাজ। এজিদ সে যুগের কিছু আলেম ভাড়া করল হাদিস পুনর্লিখনের জন্য। এ যুগে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বড় বড় বুদ্ধিজীবী পাওয়া যায় ইতিহাসকে পাতিহাঁস বানানোর প্রকল্পে, তেমনি সে যুগেও জাঁদরেল আলেমদের (বুদ্ধিজীবী? ধর্মজীবী?) পাওয়া যেতো রাজকীয় আনুকূল্যের বিনিময়ে। ওইসব ভাড়াটিয়া আলেম মিলে কিছু কিছু হাদিস রদ করল, যেগুলো এজিদের কাজকর্মের বিপক্ষে যায়। রদ করা হাদিস প্রচার করা, শিক্ষা দেয়া বা বর্ণনা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। আলেমদের ইতিহাস বিকৃতির শুরু এভাবে। নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল দীর্ঘদিন। অনেককাল পর আব্বাসীয়রা খেলাফতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে, আবার আলেমরা বিষয়টিতে মনোযোগ দিলেন। তারা নানারকম তসদিক প্রমাণ সাপেক্ষে সঠিক হাদিস পুনরুদ্ধার করলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেও শতভাগ প্রমাণ না পাওয়ার ফলে কিছু হাদিস আজও জায়িপ বা দুর্বল হাদিস হিসেবে রয়ে গেছে। বোখারি মুসলিমসহ ছয়জনের হাদিসে তখন ঐকমত্য হয়েছিল, যা আজও বর্তমান। এ ঘটনা প্রমাণ করছে, ইতিহাস মাঝে মাঝে দুরাচার ক্ষমতাধরদের দাপটে বিকৃতি বহন করে। কিন্তু তা স্বল্পকালীন। ইতিহাসের অমোঘ শক্তি অচিরেই বিকৃতিকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। ইতিহাস বিকৃতির দায়মুক্ত হয়ে সত্যকেই ধারণ করে। কারণ ইতিহাস ঋজু। ইতিহাস স্বচ্ছ।

স্বাধীনতার ঘোষণা, হাইকোর্টের রায় ও বিতর্ক

এ এম এম শওকত আলী

অবশেষে স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়ে চূড়ান্ত রায় হাইকোর্ট প্রদান করেছে। কিন্তু রায়ের বিষয়ে বিতর্ক অব্যাহত রযেছে। প্রধান বিরোধী দলরে অনুসারীরা এ রায় স্বভাবতই গ্রহণ করতে পারেনি। এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক প্রয়াত জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় কখনও হয়নি। তিনিও এটা কখনও দাবি করেননি। বিতর্কের সূত্রপাত হয় ২০০৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। ওই সময় ১৫ খণ্ড সম্বলিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নব্য সৃষ্ট মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশ করে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধির বিষয়ে সরকারি কার্য সম্পাদন বিধি অনুযায়ী সব ধরনের সরকারি প্রকাশনা তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্তির স্পষ্ট অনুশাসন সত্ত্বেও উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন এই ইতিহাস রচনা করে। তখন থেকেই শুরু হয় বিপত্তি।

ওই সময় হাইকোর্ট ডিভিশনে সংযুক্ত বাদী হিসেবে হাক্কানী প্রকাশনা একটি রিট মামলা করে। এতে দাবি করা হয়; (এক) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা শুরু হয় ১৯৮২ সালে এবং (দুই) এ প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী হাক্কানী প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নয়।

ঐতিহাসিক তথ্য, যা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তা রদবদলযোগ্য নয়। এ তথ্যের ব্যাখ্যা এক-একজন এক-একভাবে দিয়ে থাকেন, তবে তথ্যের রদবদল হয় না। কারণ সত্যকে মিথ্যায় রূপান্তরিত করা গবেষকদের কাজ নয়। এটা করার চেষ্টা করলেই ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। জুলাই ২০০৪ সালে সৃষ্ট বিতর্কের প্রেক্ষিতে সংবাদ মাধ্যমে যে তথ্য বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, দেশের সকল সচেতন নাগরিক বিশেষ করে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানেন, তাঁরা নব্য প্রকাশিত ইতিহাসের বিরোধিতা করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধান রচনার সাথে যুক্ত একজন বিশিষ্ট নাগরিকের ১১ জুলাই (২০০৪) তারিখে এ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত মতামত একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাই সংবিধানের ভিত্তি। ২০০৪ সালের ক্ষমতাসীন সরকারের একজন সিনিয়র

মন্ত্রী এ দাবি করেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণার মূল একটি কপি তার হেফাজতে রয়েছে এবং এ কপিতে ২৬ মার্চের ঘোষণার কোনো উল্লেখ নেই। এটা ছিল সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যা আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রদান করা হয় তা আমাদের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আজও বিদ্যমান। এ আনুষ্ঠানিকপত্রে ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল ও ইয়াহিয়া সরকারের ১৯৭১-এর হত্যাযজ্ঞসহ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণাসহ কোনো সামরিক সরকার বা পরবর্তীতে অন্যকোনো সরকারই সংবিধানের অনেক কিছু মৌলিক রদবদল করলেও স্বাধীনতার ঘোষণার রদবদল করার কথা চিন্তাও করেনি। কারণ, যথার্থই বলা হয়েছে এ ঘোষণাই সংবিধানের মূল ভিত্তি। এরই ধারাবাহিকতায় সব ধরনের সরকার এ পর্যন্ত কাজ করেছে। এ ঘোষণাকে অস্বীকার করার অর্থ স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। ওই একই সাবেক মন্ত্রী, বর্তমানে সাংসদ, এখন পর্যন্ত নিজস্ব মতের কোনো পরিবর্তন করতে আগ্রহী নন। তিনি এখনও মিডিয়ার মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, ২৭ মার্চ প্রয়াত জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ঘোষণা কি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ২৬ মার্চের ঘোষণাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে? এ ঘোষণাই কি ২৬ মার্চ ও ২৭ মার্চের ঘোষণাকে অস্বীকার করতে পারে? ৭ই মার্চের সংক্ষিপ্ত ভাষণেও স্বাধীনতার কথা ছিল। ৭ই মার্চেও সব বাঙালির একটি কথাই বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল; "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।" সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল এ বাক্যকে কি অস্বীকার করা সম্ভব?

সাবেক সচিব প্রয়াত বোরহান উদ্দিন আহমদ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামরিক রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। বইটির শিরোনাম ছিল : "দ্য জেনারেলস অব পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ"। এ বইটিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ প্রকাশিত লন্ডনের টাইমস ও গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রাসঙ্গিক তথ্য। এ তথ্যে বলা হয় যে, "বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বীরত্বের সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নগ্ন হস্তক্ষেপের সময়োচিত জবাব দেয়ার জন্য সবাইকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। তার এ আদেশ যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট পালন করবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।" এছাড়া আরও বলা হয় যে, "গ্রেপ্তার হওয়ার কিছু পূর্বেই তিনি বাংলার জনমানুষের উদ্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন।"

তিনি বলেন যে, "তোমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। আজ পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা গণহত্যাযজ্ঞে লিপ্ত। আমাদের সংগ্রাম ফলপ্রসূ হবেই।

আমাদের বিজয় নিশ্চিত। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। বিশ্বের জনমত আমাদের পক্ষে।" বাংলাদেশের কোন কোন ক্ষমতাসীন সরকারকে অস্বীকারের রাজনীতিদুষ্ট হিসেবে দেশি-বিদেশি পত্রপত্রিকা আখ্যায়িত করলেও এ মৌলিক ঐতিহাসিক ও সাংবিধানিক সত্যকে অস্বীকার কেউ করেনি। বর্তমানে রায়সৃষ্ট বিতর্কের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো, এ রচনার সাথে তথ্যের নির্ভুলতার বিষয়ে যুক্ত ওই সময়ে সৃষ্ট কমিটি। আলোচ্য ইতিহাসে প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ওই কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য এর প্রতিবাদ করেন। হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরেও তিনি তাই করেছেন। ২০০৪ সালেও এ প্রকাশনার বিষয়ে তথ্যকে বিকৃত করার বিষয়ে ইতোপূর্বে প্রথম সংস্করণের সাথে যুক্ত অধিকাংশ গবেষকও তখন এর প্রতিবাদ করেছিলেন। বর্তমানে প্রধান বিরোধী দলের একজন সাংসদ মত দিয়েছেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি রাজনৈতিক। এতে হাইকোর্ট অনুপ্রবেশ করবে কেন? এর উত্তর হলো ; (এক) হাইকোর্ট স্বেচ্ছায় এ রায় প্রদান করেনি; বরং একটি মামলার নিষ্পত্তি করেছে যা করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার হাইকোর্টের রয়েছে এবং (দুই) এটা রাজনৈতিক বিষয়ই নয়; বরং সংবিধানস্বীকৃত বিষয় এবং সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্যই হাইকোর্ট এ রায় দিয়েছে। এটাও হাইকোর্টের একটি পবিত্র দায়িত্ব। একটি ঐতিহাসিক ও সাংবিধান স্বীকৃত সত্যকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সকল ধরনের নির্বাহী বিভাগের ওপরও বর্তায়। কোন নির্বাহী বিভাগ নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যদি একটি সাংবিধানিক অংশে বিকৃত ইতিহাস রচনার মাধ্যমে জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে তখন কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুবিচারের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে হাইকোর্ট নিশ্চয়ই সংবিধান, আইন ও প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে।

বাক-স্বাধীনতার অধিকার আমাদের সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকার। রাজনীতিবিদরা কথায় কথায় একে অপরের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রায়শই করে থাকেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এ স্বাধীনতা ব্যবহার করে কি তারা প্রকৃতভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করছেন না?

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ আপীল বিভাগের চূড়ান্ত রায়ের জন্য আগ্রহী হলেও তারা সাংবিধানিক অংশকেই সবসময় সমর্থন দেবে। অন্যদিকে যে কোনো সরকার সংবিধানের মৌলিক অংশের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, অতীতে হাইকোর্টসহ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগও এ ধরনের সিদ্ধান্তকে বেআইনি বা আইনসম্মত নয় বলে ঘোষণা দিয়ে সে সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। এমন কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের বিষয় কারও অজানা নেই। সুতরাং যে সমস্ত যুক্তি সম্প্রতি প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে তা অসার বই আর কিছুই নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

ড. আবদুল মতিন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে কিছুদিন ধরে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বেও সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের মাঝে এই বিষয়ে একটি উত্তপ্ত বিতর্ক এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ওয়াকআউট হয়ে গেলো। এই বিতর্কের জন্ম হয়েছে ১৯৯১ সালে একটি বিশেষ দল ক্ষমতায় আসার পর থেকে । দীর্ঘ বিশ বছর এই বিতর্ক কেন সুপ্ত ছিল তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই বিতর্ক কেন শুরু হলো এবং এই বিতর্কের কোনো হেতু বা ভিত্তি আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করতে হলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পূর্বের ঘটনাবলি এবং এককভাবে ঘোষিত স্বাধীনতা (Unilateral declaration of independence) কোন কোন প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করে তা পর্যালোচনা করা অপরিহার্য।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব বাংলা (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ) পাকিস্তানি শাসকদের হাতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয় এবং পূর্ববাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদির উন্মেষ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের ভেতর সেই পূর্বাভাস বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের ভেতর ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে

আবির্ভূত হন। এই বিজয়ের পর তাকে বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে।

বিপুল ভোটে এই বিজয়ের পরও পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন এবং ১৯৭১ সালে ১ মার্চ তারিখে পূর্বনির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। প্রথমে হরতাল এবং পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে রমনা রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী) ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে এবং যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন। সমগ্র জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ভাষণ শুনলো এবং সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হলো। ৭ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের সব অফিস-আদালত ও কলকারখানা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে শুরু করে। কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন বাংলাদেশের ডিফ্যাক্টো শাসক।

যতোই দিন এগুচ্ছে, বাঙালিরা ততোই উত্তাল হতে শুরু করল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারা বাংলাদেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো। ঘরে ঘরে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে শুরু করল। অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আসলেন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপের জন্য। কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোনো সদিচ্ছা ইয়াহিয়া খানের ছিল না। আলাপের ছলে কালক্ষেপণ করে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের শক্তি বৃদ্ধি ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁর অবস্থানে অনড়। আলাপে কোনো অগ্রগতি হলো না। এই অবস্থায় হঠাৎ গোপনে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করলেন। তারই নির্দেশে ২৫ মার্চের কালো রাত্রে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, ইপিআর সদর দপ্তর এবং রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ করল। শুরু হলো নির্বিচারে গণহত্যা।

সেই রাত্রে অর্থাৎ ২৬ মার্চ তারিখের প্রথম প্রহরে পাক বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তারের পূর্ব মুহূর্তে জাতির জনক এবং বাঙালি জাতির একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

বঙ্গবন্ধুর উক্ত স্বাধীনতা ঘোষণাটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো—

Today Bangladesh is a sovereign & independent country. On Thursday might. West Pakistani armed forces suddenly attacked the police barracks at Rajarbagh and the EPR head quarters at pilkhana in Dhaka. Many innocent and unarmed have been killed in Dhaka city and other places of Bangladesh. Violent clashes between EPR and police on the one hand and the armed forces of Pakistan on the other are going on. The Bengalis are fighting. The enemy with great coverage for an independent Bangladesh. May Allah help us in our fight for freedom. Joy Bangla.

আজ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী হঠাৎ রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক এবং পিলখানার ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করেছে। ঢাকায় এবং রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক এবং পিলখানার ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করেছে। ঢাকায় এবং বাংলাদেশের অন্য জায়গায় বহু নির্দোষ এবং নিরস্ত্র লোকজন নিহত হয়েছে। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে। বাঙালিরা বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর বিরদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করছে। আল্লাহ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায় হোন। জয় বাংলা।

এই ঘোষণাটি বেতার বার্তা (Wireless Message) হিসেবে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান মার্চ মাসের ২৬ তারিখে এই ঘোষণা বেতার এবং লাউড স্পিকারে চট্টগ্রামে প্রচার করেন। কিন্তু বেতারের প্রচারশক্তি সীমিত থাকায় এই ঘোষণা বেশিদূর শোনা যায়নি। তবে বিদেশি বেতার এবং পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। মার্চ মাসের ২৭ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম নিম্নলিখিত ঘোষণাটি পাঠ করেন : This is shadhin Betar kendra l Magor Ziaur Rahman, at the direction of Bongobandhu Sheikh Mujibur Rahman, have by declare that the independent peoples Republic of Bangladesh has been established. At his direction. I have taken command as the temporary head of the Republic In the name of Sheikh Mujibur Rahman. I call upon all Bangalis to rise against the attack by the West Pakistani Army. We shall fight to the last to free our Mother land. By the grace of Allah, victory is ours. Joy Bangla.

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমি মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ঘোষণা করছি যে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার নির্দেশে আমি এই প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আমি সকল বাঙালিকে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান করছি।

আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করবো। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের জয় নিশ্চিত। জয় বাংলা।

জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণা বেতার কেন্দ্রের আশপাশে অনেকেই শুনতে পান এবং বিদেশি বেতার মাধ্যমে এই ঘোষণাটিও ব্যাপক প্রচার লাভ করে। তার পরবর্তী ঘোষণায় সঙ্গত কারণে At his direction, I have taken command as the temporary head of the Republic কথাটি বাদ দেয়া হয় এই ঘটনার বিশ বছর পর একটি দল ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করছে। বলা বাহুল্য জিয়াউর রহমান জীবিতকালে নিজে কখনো এই দাবি উত্থাপন করেননি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল এককভাবে ঘোষিত স্বাধীনতা। পাকিস্তান-ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল স্বতন্ত্র। ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন তারিখে ভারত বিভাগের ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদনের পর Indian Independence অর্থাৎ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই তারিখে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করে। অতঃপর ওই বছর ১৪ এবং ১৫ আগস্ট তারিখে যথাক্রমে পাকিস্তান এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তানের মতো এশিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ঔপনিবেশিক দেশ (কলোনি) সমঝোতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে এবারে অন্যান্য দেশের একক স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মূল্যায়ন করা যাক

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ১৭৭৬ সালে ২ জুলাই তারিখে ব্রিটিশ শাসন থেকে আলাদা হয়ে এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দুদিন পর অর্থাৎ ৪ জুলাই তারিখে টমাস জেফারসন প্রণীত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসে অনুমোদন লাভ করে। ৪ জুলাই তারিখে যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস পালন করে যদিও ওয়াশিংটনের জাতীয় আর্কাইভে সংরক্ষিত স্বাধীনতা

ঘোষণাপত্রটি কংগ্রেসম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় ১৯ জুলাই তারিখে এবং পরবর্তী কয়েকদিনে।

ডাচ কলোনি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণাটি জাতীয়তাবাদী নেতা সুকর্ণ এবং মোহাম্মদ হাত্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে ঘোষিত হয়। হল্যান্ড দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেয়। সুকর্ণ এবং হাত্তা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

একটি গণভোটের পর আইসল্যান্ড ১৯৪৪ সালের ১৭ জুন তারিখে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ডেনমার্ক তখন নাৎসি জার্মানির অধীনে ছিল এবং এই স্বাধীনতা ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে ঘোষণাটি পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দান করে। ইয়ান স্মিথ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৬৫ সালের ১১ নভেম্বর রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বলাবাহুল্য এই সংখ্যালঘু সরকার কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের বিরোধী ছিল। এই কারণে ব্রিটিশ সরকার, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘ এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮০ সালে রোডেশিয়া জিম্বাবুয়ে নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

রোডেশিয়ার মতো পৃথিবীর অনেক দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ফিলিপিন্সে ১৮৯৮ সালে স্পেনের কলোনি থাকা অবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। স্পেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। স্পেন অথবা যুক্তরাষ্ট্র কেউই এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেয়নি। ৪৮ বছর পর ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই ফিলিপিন্স স্বাধীনতা লাভ করে।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো দেশের স্বাধীনতা এককভাবে ঘোষণা করলেই সেই ঘোষণা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয় না। স্বীকৃত ঘোষণাবলির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলেই এর কারণগুলো উদঘাটিত হবে। প্রথমত দেখা যায় যে, স্বাধীনতার ঘোষণা কোনো নির্বাচিত সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে। অথবা গ্রহণযোগ্য কোনো গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হয়। বলা বাহুল্য সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই রীতি অনুযায়ী স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব সংসদে পেশ করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা এবং যুক্তিগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং সেগুলো গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কোনো দেশের কোনো অনির্বাচিত ব্যক্তি বা সামরিক কর্মকর্তা ড্রামে দাঁড়িয়ে বা রেডিও কিংবা টেলিভিশনে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে একটি ঘোষণা পাঠ করে কোনো দেশকে স্বাধীন করেছেন, এমন কোনো দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং প্রতিনিধি। বঙ্গবন্ধু হঠাৎ করে নেতা সাজেননি। কেউ সাজতে পারে না। অনেক ত্যাগ এবং সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি ধাপে ধাপে বাঙালির মন জয় করেছিলেন। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছাত্ররাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে, '৬৯-এর গণআন্দোলনে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের বিজয়ে এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরই ছিল। এমতাবস্থায় অন্য কারো ঘোষণা দেশে-বিদেশে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতো না। এই সত্যটি জানা ছিল বলেই মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রচার করেছিলেন এবং একমাত্র এই কারণেই সেই বাণী সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।

মেজর জিয়া যদি বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ না করে এককভাবে নিজ নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন তবে কি হতো? প্রথমত মেজর জিয়াউর রহমান জনগণের কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সামরিক কর্মকর্তা। তাই এই ঘোষণা বহির্বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা পেতো না। দ্বিতীয়: শত্রুপক্ষ পাকিস্তান, মেজর জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণাকে একটি সামরিক বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যা দিতো এবং বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেতো। সামরিক বিদ্রোহকে পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে অভিহিত করে বহির্বিশ্ব এই ঘোষণাকে আমলে নিতো না। ফলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনগণের নির্বাচিত নেতা এবং প্রতিনিধি। তার ঘোষণা ছিল সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা। তাই আমাদের সংবিধানে ২৬ মার্চের এই ঘোষণার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ঘোষণার কোনো উল্লেখ আমাদের সংবিধানে নেই। থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

অন্যকোনো স্বাধীন দেশে আর একজন আছেন কি যিনি স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে সমাদৃত? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাব রীতি অনুসারে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই উত্থাপিত করে থাকেন। এই অধিকার তার একার। অন্য কেউ এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি।

টমাস জেফারসন ঘোষণাটির প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জন হ্যানকক ঘোষণাটি স্বাক্ষর করেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই নেতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। তাই বলে কি টমাস জেফারসন কিংবা জন হ্যানককে যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়? ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তাই বলে কি তিনি পাক-ভারতে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে পরিচিত কিংবা সমাদৃত? তিনি কি মহাত্মা গান্ধী কিংবা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমতুল্য? রাশিয়ার লেনিন, চীনে মাও সে তুং এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসনম্যান্ডেলার সমতুল্য কেউ আছে কি? বাংলাদেশে কেনই বা থাকবে? কোনো দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এখানে অপরিহার্য। এটা কোনো রূপ কথা নয় বা নাটক নয়। এখানে কোনো খলনায়কের ভূমিকা থাকতে পারে না। মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন এই দাবি ঐতিহাসিক পটভূমিতে অবাস্তব এবং অগ্রহণযোগ্য। যারা এই দাবি করেন তারা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করেন না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নামে একটি বাণী পাঠককে বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড় করাবার অপচেষ্টা বাণী পাঠককে মহিমান্বিত করবে না; বরং পাঠক হিসেবে প্রাপ্য সম্মান থেকেও তাকে বঞ্চিত করবে। বাংলাদেশের জন্মের ৩৮ বছর পর এই বিতর্ক অনাকাঙ্ক্ষিত। এই বিতর্কের আশু অবসান হোক, এটাই সকলের কাম্য।

ঘোষক বিতর্কের সমাধান

মাওলানা হোসেন আলী

হাইকোর্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে দায়ের করা রিট আবেদনের মীমাংসায় একটি রায় দিয়েছেন। রায়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে যে দাবি করে আসা হচ্ছিল, হাইকোর্ট তা বাতিল করে দিয়েছেন। হাইকোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হলে সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেননি। পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের শুনানিতে কী হবে, তা আমরা জানিনা। সে ব্যাপারে কোনো কথাও বলতে চাই না। এ প্রসঙ্গে শুধু একটি কথা বলে রাখতে চাই, 'স্বাধীনতার ঘোষক' বিতর্কের সমাধানটা কেবল বিচারিক আদালতের বিষয় নয়, এটা জনতার আদালতের বিষয়, জাতির বিবেকের বিষয়। স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কটা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঘুণাক্ষরেও আসেনি, এর অব্যবহিত পরও আসেনি। এটা এসেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্য অনুঘটক এবং এর বেনিফিশিয়ারিদের কাছ থেকে এ বিতর্কটা এসেছে। এটা এসেছে জাতির এক চরম দুর্দিন জাতিকে বিপথগামী করার অশুভ প্রক্রিয়া হিসেবে। সুতরাং বিতর্কের মীমাংসা সেদিনই হবে যেদিন জাতি তার গৌরবের ঠিকানা ও নিজের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পাবে।

হাইকোর্ট এমন একটা রায় দেয়ার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে যে, উচ্চ আদালত এতোদিনে একটা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর ফলে দেশবাসীর মধ্যে হয়তো ঐকমত্যের ভিত জোরালো হবে, ইতিহাস বিকৃতি ও মিথ্যাচারের নৈতিক পরাজয়ের মাধ্যমে হয়তো বিতর্কের মীমাংসা ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষের দিক থেকে বিষয়টি নিয়ে আরেকটি নতুন ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই তারা বলতে শুরু করেছেন, এই রায়ের মাধ্যমে আদালতের ভূমিকা বিতর্কিত হতে চলেছে। যারা এ কথা বলছেন, তাদের অবস্থান মিথ্যার ওপরে হলেও প্রক্রিয়াগত দিকের

বিবেচনায় তাদের কথাটার যুক্তি আছে। আদালত অবশ্যই একটি রাজনৈতিক বিষয়ে রায় দিয়েছেন। প্রশ্নটা যেহেতু আদালতে উঠেছে, ফয়সালা তো দিতেই হবে। এ ক্ষেত্রে সত্যটা যে আদালত বলতে পেরেছেন, সেটাও রাজনৈতিক সুস্থ অবস্থারই একটা প্রতিফলন। আদালত একটা রাজনৈতিক সত্যই বলেছেন, রাজনৈতিক সত্যের পক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তি আছে দেশের ভেতরে। আমরা জানি আদালতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে। পক্ষ-বিপক্ষ উভয়কেই মনে রাখতে হবে, বিষয়টি ইতিহাসের। এর প্রকৃত মীমাংসা অনিবার্যভাবে নির্ধারণ করবে সময়। ইতিহাস কোর্টের রায়ের দ্বারা নিরূপিত হয় না—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এর চেয়ে বড় সত্য ইতিহাস সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখতে দেয় না। ঘোষক বিতর্কের মীমাংসার জন্য হাইকোর্টের রায়ের দরকার ছিল না। সময় নিজেই এ সমস্যার সমাধান করবে। তবে প্রশ্ন হতে পারে, সময়টা কতো লম্বা? খুব স্পষ্টভাবে বলা যায়, জাতি যদি বিভ্রান্তির জালে নিজেকে আটকে রাখতে না চায়, তবে সময়টা খুবই সংক্ষিপ্ত।

মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ অথবা ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন অথবা নিজেই নিজের নামে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস উল্লেখ করার মতো কি এমন ঘটনা ঘটলো? সে সময় এ ধরনের ঘোষণা অনেকেই দিয়েছিলেন, অর্থাৎ দেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যক্তিগত প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন অনেকেই। বিশেষ করে সেনা বা ইপিআর বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা সশস্ত্র ব্যক্তিদের ঘোষণার তো অবশ্যই মূল্য ছিল। তাদের কেউই বেতারে এ ধরনের ঘোষণার প্রচার করার সুযোগ পাননি অথবা এমনটি করেননি। আর করলেও ব্যক্তিগত প্রত্যয় ঘোষণার চেয়ে বেশি এর কোনো মূল্য নেই। বঙ্গবন্ধুর লিখিত ঘোষণাপত্রটি প্রথম পাঠ করা বা প্রচার করার বিষয়টি যদি বলা হয় তবেই শুধু এর একটা অর্থ হয় বা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়। কারণ, মেজর জিয়াউর রহমান তখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার মতো কেউ ছিলেন না। ঘোষণা দেয়ার কোনো অধিকার তার একেবারেই ছিল না। একজন ব্যক্তির চেয়ে বেশি তিনি কিছু ছিলেন না। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে কিছু বলার বা করার কোনো বৈধ অধিকার তার ছিল না। এখন যেভাবে যে অর্থে বলা হচ্ছে , সেভাবে কোনো ঘোষণা যদি জিয়াউর রহমান দিতেন বা সেই অবস্থানে অনড় থাকতেন,তবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের কর্তব্য হতো তাকে দমন করা বা শাস্তি দেয়া। অন্যথায় আরো অনেকেই আন-অথরাইজ

ও অবৈধ স্বাধীনতা ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারতো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা অঙ্কুরে নষ্ট হতো। মেজর জিয়ার কণ্ঠে বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠকে যদি জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা বলা হতো, তবে সেটা হতো একটা হঠকারিতা এবং রাজনৈতিক অপরাধ। প্রকৃত ইতিহাস হলো জিয়া সেদিকে যাননি। তিনি স্বাধীনতার ঘোষক বা ঘোষণা পাঠকারী হিসেবে কোনো বিশেষ কৃতিত্ব নিতে চেয়েছেন বলেও জানা যায়নি। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অধীনে কর্নেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে যে মুক্তি ফৌজ গড়ে তোলা হয়েছিল, জিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ৯ মাস সেই বাহিনীর ১১ জন সেক্টর কমান্ডারের একজন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এটা হলো সর্বজনজ্ঞাত ইতিহাস। তার ঘোষণা পাঠ ইতিহাসের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই। যারা সেই রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ ও ক্ষয়িষ্ণু ভাবাদর্শকে সমর্থন করতে পারেননি,তারাই আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বাধীনতার সেই স্বপ্নে ভিত্তিভূমিটা বস্তুনিষ্ঠ রূপ লাভ করে '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বায়বীয় স্বপ্নের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং খুব বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল '৭০-এর নির্বাচনে জনগণের দেয়া ম্যান্ডেটের মধ্যে জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, তিনিতো ন্যূনতম একজন জনপ্রতিনিধিও ছিলেন না। তিনি ন্যূনতম কোনো এমপি বা এমএনএ ছিলেন না বা ছাব্বিশ বছর ধরে বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলনে লিপ্ত ছিল যে রাজনৈতিক দলগুলো, এর কোনোটার নেতৃত্বে বা সদস্য পর্যন্ত ছিলেন না। মেজর জিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডিং অফিসার ছিলেন না। তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করার কোনো উদ্যোগ নিতে পারেননি এবং এমন কেউ তিনি ছিলেনও না। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কর্তব্যরত অবস্থায় পালিয়ে এসেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে। পালিয়ে আসার পেছনে যে কারণ দেখা গেছে সেটাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার, নাকি নিজের জীবন বাঁচানোর—সে ব্যাপারে বিতর্ক আছে। এ অবস্থায় এমন একটা লোক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিল আর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল, এটা ন্যূনতম বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সামনে প্রচার করার মতো কথা নয়।

কিন্তু এ কাজটিই করা হয়েছে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর আগে কিছুটা রাখঢাক করে তার মুক্তিযোদ্ধা ভাবমূর্তিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ধারায়

ব্যবহার করার জন্য। আর জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর এ বিতর্ককে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে নিয়ে আসা হলো রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আসলে এ বিতর্কের অবতারণা দিয়েই আমাদের দেশের রাজনীতিতে শুরু করা হলো রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি। আর এ স্ট্যান্টবাজির ফাঁদে পা দিয়ে দেশের বুদ্ধিজীবীরা শুরু করে দিলেন এর পক্ষে-বিপক্ষে লতাপাতা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ। পক্ষে যারা বিশ্লেষণ করেছেন তারা একটা লক্ষ্য নিয়ে করেছেন, সেটা খুব সহজেই বোধগম্য। আর বিপক্ষে যারা বিশ্লেষণ করেছেন তারা একটা পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে একটা তুচ্ছ বিষয়কে মুখ্য আলোচনার বিষয়ে পরিণত করেছেন। তারা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ করেননি।

মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করে একটা অত্যন্ত ভালো কাজ করেছিলেন, এতে কোনো সন্দেহে নেই। কাজটি যে ভালো করা হয়েছিল, সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন প্রবাসী সরকারের অধীনে পূর্ণ আনুগত্যে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। যদি তা না করে তিনি নিজে ঘোষকের দাবিদার হতেন, তবে হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে বিপত্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারতো। তবে বাস্তবে সে আশঙ্কা ছিল খুবই কম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সমগ্র বাঙালি জাতি যেভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাতে বিচ্ছিন্ন ঘোষকের দাবিদার একটা দুটা বা দশটা-পাঁচটা জিয়াউর রহমান যে বিট্রেয়ার হিসেবে হারিয়ে যেতো, এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মরহুম জিয়া এবং দেশবাসীর সৌভাগ্য এই যে, এমন কোনো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেনি। মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠকে দেশবাসী অভিনন্দিত করতে পেরেছে এবং দেশবাসী সে জন্য চিরকাল তাকে স্মরণেও রাখবে।

'৭১-এর মার্চের সেই সঙ্কটের দিনগুলো ছিল এমন যে, একজন সশস্ত্র মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন শুনতে পারলে দেশবাসী আনন্দিত হতো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন জানতে পেরে দেশের অগণিত মানুষ তো অবশ্যই উল্লসিত হয়েছিল। মেজর জিয়ার মতো আরো অনেকেই তখন সরবে বা নীরবে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়াইয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা যদি রাজনৈতিক বা সামরিক নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ছিল, যাতে তাকে স্বাধীনতার নায়ক অথবা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের নেতা বলা যায়, এমন কেউই তিনি ছিলেন না। স্বাধীনতা

লাভের পর তিনি যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রমোশন পেয়ে নবগঠিত সেনাবাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাহলে ঘোষক জিয়ার তত্ত্বটা আসলে কি ?

আসলে এটি পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তির প্ররোচনায় দাঁড় করানো একটা অসুস্থ রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছলচাতুরী এবং স্ট্যান্টবাজির সূচনাও এখান থেকে। আওয়ামী লীগ একটা খুব পরিচ্ছন্ন ও ভালো দল, এ কথা বলা কঠিন। তবে রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজির সূচনা জিয়াউর রহমানের ছায়াকে কেন্দ্র করেই। রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত্যুর পরে ঘোষক অভিধাকে অবলম্বন করে এটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইতিহাস বিকৃতির এক বালখিল্যপনায়।

বিএনপির তথাকথিত কপট রাজনীতির সেই ঘোষক তত্ত্বটা একেবারেই কাঁচা পাবলিককে বোঝানোর মতো একটা কথা। বিনাঅর্জনে হঠাৎ কপাল খোলার একটা অসৎ ও সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে এ তত্ত্বটার ভেতরে। আর এটা বোঝানো বা বিশ্বাস করানো সম্ভব কেবল নির্বোধ, লোভী পাবলিককে। এ তত্ত্ব একদিকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভেতরটাকে ফোকলা করে দিয়েছে, অন্যদিকে আমাদের মহৎ ও মহান গৌরবের অর্জন স্বাধীনতাকে তাৎপর্যহীন করে তোলার পটভূমি তৈরি করেছে। ঘোষক তত্ত্বটা শুনলে মনে হয়, জিয়াউর রহমান নামে একজন মেজর স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, কিন্তু বন্দুক-টন্দুক নিয়ে মানুষ নেমে গেল আর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। মনে হয় যেন জিয়াউর রহমান সুযোগ বুঝে এ ঘোষণাটা না দিলে দেশ স্বাধীন হতো না। এছাড়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভুল ধারণা মানুষকে দেয়া হয় যে, স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে খুব সহজেই, রাজনীতিটা খুব সহজ লাভজনক এবং নেতৃত্ব ভাগ্যের ব্যাপার। আজকের বাংলাদেশ এ ভুল ধারণার সমস্যায় দারুণভাবে আক্রান্ত। মানুষের মধ্যে লোভ আর উন্যাসিকতা উস্কে দিতে পেরেছে এ সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং কাঁচা পাবলিককে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে সৃষ্টি করা যে ভুল ধারণা আর স্থূল অবলম্বন যে ঘোষক তত্ত্ব, এর ভেতর থেকে বাংলাদেশের মানুষ বের হয়ে আসবে জীবনের প্রয়োজনেই। সময় কতো লাগবে, তা নির্ভর করবে দেশের মানুষ কতো সময় অপচয় করতে চায়। হাইকোর্টের রায়টি এ ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও করতে পারে। তবে সমস্যার সমাধান কোর্টের রায়ের মাধ্যমে হবে না। কোর্টের রায় এখানে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজন । আশঙ্কার অবকাশ আছে, রায়ের ফলে বিতর্ক কিছুটা দীর্ঘায়িত হওয়ারও অজুহাত তৈরি হতে পারে। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক

তৎপরতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি হলো, মানুষ দীর্ঘকাল একই বিভ্রান্তির ভেতর ডুবে থাকে না। বেতারে ঘোষণা পাঠের মতো ঘটনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মোটেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, এটা মানুষ বুঝবে দু'দিন আগে বা পরে। মানুষ এটাও বুঝবে যে, স্বাধীনতা এসেছে অনেক প্রজ্ঞা ও ত্যাগসমৃদ্ধ দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে । । সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ত্যাগ ও দেশপ্রেমকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে তৈরি হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের অগ্রগতির মান ও মাত্রা।

স্বাধীনতা এবং চট্টগ্রামের বিতর্কিত ঘোষণা

ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম

১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলন, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ঐতিহাসিক ছয়দফা উপস্থাপন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ও তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ—এই সমস্ত প্রক্রিয়াই এদেশের স্বাধীনতার বিভিন্ন পর্যায়। এবং বলাই বাহুল্য, ছাত্রলীগের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে এর বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পেরে আমি নিজেই বেশ গর্ববোধ করি। ১৯৬৯-এ আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভোলা থেকে আগত তরুণ ছাত্রনেতা তোফায়েল ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এবং সমগ্র ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কলাভবনের ঐতিহাসিক আমতলায় এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছি। সে আন্দোলন পরবর্তীতে সমস্ত বাংলাদেশকে অচল করে দিয়েছিল। এরই ফলে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এরই প্রেক্ষাপটে স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর পতন ঘটেছিল। আমাদের এই দুর্বার আন্দোলনের কারণেই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে তথাকথিত মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হয়। আমাদের অনেক আন্দোলন, অনেক কারফিউ ভাঙ্গার সংগ্রামে সূর্যসেন হল ও অন্য আরও কয়েকটি হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের সংগঠিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুর রাজ্জাক ভাই প্রায়ই আমাদের সাথে হলে থাকতেন। রাতের বেলায় মিটিং করা, পোস্টার লাগানো, স্বাধীনতা সংগ্রামের ধীর প্রস্তুতি এসব কিছুই এখন নস্টালজিয়া হিসেবে কাজ করে। আমাদের পিছনে ফেলে আসা স্মৃতিকে রোমন্থন করতে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সমগ্র দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানি শাসকচক্র বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় বসতে দেয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এর

৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্সের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন। আমরা যারা সেদিন মাঠের একপ্রান্তে বসেসেই ভাষণ শুনেছিলাম, তাদের এটি বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, সত্যিকারভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেদিনই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়েছিল। জাতির জনকের সেই বলিষ্ঠ ঘোষণা আজও এদেশের মাঠে-ঘাটে উচ্চারিত হয়—"এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এরপর ১৯৭১-এর মার্চের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পরীক্ষার আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে আমি চলে আসি চট্টগ্রামে। কেননা, আমার পিতা তখন ছিলেন চট্টগ্রামে কর্মরত এক কাস্টমস কর্মকর্তা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর চট্টগ্রাম হয়ে পড়ে তখন সম্পূর্ণভাবে এক অশান্ত ও সংগ্রামমুখর নগরী। চট্টগ্রামে তখনকার সময়ে সংগ্রামী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন এমএ হান্নান, জহুর আহমেদ চৌধুরী এবং এমআর সিদ্দিকী। তাদের নেতৃত্বে এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চট্টগ্রাম তখন প্রস্তুত হচ্ছিল। বলতে গেলে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম তখন দেশের দ্বিতীয় সংগ্রামী মহানগরী। আন্দোলনের পটভূমিতে সেখানে তখন চলছিল বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিক্ষোভ মিছিল এবং চূড়ান্ত আন্দোলনের সর্বাত্মক প্রস্তুতি।

এদিকে ঢাকায় পাকিস্তানি মিলিটারি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নামে এক প্রহসন করে যাচ্ছিল। তারই পাশাপাশি অত্যন্ত সুকৌশলে চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যমেই সৈন্য ও অস্ত্র আমদানি করে যাচ্ছিল। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাসের ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর সময়ে চট্টগ্রামের জনগণ প্রচণ্ড প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার নামে সেনাবাহিনীর এক সিনিয়র বাঙালি অফিসার সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র উদ্ধানের বিষয়ে জনগণের আপত্তির কথা পাক-বাহিনীর নিকট তুলে ধরেন। সম্ভবত সে কারণেই ২৪ মার্চ তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরই মধ্যে আমার বাড়ির কিছু দূরে আইস ফ্যাক্টরি রোডে অবস্থিত ন্যাশনাল ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ করা একটি অস্ত্রভাণ্ডার সম্পূর্ণ লুট হয়ে যায়। আমার যতোটুকু মনে আছে সেটি ছিল ২৫ মার্চ তারিখে এবং আমি নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি অবলোকন করেছিলাম যে, গুদামের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রসামগ্রী, গুলি রসদ সবই প্রায় পাবলিকের হাতে চলে গেছে। মূলত মেজর জিয়া তাঁর কমান্ডান্টের নির্দেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম পোর্টে যাচ্ছিলেন সোয়াত জাহাজ থেকে পাকিস্তানি সমরাস্ত্র

খালাস করতে। পাকিস্তানি আর্মি এখানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। কেননা, যেখানে সমস্ত চট্টগ্রাম শহরেই বাঙালি জনগণ অস্ত্র খালাসে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে, সেখানে একজন বিশ্বস্ত বাঙালি অফিসারকে দিয়ে সমরাস্ত্র খালাস করতে টেকনিক্যালি তারা বেশ সুবিধা পাবে—এটা ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মেজর জিয়া কূটচালে বেশ দক্ষ ছিলেন বিধায় বাঙালিদের আশ্বস্ত করে ব্যারিকেড তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু পথিমধ্যে ছাত্রলীগ নেতা এম এ ইউসুফ সেখানে উপস্থিত হয়ে যে কোনো মূল্যে ব্যারিকেড বহাল রাখতে নির্দেশ দেন এবং মেজর জিয়া তখন বাধ্য হয়ে তাঁর ট্রাকের পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যেতে নির্দেশ দেন। (দ্রষ্টব্য : মুসা সাদিক ২০০৬)।

এ ছাড়া দামপাড়া পুলিশ লাইন মূলত বাঙালি পুলিশ ভাইদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এমনকি ২৮ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রায় সম্পূর্ণ জনগণের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। প্রশাসন বলতে তেমন কিছুই ছিল না। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের তত্ত্বাবধানে জনগণকে সাথে নিয়ে একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা চলছিল। ২৬ মার্চ রাতে দামপাড়া পুলিশ লাইনের এসআই আকরাম খানের নেতৃত্বে শত শত পুলিশের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয় এবং পুলিশ লাইনের অস্ত্রভাণ্ডারও খুলে দেয়া হয়। এদের সাথে তখন যোগ দেন পুলিশের এসপি সামসুল হক। এই সময়ে পুলিশের সাথে জনগণের যতো সম্পৃক্ততা ছিল, সেই প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে থাকার কারণেই সম্ভবত তারা ছিল কিছুটা জনবিচ্ছিন্ন। তবে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাত ৮:৪০ মিনিটে মেজর রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বাঙালি ইপিআর ও জেসিওরা প্রথম বিদ্রোহ করে। এবং রাত ১১:৩০ মিনিটের মধ্যেই মেজর রফিকুল ইসলাম সমস্ত চট্টগ্রাম শহর তার দখলে নিয়ে নেয়।

তবে সেনাসদস্যরা যে নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হচ্ছিল তা আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি। ২৬ মার্চের গভীর রাতে চট্টগ্রামের বাঙালি সেনাসদস্য এবং বেসামরিক অফিসারদের মাধ্যমে এটা জানা গেল যে চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর সবাই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রি গত হবার পর ২৬ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে ঢাকা থেকে ইপিআরের বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার যে ঘোষণা দেন সেটি হলো : This may be my last message. From today,

Bangladesh is independence. I call upon the people of Bangladesh to resist the army of occupation, until the final victory is achieved.

মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তমের লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে গ্রন্থেও ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার নাম উল্লেখ হয়েছে। এই ক্যাপ্টেন ভূঁইয়াই কুমিল্লার আওয়ামী লীগ নেতা ও বর্তমানে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত সাংসদ মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার মর্যাদায় যদি কাউকে কৃতিত্ব দিতে হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়ারও সে কৃতিত্ব কিছুটা প্রাপ্য। কেননা, ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার নাম জিয়াউর রহমান সাহেব নিজেই উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি যে তার সাথে আছেন সেটি উল্লিখিত হয়েছে তার বক্তব্যে। আর সেই সাথে আরেকটি কৃতিত্ব মেজর রফিকুল ইসলামের, যিনি সর্বপ্রথম ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণে নিতে পেরেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে তখন ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (বর্তমানে কর্নেল অলি এমপি) জিয়াউর রহমানের সাথে ছিলেন। আমরা তার অবদানকেও খাটো করে দেখতে পারি না। এখন মাঝেমধ্যে অযাচিতভাবে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাকে অনেক খাটো করা হচ্ছে। কেননা, তিনি এককভাবে সে ঘোষণা দেননি। সে ঘোষণায় ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের শ্রদ্ধেয় বেলাল ভাই ও কয়েকজন কর্মকর্তা, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান ও আরও কয়েকজন অফিসার। সেই ক্ষেত্রে ঘোষণার পাঠক সংখ্যা অনেক। আমরা বিশেষ সূত্রে জানতে পারি যে, তখন তার সাথে ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া এবং আরও অনেকে। আমাদের অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক এটি প্রচার করতে চান যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে, ইতিহাস বিকৃতির এই নোংরা রাজনীতি মানুষ বুঝতে পারে না—এটি মনে করার কোনো কারণ নেই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ পদাতিক ডিভিশনে কর্মরত আইএসপিআর-এর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক তার Witness to surrender গ্রন্থে উল্লেখ করেন; "When the first shot had been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly, through on a wave-length, close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been and sounded like a pre-recorded message, the

Sheikh proclaimed East Paksitan to be the Republic of Bangladesh.

সিদ্দিক সালিক এটি তার লেখায় উল্লেখ করেছেন বলেই এই বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হবে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। বস্তুত, পৃথিবীর অনেক লেখকের বরাত দিয়েই এ সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে আজ থেকে পয়ত্রিশ বছর আগে। মনে রাখতে হবে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণই প্রকৃত স্বাধীনতার ডাক; যার আহবানে জিয়াউর রহমানের মতো অগণিত সামরিক অফিসার, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে, মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক লাখো বাঙালি, জিয়াউর রহমান একা নন। মেজর জিয়া নিজেই তার একটি জাতির জন্ম প্রবন্ধে এই সত্যটি স্বীকার করেছেন এবং তার নিজের লেখা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগনাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ পদে চাকরিরত অবস্থায় জিয়াউর রহমানের একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন মূসা সাদিক ১৯৭৪ সালে; এবং সেখানে জিয়াউর রহমান পরিষ্কারভাবে বলেন, ১৯১৭ সালে যেখানে যা করেছি, তা Father of the nation বঙ্গবন্ধুর নামেই করেছি। কেননা, He has the mandate, and he was the symbol of our independence.

তাই সকলের হৃদয়ে লেখা একটি নাম, ঘোষক তুমি, জনক তুমি, শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার ঘোষণা মার্কিন দলিল ও সংবাদপত্রে

সেলিম রেজা নূর

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে গত বেশ কয়েকবছর ধরেই ইতিহাস বিকৃতির অপপ্রয়াস চলছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালের প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হয়েছে মিথ্যা; বিকৃত ও ফরমায়েশি গল্প; যার কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই। একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনো আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না বরং দীর্ঘদিনের সংগ্রাম সাধনার ফল হিসেবেই প্রতিভাত হয় একটি জাতির জীবনে। তাই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার ঘোষণাটি সমুজ্জ্বল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালিই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে দেশ ও জাতির প্রতি অকৃত্রিম সেবা দিয়েছিলেন বলেই আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছিলাম।

মেজর জিয়ার ঘোষণাটি নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল এযাবৎকাল যতো ডঙ্কানিনাদই করুক না কেন ইতিহাসের মানদণ্ডে তা টিকবার নয়। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো জীবদ্দশায় মেজর জিয়া স্বয়ং এ রকম দাবি কখনোই কোনোখানে করেননি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি তার দেওয়া। ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রা ম্যাগাজিনটিতে একটি জাতির জন্ম শিরোনামে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে একবারের জন্যও ভুল করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার কৃতিত্বটি দাবি করতে পারেননি।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলা ও বাঙালির স্বার্থবিরোধী একটি মহল ক্ষমতায় থেকে ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত সব বিনষ্ট করার পর এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতেছে। জাতির ওই সংকটকালীন মুহূর্তে জিয়াউর রহমানের দেওয়া ঘোষণাটি ছিল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ২৫ মার্চের পরবর্তীকালের ঘটনা ধারায় হতবিহ্বল জাতি যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পতিত ঠিক তখনই একজন বাঙালি সামরিক

কর্মকর্তা জাতিকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন। তার সেই ঘোষণা সমগ্র জাতিকে নতুন উদ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা দিয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মহাপ্রলয়ঙ্করী ফলাফলে জাতির জীবনে যে আদর্শবাদী নেতা ও নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে সেটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউ নয়। ১৯৭১ সালের ঘটনা ধারার আগেও পল্টনের জনসমাবেশ থেকে যেমন অনেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা তুলেছিলেন। (!) কিন্তু সেগুলো যেমন স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে স্বীকৃত নয়, তেমনি জিয়াউর রহমান প্রদত্ত একটি বিচ্ছিন্ন ঘোষণাও দেশে-বিদেশেও ইতিহাসের পাতায় স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া কোনো বিষয় নয়। সেটি জিয়াউর রহমান স্বয়ং জানতেন বলেই তার জীবদ্দশায় অনাহূত এ জাতীয় হীনবিতর্কে নিজেকে জড়াননি। বরং তার ঘোষণাটি যে অন বিহ্যাফ অব বঙ্গবন্ধু (বঙ্গবন্ধুর পক্ষে) দেওয়া হয়েছে সেই সজ্জন স্বীকৃতিই বারবার দিয়ে গেছেন। কিন্তু বিজাতীয় স্বার্থান্বেষী মহল দেশের ক্ষমতায় বসে নিজেদের মনগড়া ইতিহাস জাতিকে উপহার দিয়ে যাচ্ছে। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমরা জাতির সামনে তুলে ধরছি ১৯৭১ সালের সেই উত্তাল দিনগুলো, যা ছিল আলো-আঁধারিতে ভরা। তুলে ধরছি সেদিন মার্কিন প্রশাসন ও পত্রপত্রিকাগুলো কী বলেছে সেই তথ্য ও প্রামাণিক দলিল, যা থেকে পরিষ্কার হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে প্রবাসী মোহাম্মদ এম রহমান জালাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রামাণ্য ইতিহাস সংগ্রহ ও প্রচারে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। স্বদেশের লাইব্রেরি ও বিভিন্ন আর্কাইভ থেকে পরিকল্পিতভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত রেকর্ড, তথ্য-উপাত্তগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে। এমন সময়ে আমাদের সময়কার নির্ভীক 'মুক্তিযোদ্ধা' এম রহমান জালাল নিরলস সংগ্রাম সাধনায় মগ্ন আছেন পৃথিবীর সমগ্র তথ্যভাণ্ডার থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সঠিক অধ্যায়গুলো তুলে আনা ও সংরক্ষণের কাজে। সাম্প্রতিককালে মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গোপন প্রামাণ্য তথ্য ও দলিল, তৎকালীন কংগ্রেসে বাংলাদেশ বিষয়ক আলোচনা ও মার্কিন প্রভাবশালী পত্রিকার বর্ণনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার স্বীকৃতিটি কিভাবে এসেছে সেসব তথ্য নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন এম রহমান জালাল। তার সংগৃহীত এসব তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে আসলে কে, কখন স্বদেশের

স্বাধীনতার ঘোষণাটি দিয়েছিলেন। সেসঙ্গে এই নিয়ে অনাহূত বিতর্কেরও অবসান ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।

২৬ মার্চ, ১৯৭১ পূর্বাঞ্চলীয় সময় ২টা ৩০ মিনিটে 'পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ' শিরোনামে ডিফেন্স ইন্টিলিজেন্স এজেন্সি 'স্পট রিপোর্ট' পাঠায় হোয়াইট হাউসের 'সিচুয়েশন রুমে'। প্রতিবেদনটি শুরু হয় এভাবে :

'আজ দুই অংশে বিভক্ত পাকিস্তানের একটি অংশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বাঞ্চলকে 'স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা দিলে দেশটি আচম্বিতে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।"

এরপর প্রতিবেদনটিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আকস্মিক হামলা ও বাঙালির প্রতিরোধের ঘটনার উল্লেখ আছে। শেষে পূর্বাঞ্চলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো পশ্চিমাঞ্চলের হিংস্র আক্রমণের মুখে আরও চরমপন্থী হয়ে উঠে মার্কিন স্বার্থের বিপক্ষে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে প্রেরিত দূতাবাসের একটি গোপন টেলিগ্রাম যেটি পাঠানো হয় ৩১ মার্চ ১৯৭১। এতে বলা হয়েছে—

"নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরছে : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে চলমান সমঝোতামূলক আলোচনা ভেঙে দিয়ে ইসলামাবাদে ফিরে যাওয়ায় ২৫-২৬ মার্চ রাত্রিতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আকস্মিকভাবে চরম অবনতির দিকে মোড় নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কঠিন কঠোর সামরিক অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে, যার মধ্যে আছে সামগ্রিক রাজনৈতিক তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করার ঘেষণা এবং ২৪ ঘণ্টার সান্ধ্য আইন। সামরিক বাহিনী নির্দয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢাকা শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য চষে বেড়াচ্ছে। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ২৬ মার্চের এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ ছাড়া ইয়াহিয়া দেশের দুই অংশের রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ও আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

এদিকে যেসব আওয়ামী লীগ নেতা এই হিংস্র আক্রমণের মুখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, তারা গোপন আস্তানায় গিয়ে লুকানো বেতার কেন্দ্র থেকে জাতিকে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। এই সব ঘোষণার প্রাথমিক ঘোষণাটিই ছিল সার্বভৌম এবং স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে'র ঘোষণা যেটি করা হয়েছে মুজিবের নামে।

২৭ মার্চ এই গুপ্ত বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া খানের নেতৃত্বে বিপ্লবী সামরিক বাহিনী ও অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালের মার্কিন কংগ্রেসের যে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা আছে, সেখানে ২৭ জুলাই ১৯৭১, মঙ্গলবারের সংসদীয় আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত আছে 'স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা' সংক্রান্ত অধ্যায়টি। সেই আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ) নিউইয়র্কস্থ সদস্য স্যেস্যুর হ্যালপান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটির কথা উপস্থাপন করেন এভাবে :

"জনাব স্পিকার, রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধ্যাপক অ্যালবার্ট ব্ল্যাস্টিন কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে গত ১০ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণার যে প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হয়, তার একটি অনুলিপি সংগ্রহ করেছেন। সেই স্বাধীনতার ঘোষণার পাঠটি এরকম :

যেহেতু, এই অবস্থায় এ রকম বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা হয় (বাঙালি জাতির সঙ্গে) সেহেতু বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বৈধ অধিকারের পরিপূর্ণতাদানের জন্য যথাযথরূপে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণকে দেশের সম্মান ও অখণ্ডতা রক্ষার আহ্বান জানান এবং এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র বলে বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা দেন এবং তদানুযায়ী ইতোমধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে (এই সভা) অনুমোদন -রেছে।

প্রভাবশালী মার্কিন দৈনিক পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ শনিবারের সংখ্যায় প্রথম পাতায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার তলে ৭ মার্চ রেসকোর্সে ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধুর ছবির পাশে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংবাদ সম্মেলনের একটি ছবি নিম্নোক্ত শিরোনামে ও সংবাদে ফলাও করে প্রকাশ করে :

পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী নেতাকে আটকের খবর—ওই অঞ্চলের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের পরপরই শেখ মুজিব গ্রেপ্তার, ঢাকার সান্ধ্য-আইন শিথিল—শহরে ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সুবিধাজনক অবস্থানের থাকার দাবি—ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দৃশ্যমান।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) পরিবেশিত নিউইয়র্ক টাইমসের মূল সংবাদের প্রথম অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে :

'নয়াদিল্লি, শনিবার, ২৭ মার্চ : পাকিস্তান রেডিও আজ ঘোষণা করেছে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন শহরে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের সূচনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন।

এই একই সংবাদে কয়েক অনুচ্ছেদ পরে গুপ্ত বেতার কেন্দ্রের (স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্র) বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয় :

গুপ্ত বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত সংবাদে বলা হয়েছে, যারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল (যথা সিলেট, যশোর, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা) পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে।

শেখ মুজিবুর রহমানই হচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশের একমাত্র নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সর্বস্তরের জনগণকে তারই (শেখ মুজিবের) প্রতিটি নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে বলা হয়েছে।

প্রভাবশালী আরেক মার্কিন দৈনিক দ্য ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল ২৯ মার্চ, ১৯৭১ সোমবারের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরেছিল এভাবে:

পশ্চিম পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ঢাকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। রেডিও পাকিস্তান দাবি করেছে, বর্তমানে শান্ত অবস্থা পূর্ব পাকিস্তান জুড়েই বিরাজ করছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারীরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছেন যে, এই গৃহযুদ্ধে তারা জয়ী হতে যাচ্ছে। বিদ্রোহীরা বলেছে যে, তারা একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেছে এবং তাদের বাহিনী রাজধানী ঢাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া (ইউএনআই) এক গুপ্ত বেতার কেন্দ্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, রহমান (শেখ মুজিবুর রহমান) বিপ্লবী বাহিনীর সদর দপ্তরে আছেন, কিন্তু সদ্য ঢাকা ত্যাগকারী অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক রিপোর্টার বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে বেশ জোরগলায় দাবি করেছেন যে, রহমান (মুজিব) ও তাঁর অধিকাংশ বিশ্বস্ত অনুসারীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত সপ্তাহান্তের সংঘর্ষে ৫ থেকে ৭ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আরেক প্রভাবশালী পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্ট এপি পরিবেশিত নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত সংবাদটিই 'পাকিস্তান যুদ্ধে বিদ্রোহী নেতা গ্রেপ্তার' শিরোনাম

দিয়ে প্রকাশ করে একই দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ, ১৯৭১ শনিবার।

এদিকে ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ টাইম ম্যাগাজিন পাকিস্তান : ধ্বংসের প্রান্তসীমায় শিরোনামে যে বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ প্রকাশ করে সেখানে বলা হয় :

সামরিক বাহিনী ২৪ ঘণ্টা মেয়াদের কঠিন সান্ধ্য আইন ঢাকা শহরে বলবৎ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের (চট্টগ্রামের কোনো জায়গা থেকে) সম্প্রচার শুরু হলে তা মানুষকে নতুন করে নড়েচড়ে উঠত অনুপ্রাণিত করে। এই গুপ্ত বেতার কেন্দ্র থেকেই মুজিব 'সার্বভৌম-স্বাধীন বাঙালি জাতি' (রাষ্ট্র) গঠনের ঘোষণা দেন এবং স্বীয় দেশবাসীকে যেকোনো মূল্যে স্বদেশের মাটি থেকে শত্রুবাহিনীকে উৎখাতের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

ওই একই দিন (৫ এপ্রিল, ১৯৭১) প্রভাবশালী নিউজউইক ম্যাগাজিন পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শিরোনামায় দীর্ঘ বিশ্লেষণী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পূর্বাপর সব ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরে এই প্রতিবেদনে স্বাধীনতার ঘোষণাদানের অংশটিতে বলা হয় :

'আলোচনা ও সমঝোতার পথ থেকে আকস্মিকভাবে সরে এসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সামরিক অভিযান শুরু করলে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে সার্বভৌম-স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (বাংলা জাতি) বলে ঘোষণা দেন। আর এর সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত হয়।

কিসিং'স কনটেম্পোরারি আর্কাইভস'-এ সংরক্ষিত পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তান গৃহযুদ্ধ শিরোনামে মে ১-৮, ১৯৭১ পর্বের এক প্রতিবেদনে যে বর্ণনা আছে সেটা এরকম :

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইয়াহিয়া মুজিব, ও ভুট্টোর মধ্যকার গোলটেবিল বৈঠক আবারও অচলাবস্থার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তখন শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ 'বাংলাদেশ' (বাংলা জাতি) নামে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে স্বাধীনতার ডাক দিলে পূর্বপাকিস্তানে আকস্মিকভাবে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

একই প্রতিবেদনর পরবর্তী অনুচ্ছেদে গৃহযুদ্ধের সূচনা—আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা—রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে 'দেশদ্রোহী' হিসেবে অভিযুক্তকরণ অংশে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ সংগঠনের পর্যায়কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে নিম্নোক্ত বর্ণনায় :

২৬ মার্চ যখন একটি গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়, তখনই পূর্ব

পাকিস্তানে পূর্ণ মাত্রায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। গুপ্ত বেতার কেন্দ্রের এই প্রচারণা, যা ভারত থেকে শোনা গেছে, তাতে বলা হয়েছে যে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, বরিশাল এবং খুলনায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুলিশ বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি এই বেতার কেন্দ্র থেকে শেষ শত্রু নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে (যিনি গোপন আস্তানায় আছে বলে বলা হচ্ছে) স্বাধীন বাংলাদেশের একমাত্র নেতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসন থেকে দেশকে রক্ষার জন্য তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালন করতে জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

২৭ মার্চ, ১৯৭১ শনিবারের লস এঞ্জেলস টাইমস দৈনিক পত্রিকাটি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পূর্বপাকিস্তানিদের স্বাধীনতার দাবিতে গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে শিরোনামে নিজস্ব প্রতিবেদক উইলিয়াম জে কফলিনের নয়াদিল্লি থেকে পাঠানো প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয় : শেখ মুজিবুর রহমান গত শুক্রবার পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে এই মুসলিম দেশটির দুই অংশের মধ্যে এতোদিন ধরে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব-কলহ প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। এখানে (নয়াদিল্লি) শ্রুত স্বাধীন বাংলার কণ্ঠস্বর নামে পরিচিতি দানকারী একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবুর রহমন সাড়ে ৭ কোটি পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে সার্বভৌম-স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

মার্কিন কংগ্রেসে পাকিস্তান সংক্রান্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা আছে যেসব দলিলে সেখান থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়টি আবারও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

১৯৭১ সালের ১৮ মে প্রকাশিত কংগ্রেসনাল রেকর্ড-সিনেট নথিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে বিগত ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর মূলত মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে অতর্কিত আক্রমণ চালায় সে- সংক্রান্ত বিতর্ক। এই অধ্যায়ে সদস্য মি. চার্চ পাকিস্তানে আমাদের অস্ত্র সরবরাহ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে প্রস্তাবনার পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে পূর্ববাংলায় ঘটে চলা পূর্বাপর ঘটনাধারা তুলে ধরতে গিয়ে এক পর্যায়ে ফরাসি প্রভাবশালী পত্রিকা লা-মণ্ডের ১ থেকে ৭ মে, ১৯৭১ সংখ্যাগুলো থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। মি. চার্চের তুলে ধরা লা-মন্ডের উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ : 'পাকিস্তান-

রক্তস্নানের সপ্তাহ' শিরোনামে জে. ব্যার্ড ভিব্যাটেল্যে'র প্রতিবেদন : সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যথাসময়ে পাকিস্তান রক্ষা পেয়ে যাওয়ার জন্য।

এটি ছিল এর আগের সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সংবাদ শোনার পর পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আজ খুবই নগণ্যসংখ্যক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক পাওয়া যাবে, যারা ভুট্টোর সঙ্গে একমত হয়ে এই ধারণা পোষণ করবে যে পাকিস্তানের ঐক্য বাস্তবিকই রক্ষা পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ মধ্য রাত্রির পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সে সংবাদ ভারতীয় সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্র অফিসসমূহে যে বার্তা প্রেরণ করে তারই একটি টেলিপ্রিন্টার অনুলিপির ভাষা এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

"প্রজাতন্ত্র : আগরতলা মার্চ ২৬ : পিটিআই; আজ রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানকে একটি সার্বভৌম : স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন।" এই নিউজ ফ্ল্যাশটি বিবিসির টেলিপ্রিন্টার ধারণ করে সামরিক সময় ২১০৭ ঘণ্টায়। পিটিআই ঠিক এক মিনিট পরেই (২১০৮ ঘণ্টা) পাঠানো আরেকটি সংবাদে আরেকটু বিস্তারিত বিবরণ দেয় সেটি এরকম:

'পাক-প্রজাতন্ত্র দুই আগরতলা-পিটিআই : আজ রাত্রে এক গুপ্ত বেতার কেন্দ্র, যারা নিজেদের স্বাধীন বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচয় দিয়েছে, সেখান থেকে এক ঘোষক এই ঘোষণা করেছেন যে, 'শেখ (মুজিবুর রহমান) পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে সার্বভৌম-স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।"

আরেক সংবাদ সংস্থা ইউএনআই এই একই সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে পাঠায়, যার ভাষ্যরূপ ছিল এ রকম :

ফ্ল্যাশ : মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন—ইউএনআই। একই সংবাদ সংস্থা ইউএনআইর পরবর্তী সংবাদ ঝলকটি নিম্নরূপ:

"শিলং, মার্চ ২৬ (ইউএনআই) 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আজ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের কথা ঘোষণা করেছেন।

সামগ্রিকভাবে এই আলোচনা থেকে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই এবং বাংলাদেশের সংবিধানে সেই স্বীকৃতি আজও লিপিবদ্ধ করা আছে। আজ যারা অন্য কাহিনী শোনাতে চাইছেন তারা নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন।

ইতিহাসের সত্য ও হাইকোর্টের রায়

হারুন হাবীব

দুর্ভাগ্যটা বাংলাদেশের, আমাদের জাতির এবং মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদের, লাখো আহত মানুষের, লাখো নির্যাতিত নারীর। সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের ইতিহাসের । দুর্ভাগ্য এ কারণেই বলি, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চার যুগের মাথায় আজ দেশের শীর্ষ আদালতকে রায় দিয়ে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, মেজর জিয়াউর রহমান বা আর কেউ নন।

অথচ দেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম এখনও জীবিত। দেশের কোটি কোটি মানুষ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতা ও কর্মী আজও সশরীরে আছেন। শুধু বাংলাদেশে নয় বিদেশের মাটিতেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সব দলিলপত্রই সংরক্ষিত আছে। এ দেশের জন্মের সঠিক ইতিহাস জানেন সবাই। অথচ জ্বলন্ত সে ইতিহাসকেও মুছে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে।

২১ জুন, ২০০৯ সে কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। হাইকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে যেদিন নতুন করে ইতিহাসের সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ রায়ে বলা হয়েছে, মেজর জিয়াউর রহমান নন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক এবং তারই নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

বিচারপতি এবিএম খায়বুল হক ও বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে হাইকোর্টের এ রায়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। দেশের বেশিরভাগ সুবিবেচক মানুষ এ রায়কে সাধুবাদ জানিয়েছে। অন্তর থেকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিএনপি দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এ রায় জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি ঐতিহাসিক সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলে জাতি কেন বিভক্ত হবে—তার ব্যাখ্যা থাকা উচিত ছিল। তবে কথা হচ্ছে মওদুদ আহমদ ও তাদের অনুসারীদের মুখ থেকে এ ধরনের বক্তব্য নতুন কিছু নয়। মূলত তারাই যে জাতিকে বিভক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চান—তা দেশের বৃহত্তর জনগণ জানে যাহোক, গুরুত্বপূর্ণ এ রায়ে একই সঙ্গে জিয়াউর

রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উপস্থাপন করে প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র-এর তৃতীয় খণ্ড বাতিল ঘোষণা করে দেশে-বিদেশে সব জায়গা থেকে এ খণ্ডটি বাজেয়াপ্ত ও প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য, দেশের সব মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বাধ্যতামূলকভাবে সন্নিবেশ করার জন্যও সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর তড়িঘড়ি করে স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় হাত দেয়া হয়নি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেটি বাস্তবসম্মত ছিল না। এরই মধ্যে ঘটে যায় ১৯৭৫-এর রক্তপাত। জাতির জনকসহ তার পরিবারকে হত্যা করা হয়। ঘটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধবাদীদের আবির্ভাব। ইতিহাস রচনার কাজটি শুরু করা হয় ১৯৮৭ সালের ১৮ জুলাই। অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবিরের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮২ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় এই কমিটি ১৬ খণ্ডের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র প্রকাশ করে। এই দলিলে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে কোথাও মেজর জিয়াউর রহমানের নাম ছিল না বা থাকার সঙ্গত কোনো কারণও ছিল না।

বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামলেও এ আকড় ইতিহাস গ্রন্থের কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। যদিও তারা নিজেদের পছন্দমতো স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তখন নানা অসংলগ্ন প্রসঙ্গ যোগ করেছিল, কিন্তু ইতিহাসের মূল দলিলে হাত দিতে সাহস করেছিল। এরপর অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র ক্রমশই শক্ত হয়েছে। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণের জন্য উদ্যোগ নেয়। যদ্দুর জানি সেদিনকার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ও প্রফেসর জসিম উদ্দিন আহম্মদ। এই কমিটির তৈরি করে দেয়া প্রস্তাবনা অনুযায়ী ২০০৪ সালের জুন মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র। এতে তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমানকে (অর্থাৎ সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা) স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করা হয়। এধরনের একটি ভয়ঙ্কর ও পরিকল্পিত ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে সে সময়ই ব্যাপক সমালোচনা হয়। কিন্তু জোট সরকার বইটি বাজার থেকে তুলে নেয়নি কিংবা সমালোচনারও মূল্য দেয়নি।

পাকিস্তান থেকে বাংবলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস আমাদের সংবিধান ও অন্যান্য দলিলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এটাও উল্লেখ আছে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময়ই অস্থায়ী সরকারের সব কার্যক্রমকে আইনগত বৈধতা দেয়া হয়েছে। কাজেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রাষ্ট্রের আইনসিদ্ধ সংবিধানিক দলিল। সে দলিল অনুযায়ীই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক। কাজেই ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন—এ প্রশ্ন অবান্তর। এ প্রসঙ্গে আদালত মন্তব্য করেন, যারা ইতিহাস বিকৃতির এই কাজটি করেছেন তারা সংবিধান আইন লঙ্ঘন করে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছেন। স্বাধীনতার ইতিহাস প্রতিটি জাতির অমূল্য সম্পদ। স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস প্রতিটি নাগরিকের জানার অধিকার রয়েছে। স্বাধীনতার ইতিহাসকে এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করে বা নতুন করে লিখে যারা নতুন প্রজন্মকে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছে, তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। সংবিধান বিরোধী, গণবিরোধী ও কাজগুলো যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থ্য নেয়া বর্তমান মুক্তিযুদ্ধপন্থী সরকারের কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

আমার বিশ্বাস এ রায় জাতির ইতিহাসকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে প্রতিফলকের কাজ করবে। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছে তা বিকৃত করার যে অপচেষ্টা চালিয়েছিল এ রায়ের মাধ্যমে তার অবসান হবে।

একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন, একটি দেশের বা কোনো জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা নিছকই কেবল কোনো ঘোষণাতে হয় না, হতে পারে না। এর পেছনে ধারাবাহিক অন্দোলন,সংগ্রাম থাকে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনেও এ সত্যের ব্যত্যয় ঘটেনি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে মেতে ওঠে নানা ষড়যন্ত্রে। এ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার জনগণ তৈরি হয় চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর এ তাৎপর্যপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক ভাষণের পর সারাদেশে শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ। দানা বেঁধে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সৈনাবাহিনী। নির্বিচারে হত্যা করে তারা অগণিত মানুষকে।

২৫ মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে বঙ্গন্ধুকে। গ্রেফতার হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগেই বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার হয়ে যায় তৎকালীন ইপিআরের ওয়ারলেসযোগে। ইপিআর ওয়্যারলেসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেয়া হয় বঙ্গবন্ধুর সে ঘোষণা। চট্টগ্রাম বেতার থেকে সে ঘোষণা পাঠ করেন সেদিনকার শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। গুরুত্বপূর্ণ এই রায়টিতে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের অবিকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের গণআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদেশের সাধারণ মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। রায়ে টেলিগ্রাফ, স্টেটসম্যান, ডন এবং ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসসহ বিভিন্ন বিদেশি পত্রিকারও উদাহরণ দেয়া হয়। রায়ে জিয়াউর রহমানের নিজের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, তিনি নিজেও কখনও নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করেননি।

বিএনপি দলটিতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন। কিন্তু এসব মুক্তিযোদ্ধা নীতিনির্ধারণে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী দলের সঙ্গে এক হয়ে ক্ষমতায় এসে বিএনপির রাজনীতিতে পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদী জামায়াতের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। দলটির নীতিনির্ধারকরা যতো দ্রুত ও সত্যটি উপলব্ধি করবেন ততোই মঙ্গল।

একটি ঐতিহাসিক সত্যের পক্ষে রায় দেয়ার জন্য বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন। এই দু'জন বিচারক সম্প্রতি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক কাজ সম্পাদন করেছেন। তারা ১৯৭১ সালের রেসকোর্স ময়দান, আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান যেখান থেকে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ রাখেন এবং যেখানে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে—এ ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। আমার বিশ্বাস এ রায় নতুন প্রজন্মকে পরিকল্পিত ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

স্বাধীনতার ঘোষণা একটি সমীক্ষা

সেকেন্দার মতিউর রহমান

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে পড়লাম, বিএনপি মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বর্ণনা করে একটি সিডি বের করেছে। কিন্তু এই দাবিটি অলীক ধারণাপ্রসূত এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটা নির্ধারণ করা আবশ্যক যে, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন? মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম—এর ওপর একটি আলোচনা বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়েছিল। ওই আলোচনায় সাংবাদিক আতাউস সামাদ, আফসান চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল ফারুক, ড. আনোয়ারুল হক, ড. কামাল হোসেন, বদরুদ্দীন উমর, শাজাহান সিরাজ, আমিনুল হক বাদশা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯-১২-১৯৯৪ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজে ওই আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এখন দেখা যাক ওই আলোচনায় স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে কী তথ্য পাওয়া যায়? ওই আলোচনায় আতাউস সামাদ বলছেন, 'আমি যখন শেখ সাহেবকে ক্র্যাকডাউনের সম্ভাবনার কথা বললাম এবং আমার সূত্রের কথা বললাম তখন উনি বললেন, হ্যাঁ আমরাও শুনেছি যে, হতে পারে। তখন আমি ওনাকে বললাম, কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। ঢাকার লোকজনকে খবর দিন যেন ওরা পালিয়ে যায়। উনি বললেন, ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি বললাম, 'কী ব্যবস্থা হচ্ছে'? উনি বললেন, আওয়ামী লীগের ভলান্টিয়ারদের বলে দেয়া হয়েছে চারিদিকে ব্যারিকেড তৈরি করতে। আমি জ্বি আচ্ছা বলে বেরোবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই শেখ সাহেব আমার মাথার কাছে মুখ এনে বললেন, I have given you independence, now go and preserve it. আতাউস সামাদ আরও বলেন, 'এটা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাসার ঘটনা। এছাড়াও ২৫ মার্চ সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টার মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাটি তৈরি করা হয়েছিল। পাকিস্তানিরা পিলখানায় East pakistan Rifles (EPR)-এর বাঙালি সদস্যদের আক্রমণ করার পর পর শেখ মুজিবের নামে ইপিআর-এর ওয়্যারলেসে এটি প্রচার করা হয়

টেলিফোন/টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেয়ার আগে। টেলিগ্রাফের অফিস থেকে বাংলাদেশের সব জেলা, মহকুমা এবং অন্যত্র এই ঘোষণাটি পাঠানো হয়। ঘোষণাটি বর্ণনা করা হলো—This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on and till the last soldier of the pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Joy Bangla.

১৬/০৩/০১ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা ঘোষণা নামীয় নিবন্ধে সরদার সিরাজুল ইসলাম এই মর্মে উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৫ দিন পর বঙ্গবন্ধু নিউইয়র্ক টাইমসের বিশেষ প্রতিনিধি সিডনি শেওনবার্গের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্বাধীনতা ঘোষণা রেকর্ড করা হয়েছিল বলে প্রকাশ করেন (নিউইয়র্ক টাইমস, ১৬-১-৭২)। জনাব ইসলাম আরও উল্লেখ করেন, আওয়ামী লীগ বিরোধী পাঁচদলীয় নেতা নির্মল সেন তার নিজের এলাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি সচক্ষে দেখেছেন। বরিশালের ইতিহাস গ্রন্থের ৫৩২-৫৩৩ পৃষ্ঠায় গবেষক সিরাজুদ্দিন আহমদ লিখেছেন, ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার তারবার্তা ২৬ মার্চ বাংলাদেশের সব জেলায় পৌঁছে যায়। বরিশালে এ তারবার্তা নুরুল ইসলাম মঞ্জুর পান এবং তিনি তারবার্তার অনুলিপি পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুরে পাঠিয়ে দেন। ২৬ মার্চ সকালে নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক মঞ্জুরুল করিম নিজে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র মালেক উকিলের কাছে হস্তান্তর করেন। ওই নিবন্ধে সরদার সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেন, ড. আকবর আলি খান বলেন, আমি কিন্তু ২৬ মার্চ সকালেই স্বাধীনতা ঘোষণা সংক্রান্ত টেলিগ্রাম পাই। স্বাক্ষর স্থলে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। উল্লেখ্য, আকবর আলি খান তখন হবিগঞ্জের এসডিও ছিলেন। চট্টগ্রামে কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাপত্র পাঠ ও প্রচার করেছিলেন ২৬ মার্চ বেলা পৌনে ২টায়। সান্ধ্য-অধিবেশনে এমএ হান্নান নিজের নাম ঘোষণা ছাড়াই দ্বিতীয়বার নিজের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। ওই সান্ধ্য-অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন ফটিকছড়ি কলেজের সহ-

অধ্যক্ষ আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার অনুবৃত্তিক্রমে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মুজিব নগরে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। ওই ঘোষণাপত্রে বলা হয়, যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন

এবং

যেহেতু আহুত এই পরিষদ স্বেচ্ছায় এবং বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন

এবং

যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ এই মর্মে সমাপ্ত করেন যে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউজউইক ৫ এপ্রিল ১৯৭১-এ প্রকাশিত সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রচ্ছদে ছাপিয়ে তাকে 'রাজনীতির কবি' আখ্যা দেয় এবং জানায়, তিনি গত সপ্তাহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

উপরন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ২৬ মার্চ রেডিওতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে 'বিচ্ছিন্নতা' আন্দোলনের জন্য এককভাবে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগকে দায়ী করেছেন। মেজর জিয়াকে তিনি দায়ী করেননি। উক্ত বক্তৃতার সেই অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

I should have taken action against Sheikh Mujibur Rahman and his collaborators weeks ago but I had to try my

utmost to handle the situation in such a manner as not to jeopardise my plan of peaceful transfer of power. In my keenness to achieve the aim. I kept on tolerating one illegal act after another and at the sametime I explored every possible avenue for arriving at some reasonable solution. I have already mentioned the efforts made by me and various political jeaders in getting Sheikh Mujibur Rahman to see reason. We have left no stone unturned. But he has failed to respond in any constructive manner on the other hand, he and his followers kept on flouting the authority of the government even during my presence in Dacca. The proclamation that he proposed was nothing but a trap. He knew that it would not hve been worth the paper it was written on an in the vaccum created by the lifting of Martial law he could have done anything with impunity. His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion the man and his party are enemies of pakistan and they want East pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country, this crime will not go unpunished.

(সূত্র : White paper on the crisis in East Pakistan Appendix-A, page 13 Published by the Ministry of Information and national Affairs, Government of Pakistan on 5th August, 1971).

উপরে বর্ণিত তথ্যগুলো থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

অপরপক্ষে এক্ষেত্রে মেজর জিয়ার অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে যদিও বিএনপি তাকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে চিত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। যা হোক, এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা একটু বর্ণনা করি। ওই সময় আমি মেহেরপুর মহকুমায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত। ১৯৭১

সালের ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭-টার দিকে বাসায় বসে ফিলিপস ট্রানজিস্টারের নব ঘুরাচ্ছি। হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। এখনি মেজর জিয়া একটি ঘোষণা পাঠ করবেন। মেজর জিয়া ইংরেজি ভাষায় ঘোষণা করলেন, পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের (Provisional head of the state)-এর দায়িত্বভার নিয়েছেন। এর সত্যতা পাওয়া যাবে তৎকালীন মেজর রফিকুল ইসলামের বই A tale of millions-এর উদ্ধৃতি থেকে—'By that time, members of Awami League succeeded in contacting Major Zia who had moved out of the city to reorganize his troops. Many of my EPR troops joined him when they failed to join me in the city.

On the evening of March 27 he was persuaded to come to madnaghat and speak from the Free Bengal Radio. In his speech he declared himself as the Head of the state (Page 89-90) এ বক্তৃতা নিয়ে বিভ্রান্তিরসৃষ্টি হওয়ায় চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান নেতা এ কে খান হস্তক্ষেপ করেন যার ফলে মেজর জিয়া ২৮ মার্চ আর একটি ঘোষণা দেন যা নীচে বর্ণনা করা হলো :

The Government of the sovereign state of Bangladesh, on behalf of our great leader, the supreme commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh, and that the government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of seventy five million people of Bangladesh and that the Government headed by him is the only legitimate government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh which is legally and constitutionally formed and is worthy of being recognized by all the government of the world.

I therefore, appeal on behalf of our great leader Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the

democratic countries of the world, specially the big powers and the neighbouring countries to recognize the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan. To dub out the legally elected representatives of the majority of the people as secessionist is a crude joke and contradiction to truth which should befool none. The guiding principle of the bew state will be first neutrality, second peace and third friendship to all and enmity to none.

May Allah help us. Joy Bangla.

(সূত্র : শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর)

উপরিউক্ত বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণাটি দিয়েছেন তাও আবার ২৮ মার্চ তারিখে। একজন মেজর রেডিওতে একটি ঘোষণা দিলেন আর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এমনটি ভাবা অলীক ধারণা প্রসূত। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করেন আর তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মেজর জিয়া মুজিব নগর সরকারের অধীনে একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মাত্র। এছাড়া মরহুম জিয়াউর রহমান ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'একটি জাতির জন্ম' শীর্ষক নিবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো। উপরন্তু এই নিবন্ধে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এই নিবন্ধে বা তার জীবদ্দশায় জিয়াউর রহমান কখনও নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক রূপে দাবি করেননি। একটা লঘু উপমা দিতে চাচ্ছি। রংপুর জিলা স্কুলে পড়ার সময় দেখেছি দফতরি ধানকি ঘণ্টা বাজালে ক্লাস শুরু হতো এবং শেষ প্রহরে ঘণ্টা বাজালে স্কুল ছুটি হতো। তাই বলে ধানকিকে আমরা কখনও স্কুলের হেডমাস্টার বলে ভাবিনি।

সুতরাং সার্বিক বিশ্লেষণের পর একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, বিএনপি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রচেষ্টা বা অপচেষ্টা চালাচ্ছে তা কখনই ফলপ্রসূ হবে না।

তথ্যপ্রমাণের আলোকে স্বাধীনতার ঘোষণা

সাখাওয়াৎ আনসারী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে মাঝে মধ্যেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। স্বাধীনতার তিনযুগ পরও তা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। বিতর্ক নতুন করে সৃজন নয়, অবসানের লক্ষ্যেই এ লেখা।

প্রস্তাবনা, এগারো ভাগের ১৫৩ টি অনুচ্ছেদের চারটি তফসিল সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের সংবিধান। দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্তির ফলে যে তিনটি তফসিল বর্তমানে রয়েছে, সেগুলো ৪৭, ১৪৮ এবং ১৫০ অনুচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ মাত্র। চতুর্থ তফসিলের পর রয়েছে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' (২৬ জানুয়ারি ১৯৯৯ -এর মুদ্রণ দ্রষ্টব্য)। এ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, ... বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। .. এই ঘোষণাপত্রের অন্যত্র আবারো বলা হয়েছে, .. এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম...। ঘোষণাপত্রের শেষদিকে বলা হয়েছে, . বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণাপত্রের অন্যত্র আবারো বলা হয়েছে ... এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম...। ঘোষণাপত্রের শেষদিকে বলা হযেছে ... স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। এ ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে নিম্নের বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়েছে : ১. শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন, ২. এ ঘোষণা হয়েছে ২৬ মার্চ, '৭১ তারিখে, ৩. ঘোষণা করা হয়েছে যথাযথভাবে এবং ৪. স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ হওয়ায়

এই ঘোষণাপত্র ২৬ মার্চ থেকেই কার্যকর। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এ ঘোষণাপত্র অনুযায়ী স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পূর্ণ অবিতর্কিত। তবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং চারটি তফসিলের অতিরিক্ত (বিভিন্ন মুদ্রণে প্রথম পরিশিষ্ট) হিসেবে সন্নিবেশের ফলে অনেকেই বলতে পারেন এটি সংবিধানের অংশ নয় এবং যা সংবিধানের অংশ নয়, তার মাধ্যমে ২৬ মার্চের শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষণাকে বৈধতা দেওয়া যায় না। আমাদের বক্তব্য এ ঘোষণাপত্র সংবিধানের অংশ নয় সত্য, তারপরও এ ঘোষণা সবিধান কর্তৃকই স্বীকৃত। চতুর্থ তফসিলে সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যেই প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র... আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল। অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং তর্কাতীত। স্বাধীনতার এ ঘোষণাপত্র সম্পর্কে আরো কিছু কথা প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর রচিত এবং বিধিবদ্ধ এ সংবিধানটি একই বছরের ১৬ দিসেম্বর থেকে বলবত হয়। সুতরাং একটি জরুরি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক আর তা হলো, যদি ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ পর্যন্ত দেশ কোনো সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হযেছে? এর উত্তর হলো ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করার অর্থ হলো ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে তথা তৎকালীন অস্থায়ী সংবিধানকে অস্বীকার করা এবং বর্তমান সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ মতে বর্তমান সংবিধানকে অস্বীকার করা।

এবার আমরা ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে স্বাধীনতার ঘোষণাকে বিচারের চেষ্টা করব। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান ধানমন্ডির নিজ বাসভবন লেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ইংরেজিতে রচিত এ ঘোষণাপত্রটি নিম্নরূপ :

Declaration of War of Independence. Pak Army suddenly attacked E.PR Rase at Pilkhana, Rajarbag Police Line and killing citizens. Street battleare going on in every street of Dacca-Chittagong. I appeal to the Nations of the world for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the

enemies to free the motherland. I appeal and order your all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, EPR Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight. No compromise Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland. Convey this message to all Awami Legue Leaders, workers and otehr patriots and lovers of freedom. May Allah bless you. Joy Bangla.

(মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৬৪৫)।

এ ঘোষণায় সন্দেহ পোষণের যে কোনোই কারণ নেই তার পক্ষে আমরা দুটি প্রমাণ উপস্থাপন করব। প্রথমটি সিদ্দিক সালিকের ভাষ্য। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী এই সিদ্দিক সালিক পাকিস্তান আর্মির জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যুদ্ধকালে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন, যুদ্ধবন্দি হয়ে ভারতে ছিলেন। তৎসরকারের একান্ত বশংবদ এই কর্মকর্তা লিখেছেন, When the first shot had been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through an wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been and sounded like, a prerecorded message, sheikh proclaimed East Pakistan to be the peoples Republic of Bangladesh. (Siddiq Salik, Witness to surrender : Karachi, Oxford University press' 1977, 9.75). প্রথম গুলিটি ছোড়ার অব্যবহিত পরই যদি সিদ্দিক সালিক শেখ মুজিবের দৃপ্ত ঘোষণা শুনে থাকেন, যা তিনি উল্লেখ করেছেন বিতর্ক সৃষ্টির বহুবছর আগে ১৯৭৭ সালে, স্বাধীনতা ঘোষণার পরদিনের অর্থাৎ ২৭ মার্চের The Statesman পত্রিকা যদি মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বেতার সংবাদের উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে পারে, তাহলে সন্দেহ পোষণের কি বিন্দুমাত্রও অবকাশ থাকে? এবার জিয়াউর রহমান প্রসঙ্গ। শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে এমএ হাকিম, মোঃ জালাল আহমেদ, জুলহাস উদ্দীন, মোঃ শফিকুল ইসলাম, আবুল কাশেম খান এবং আবুল ফজল ওই ছয়জনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে অবিকল ইংরেজিতে ২৬ মার্চ সকালেই পৌঁছে যায় (মযহারুল ইসলাম,

পূর্বোক্ত, পৃ-৬৪৬)। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ হান্নান ঘোষণাটির বাংলা অনুবাদ করে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে পড়ে শোনান। তিনি দ্বিতীয়বার বঙ্গানুবাদটি পাঠ করেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশনেও, বিকেলে। এরপর আরো কয়েকজন, যাদের একজন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ পড়ে শোনান। জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চ সারাদিন চট্টগ্রামের ষোলশহরে দাফতরিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারার জন্য মেজর জিয়ার সাহায্য কামনা করা হলে তিনি সানন্দ সম্মতি দেন। ২৭ মার্চ সকাল বেলায় তাকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। এই বেতার কেন্দ্র পরিচালনায় বেলাল মোহাম্মদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার সঙ্গে আলোচনায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। পরদিন ২৮ মার্চ সকালে জিয়াউর রহমান নিজেকে Provisional Head of Bangladesh উল্লেখ করে আরো একটি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই দ্বিতীয় ঘোষণায় চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হলে তিনি ২৯ মার্চ তৃতীয় ঘোষণাটি প্রদান করেন। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান নামটি একাধিকবার উল্লিখিত হয়। ঘোষণাটি প্রচারিত হয় ওই দিনের তিনটি অধিবেশনেই (বেলাল মোহাম্মদ 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' আজকের কাগজ, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯১)। সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান লে. জে. মীর শওকত আলী (অব.) বীরউত্তম ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা সম্পর্কে লিখেছেন, জিয়া জানালেন, কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে আমাদের বিদ্রোহ আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। মীর শওকত আলী আরো জানাচ্ছেন, ওই ঘোষণাটিই ৩০ মার্চ পর্যন্ত রেডিও স্টেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন বেশ কয়েকবার পাঠ করেছিলেন, (মুক্তিযুদ্ধের সূচনা : প্রথম প্রতিরোধ, দৈনিক যুগান্তর, ২৬ মার্চ, ২০০১)।

ওপরের আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ২৬ মার্চের এ ঘোষণাটি বঙ্গানুবাদ করে দুবার পাঠ করেছিলেন এমএ হান্নান। সেদিনই এ ঘোষণাটি আরো অনেকের সঙ্গে পাঠ করেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। ২৭, ২৮ এবং ২৯ মার্চ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন (দ্বিতীয়বার নিজেকে Provisional Head of Bangladesh উল্লেখ করে)। তার ঘোষণাটিই ৩০ মার্চ পর্যন্ত বেশ ক'বার

পাঠ করেছিলেন লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন। অর্থাৎ জিয়াউর রহমানের ঘোষণা কোনোভাবেই ২৬ মার্চে নয়। তিনি তার জীবদ্দশায় কখনো তা দাবিও করেননি। এমনকি তিনি ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালের ভাষণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা পরদিনের দৈনিক বাংলায় ভাষণের পূর্ণবিবরণ হিসেবে ছাপা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাকে অস্বীকার করা হলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে তথা অস্থায়ী সংবিধানকে অস্বীকার করা হয় ১৫০ অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ তফসিল লঙ্ঘন করে বর্তমান সংবিধানকেও অস্বীকার করা হয়। লঙ্ঘন করা হয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ২(ক) অনুচ্ছেদও। জিয়াউর রহমানের ঘোষণাকে যদি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তাহলে বাংলাদেশের জন্মই পিছিয়ে যায় একদিন, ২৬ মার্চ নয়, ২৭ মার্চ। এ-ও সংবিধানের প্রস্তাবনা, ২(ক) ... ও ১৫০ অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ তফসিলের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটা লঙ্ঘন করে জীবৎকালে জিয়াউর রহমানও নিজেকে কলঙ্কিত করেননি।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্বীকার করা মানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা

শাহরিয়ার কবির

আজ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ৩৮তম বার্ষিকী। ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী এক অনন্যসাধারণ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের । এই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের তিরিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন, সোয়া চার লাখ নারী চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ করে প্রতিবেশী ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, দেশের অভ্যন্তরে কয়েক কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হয়ে সন্ত্রস্ত জীবনযাপন করেছেন এবং শত-সহস্র জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে। স্বাধীনতার জন্য এত চরম মূল্য আর কোনো জাতিকে দিতে হয়নি।

১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। একই দিন প্রণীত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার বৈধতা অর্জন করে এবং এরই ভিত্তিতে পরিচালিত হয় নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, যে যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিনের অস্থায়ী সরকার, যা মুজিবনগর সরকার হিসেবে অধিক পরিচিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাপত্রের খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেছেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও তৎকালীন জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্য ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আদলে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেছেন, যা অনুমোদন করেছেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা। পৃথিবীর খুব কমসংখ্যক দেশই আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের আইনি ভিত্তি স্থাপন করেছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, কোনো প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা কী রকম হবে, স্বাধীনতার ঘোষক কে এবং কখন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পটভূমি এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে ১০ এপ্রিলের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে—যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদানকারী মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আরো বলেছে—'যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ থেকে এই ঘোষণাপত্র কার্যকর হবে। এই ঘোষণাপত্রের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিনই (১১ জানুয়ারি, ১৯৭২) অস্থায়ী সংবিধান ঘোষণা করেন, যার ভিত্তিতে '৭২-এর ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। যে কারণে আমরা বলতে পারি ১০ এপ্রিল প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তা অস্বীকার করা। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা কোনো দল যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্বীকার করে সে বাংলাদেশের

নাগরিক হওয়ার যোগ্য নয়। বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যদি এই ঘোষণাপত্র অস্বীকার করে তাকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশের কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তা অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

১৯৭১ সালে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, যারা গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে তারা তাদের অপরাধ বৈধ করার জন্য বলে '৭১-এ বাংলাদেশে কোনো স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়নি, ওটা ছিল গৃহযুদ্ধ। তাদের কাছে ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্তিত্বহীন। তারা মনে করে '৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব ছিল না। তাদের বিবেচনায় এই সময় যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন তারা দুস্কৃতকারী, পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন এবং তাদের হত্যা করা জায়েজ। যারা এ ধরনের কথা বলে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকার করে না। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে—'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া... স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক গৃহীত ও ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' বাংলাদেশের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত ... সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ... এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

২০০১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিএনপি ক্ষমতায় এসে সংবিধান থেকে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' বাদ দিয়ে নতুন সংবিধান ছেপেছিল। এর আগে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধানের চার মূলনীতি সংশোধন করে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দিয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চায়নি বলেই '৭১-এর ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাতে ইসলামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বুকে নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছে। যুদ্ধাপরাধ ছাড়াও '৭১ -এ বাংলাদেশের বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য জামায়াতকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দণ্ড প্রদান

করা যায়। একইভাবে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য জামাতের শীর্ষ নেতাদের সামরিক আদালতেও বিচার করা যায়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী আওয়ামী লীগ ও মহাজোট সরকারের কাছে আমাদের দাবি—অবিলম্বে '৭২-এর সংবিধানের বাতিলকৃত মূলনীতিগুলো এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে সংযোজন করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম অস্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অগ্রাহ্যকারীদের যাতে দেশদ্রোহিতার অপরাধে বিচার ও শাস্তি দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি করা হলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনেক বিতর্ক, ইতিহাস বিকৃতি এবং জঙ্গি মৌলবাদীদের সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য থেকে দেশ ও জাতি মুক্তি পাবে।

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

আবুল খায়ের

ছাব্বিশে মার্চ ও ষোলই ডিসেম্বর যেন এক সূত্রে গাঁথা আর এই সূত্রের সেতুবন্ধ হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। বিজয়ের বীজ রোপণ এবং স্বাধীনতা ঘোষণার অনুমোদন রয়েছে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। ঘোষণাপত্রটি অনুমোদিত হয়েছিল বাংলাদেশ গণপরিষদে। গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতেই উল্লেখ আছে, আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ... মার্চ মাসের ২৬ তারিখে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি কে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ৫ নম্বর প্যারায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে ,.. বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। লক্ষণীয় যে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন বলতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র অর্জন, আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠা বলতে সাংবাদিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাটিই সাংবিধানিক ও বৈধ। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের অর্জন সার্বজনীন ভোটাধিকার পাওয়ার প্রথম সুযোগেই সত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বাংলার মানুষ তাদের প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ ও প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। এই নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১০ ও ৭০.৪৮ শতাংশের গণরায়ে বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হিসেবে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যা আছে বিমূর্ত

আকারে, ঘোষণাপত্রে তা আছে মূর্ততায়। ঘোষণাপত্র হচ্ছে সংবিধানের ভ্রূণাবস্থা, ঘোষণাপত্রের বিকশিত ও বর্ধিত রূপই হচ্ছে সংবিধান। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মসনদ হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। তাই বাঙালি জাতির জাতীয় ইতিহাসে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক সুনিয়মিত ধারাবাহিক বিকাশ এবং একটি সাংবিধানিক উৎস। এই সাংবিধানিক উৎসস্থল হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং অনুচ্ছেদ ১-এ যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি' এবং .. প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ যে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট হবে, এই ঘোষণাটি ঘোষণাপত্রের ১১ নম্বর প্যারায় ঘোষিত হয়েছে, যেহেতু আমরা বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি। বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার এই যে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন তা রাষ্ট্র-উদ্ভবের তথা সাংবিধানিক বিকাশের বিধিবদ্ধ বৈধ ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করার পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক, বিধানিক, সর্বোপরি শাসনতান্ত্রিক রূপরেখাও নির্দেশ করে। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্রের ন্যায়নীতিবহির্ভূত, স্বেচ্ছাচার ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা; এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনতার সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। ৩ মার্চ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে আহূত পরিষদ অধিবেশন একতরফাভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতকরণ। লক্ষ মানুষের মহাসমাবেশে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর ৮ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের রক্তঝরা দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলি। এবং পঁচিশে মার্চ কালোরাতে নজিরবিহীন গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন'। ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে গণপ্রতিনিধিদের সমাবেশে গণপরিষদ গঠন। স্বাধীনতার ঘোষণার

অনুমোদন। প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি—সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রণয়ন। স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের রূপকাঠামো ও ক্ষমতা নির্দেশ। এবং বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত মানবাধিকারের সার্বজনীন সনদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা। এ সবই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উচ্চারিত শপথমন্ত্র। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে গণপ্রতিনিধিদের সমবেত কণ্ঠে, জাতীয় মুক্তির অনুভূতি ঘোষণাপত্রের আধারে একই তাল-লয়ে উচ্চারিত হয়ে মননে এবং চেতনায় যে অনুরণন, যে সুরমূর্ছনা তৈরি করে তা এক কথায় অতুলনীয়।

প্রজাতন্ত্রের সূচনালয়ে এই দলিলটি রাজনৈতিক বৈধতার একটি শক্ত ভিত হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের জন্য প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে গৌরব বহন করবে। রাজনৈতিক সাহিত্যের তথা দলিলের যেসব অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে অর্থাৎ এর অক্ষরমালা শব্দসমষ্টি, বাক্যবিন্যাস, অনুচ্ছেদ, ভাষাগত রচনাশৈলী, বক্তব্যের অখণ্ডতা, পূর্ণাঙ্গতা, রচনাকৌশল, আবেগ-অলংকরণ, মৌলিকত্ব, বর্ণনাত্মক ভঙ্গি, শিল্পরীতি, ইতিহাস চিত্রণ, পরিস্থিতি চিত্রণ- এর সবই জাতীয় আবেগ মন্থন করে কর্তৃত্বব্যঞ্জক অধিকারিত্বে ঘোষণাপত্রে বিদ্যমান। ঘোষণাপত্রটি অপূর্ণ থেকে যেতো যদি আবেগ, সাংবিধানিক অভিব্যক্তি, বেদনা, উচ্ছ্বাস, অহংকার, কপটতা, ছলনা, ষড়যন্ত্র, বৈষম্য ও চক্রান্তের বিষয়গুলো মূর্ত নির্দিষ্ট না হতো। ঘোষণাপত্রের বক্তব্য অত্যন্ত সুসংগঠিত, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যবাহক এবং ইতিহাস সচেতন। এর সাহিত্যশৈলী ও আলংকারিক শব্দবর্ণনালী সমগ্র জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে মানসকাঠামোতে ধারণ এবং নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালির বীরত্ব ও সাহসিকতাকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করে।

মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক যে নবীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘোষিত হয় এবং এর ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তার বৈধ দলিল হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। বাঙালি জাতির রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ও অখণ্ড প্রকাশ এই ঘোষণাপত্র।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, মানবিক মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখতে, মানুষে মানুষে সাম্যের জয়গানে ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অঙ্গীকারে পুরো জাতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল একস্থানে, একসময়ে এবং একটি দলিলে, ঐতিহাসিক মুজিবনগরে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে।

স্বাধীনতা ঘোষণা দিবসের স্মৃতি একাত্তরে আমেরিকায়

আবুল মাল আবদুল মুহিত

স্বাধীনতা ঘোষণা দিবস ছিল একাত্তরের ২৬ মার্চ। বাংলাদেশে চিত্রটি ছিল অসাধারণ। ঢাকার বাস্তবতা ছিল নিরস্ত্র জনতার ওপর একটি দস্যুবাহিনীর ভয়াবহ এক আক্রমণ। তাই দিনের শুরু থেকেই (অর্থাৎ মধ্যরাত) ছিল কামান, বোমা ও গোলাগুলির বিকট আওয়াজ, নানা এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা এবং আক্রান্ত; পলায়নপর অথবা মৃত্যুপথযাত্রী অগণিত মানুষের ছুটোছুটি, কান্না ও হাহাকার। দেশের অন্যত্র ছিল কিন্তু ভিন্ন অবস্থান। প্রায় প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে (প্রায় ৫৪টিতে) ছিল সার্থক প্রতিরোধ, গভীর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় আশাবাদ। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আমরা ঠিক সেই সময়ে (২৫ মার্চের মধ্যদিনে) অন্য জগতে ছিলাম। দারুণভাবে আশাবাদী ও স্বশাসনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ২৫ মার্চের ওয়াশিংটন পোস্ট দৈনিকে শিরোনাম ছিল Pakistan Talks Hit Deadlock : 35 Killed as Violence Flares up . আবার আর একটি খবর ছিল complete Agreement Reported in pakistani Political Discussion. প্রথম প্রতিবেদন ছিল সেলিগ হ্যারিসনের ঢাকা থেকে আর দ্বিতীয়টি ছিল ইউপিআই-এর করাচি থেকে। বিভ্রান্তিমূলক বটে কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে মুজিব-ইয়াহিয়া সংলাপ সফল হবে। বিদেশি খবরের কাগজে যে সব খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল যে সমঝোতা একটি হয়েই যাবে। ভুট্টো তো কসাইখানায় যাবে না বলেছিলেন তবুও তিনি সংলাপে যোগ দিলেন। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এম এম আহমেদেরও তলব হলো এবং সর্বশেষে আইনি ফয়সালা দেবার জন্য এ কে ব্রোহি গেলেন। সব আলামত ছিল আশাপ্রদ। আবার নিউইয়র্ক টাইমস ২৫ শেতে বলেই বসলো Pakistani leaders reported in accord আর সেই খবরের সূত্র ছিল করাচি। আশঙ্কা যে একেবারে ছিল না তা নয় এবং তার কারণ ছিল আমাদের রাষ্ট্রদূত আগা হিলাহির অভিমত। তিনি নির্বাচনের পর দেশে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ এবং পিপলস পার্টিকে

কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে এবং ভুট্টোকে অন্তত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে হবে। তার বক্তব্যে মনে হলো অন্যরকম ষড়যন্ত্র চলছে এবং সেজন্য একটি সুষ্ঠু সমাধান নিয়ে খানিকটা দ্বিধাবোধ ছিল।

আমার ব্যক্তিগত প্রত্যাশার ভিত্তি ছিল বেশ কটি উপাদান। প্রথম, সত্তরের ১২ নভেম্বরের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ছয়দফা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। ২২০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হলো আর ৯ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস হলো। অথচ ১৪ নভেম্বরে পাকিস্তানের হর্তাকর্তা বিধাতা জেনারেল ইয়াহিয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার দাওয়াই পরিদর্শন করে তার দায়িত্ব সমাধা করলেন। বিদেশি জাহাজ এসে লাখ লাখ শবদেহ উদ্ধার করল। অথচ অবশেষে দশদিন পর ২১ নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি জাতীয় দুর্যোগের ঘোষণা দিলেন। এই যে অবহেলা এবং অনাগ্রহ তার সমাধান তো হলো স্বশাসন। দ্বিতীয়, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগের বিজয়টি ছিল এ জন্যই আশাতীত। ছয়দফা তো তাতে জাতির ম্যান্ডেট হয়ে দাঁড়ালো। ৩১৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৬৭ জনের জন্য ছয়দফা ছিল ম্যান্ডেট এবং আরো প্রায় চল্লিশ সদস্য তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভুট্টোর হুমকির পরেও এতোজন সদস্য ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় আসেন সংসদ অধিবেশনে অংশ নিতে। আমার আশাবাদের তৃতীয় উপাদান বিশেষ বিশ্লেষণের দাবি রোখে। দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সেলর হিসেবে আমি বসতাম মূল দালানের তৃতীয় তলায়। সেখানে আরো বসতেন আমার অর্থনৈতিক মিনিস্টার এ আর বশির এবং তথ্য ও জনসংযোগ কাউন্সেলর এস এন কুতুব। মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা প্রায় প্রতিদিন দিবাশেষে আলোচনায় বসতাম। তাতে আরো কিছু সহকারী যোগ দিতেন। আমার নিজের দপ্তরে ছিলেন তিনজন। সার বিষয়ক প্রথম সচিব কর্নেল হক নওয়াজ, খাদ্যবিষয়ক তৃতীয় সচিব ইকরামুল্লাহ খান এবং হিসাব বিষয়ক তৃতীয় সচিব আতাউর রহমান চৌধুরী। আরো আসতেন প্রায়ই নেভি এটর্নি কমান্ডার হাশমি এবং মাঝে মাঝে কূটনৈতিক দ্বিতীয় সচিব মনসুর আলম।

আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর আলোচনা করতাম। ছয়দফা মানতে হবে সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে ছিল মতৈক্য। প্রশ্ন ছিল দুটি। এক, কেন্দ্রীয় সরকারের খরচের জন্য তাকে কি স্বাবলম্বী করা যায় না? আর দুই, দূতাবাস একটি রেখেই তো তাতে দুইটি বিভাগ (উইং) গড়ে তোলা যায়। এই ধরনের ঐকমত্যের কারণে আমার প্রত্যাশা ছিল যে সমাধান হবেই। মার্চের শুরুতে খানিকটা হতাশা জন্মে তবে জেনারেল ইয়াহিয়া যখন ঢাকায় সংলাপে রাজি

হলেন তখন মনে হলো আর কোনো ভয় নেই। আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন স্বপ্ন বুনছি। বাংলাদেশ অর্থনীতির ওপর একটি প্রবন্ধই রচনা করে বসলাম। পরবর্তী সময়ে এর ওপর নির্ভর করে উপসংহার টানলাম যে বাংলাদেশ ভিক্ষার ঝুলি হবে না। সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সিনেট রেফুইজি সাবকমিটির শুনানির বিবরণে ১৯৭২ সালে। Relief & Rehanbilitation Problems of Bangladesh.

বাংলাদেশে যে অপারেশন সার্চলাইট (গণহত্যা ও গণধ্বংস) পঁচিশে দুপুরে শুরু হয়ে গেছে ওয়াশিংটনে সেই খবরটি আমরা পেলাম ২৬শের ভোর রাতে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশের ডেস্ক অফিসার ক্রেইগ ব্যাক্সটার (সদ্য প্রয়াত) রাত তিন/চারটায় রেডিওতে সম্প্রচার শুনতে বললেন। আমাদের বাড়িতে কোনো রেডিও ছিল না তাই শীতের সকালে জোব্বাজাব্বা পরে আমরা স্বামী-স্ত্রী গাড়িতে গিয়ে বসলাম রেডিও শুনতে। রেডিওতে আমরা শুনলাম যে সংলাপ বাতিল করে জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে যান ২৫ মার্চে আর মধ্যরাতে শুরু হয় বাংলাদেশের নৃশংস অবদমন। তিনি আরো জানালেন যে, দেশের সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী। আর বললেন যে রাষ্ট্রের ঐক্যও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তিনি বাংলাদেশে দস্যুবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন। আমাদের গায়ে শিহরণ জাগলো, ঢাকায় যে কী ভয়াবহতা বিরাজ করছে তা ভেবে আমরা একেবারে বাকহীন থ বনে গেলাম। গাড়ি ছাড়তে অনেকক্ষণ লাগলো। বেশ ভোরেই একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে মনোবেদনার উপশমের উদ্যোগ নিলাম। ছাব্বিশের দিনেই প্রতিরোধের খবর যখন আসতে শুরু করল তখন মনোভাব পুরো উল্টো মোড় নিলো। আমার মনে জাগলো দ্রোহ ও ক্ষোভ। সেদিন শুক্রবার দূতাবাস খোলা থাকলেও কাজ কিছুই হলো না, কোনো আসরও জমলো না এবং দপ্তর জুমার সময়ই প্রায় খালি হয়ে গেলো। ওয়াশিংটন দূতাবাসে আমরা বাঙালি ছিলাম বেশ কজন। মিশনের ডেপুটি ছিলেন মিনিস্টার এনায়েত করিম (প্রয়াত পররাষ্ট্র সচিব), কাউন্সেলর শা আ ম কিবরিয়া (শহীদ অর্থমন্ত্রী), কাউন্সেলর আবু রুশদ মতিন উদ্দিন, তৃতীয় সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (সাবেক পররাষ্ট্র সচিব), পূর্বোক্ত আ রহমান চৌধুরী (প্রয়াত প্রধান সামরিক হিসাব রক্ষক) এবং আমি। এ ছাড়া ছিলেন তিন স্থানীয় এটর্নি প্রয়াত শরফুল আলম, প্রয়াত রুস্তম আলী, আবদুর রাজ্জাক খান এবং আরো নয়জন কর্মচারী ওয়াশিংটনে তখন মোট বাঙালি অধিবাসীর সংখ্যা যারা পুত্রপরিবার নিয়ে ছিল প্রায় সত্তর জন। দূতাবাসের সমুদয় চাকুরে অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে শনিবারে ২৭শে বিকালে

আমরা সবাই সমবেত হবো আমার বাড়িতে, শহরতলি বেথেসডায় ৫০০৬-সুর লেনে। বাড়িটি পরবর্তীতে রিডিং রুম ও পার্কে পরিণত হয়েছে।

সাতাশে বিকালে আমরা সবাই সমবেত হলাম। সম্ভবত এক দুজন শুধু আসতে পারেননি। সাতাশেই ইতোমধ্যে খবর পৌছে গেছে অনেক। ওয়াশিংটন পোস্ট জানালো, Civil warfare breaks out in East Pakistan . নিউইয়র্ক টাইমস বলল—Armed rebellion is said to erupt in East Pakisan. ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার জানালো Freedom fight costing .... বাল্টিমোর সানের শিরোনাম হলো Mujib proclaims Bengal republic reproted আমরা জেনে গেলাম ঢাকা ছাড়া সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এবং চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দখলে। অবশ্যি অনেক পরে আমরা নিশ্চিত হই যে ঢাকায় ইপিআর (বর্তমানে বিডিআর) নিধন শুরু হলেও অন্যত্র পাঁচটি সেক্টরে এবং চৌদ্দটি উইং-এ প্রায় আট হাজার সৈন্য ও কতিপয় অফিসার প্রতিরোধে অংশ নেন। আমরা জানতে পারি যে আওয়ামী লীগের বিকেন্দ্রিত জেলা নেতৃত্ব (সদর মহকুমাগুলোকে নিয়ে ৫৪টি মহকুমায় ছিল আওয়ামী লীগের জেলা) সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে। আমরা আরো জ্ঞাত হই যে বাংলাদেশে নিয়োজিত আটটি বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৪০ জন অফিসার ও ৩০০০ সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ২৭তে এক ফাঁকে আমি নিজে নিজেই ওয়াশিংটনের বাঙালি সমাজ বনে গেলাম। আমি সমাজের পক্ষে তার বার্তা পাঠালাম কতিপয় শক্তিধর নেতাকে। আমার তারবার্তা গেলো প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্সের কাছে, জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের কাছে, বিশ্বব্যাংকের সভাপতি বরার্ট-ম্যাকনামাবার কাছে আর মুদ্রা তহবিলের নির্বাহী পরিচালক সোয়াইটজারের কাছে। আমার কাজে উৎসাহ দান ও সহায়তায় ছিলেন আমার স্ত্রী সাবিয়া আর সহযোগী বিশ্বব্যাংকের হারুন রশীদ। বিকালে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা সোমবারে ২৯ তারিখে ওয়াশিংটনে সারা মার্কিন দেশের বাঙালিরা সমাবেশ করবো। সকলের দায়িত্ব হলো সারা দেশে বাঙালিদের ডাক দেওয়া। কয়েকজন নিলেন পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি প্রস্তুতির কাজ। আরো কেউ নিলেন পুলিশের অনুমোদন গ্রহণ। জানিয়ে দেওয়া হলো যে যারা বাইরে থেকে আগে আসবেন তারা কয়েকটি আস্তানায় রাত কাটাবেন। কোথাও কোনো দ্বিধা নেই, শুধু দ্রোহ তার ক্ষোভ। তবে আমরা একটি কৌশলী সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক দিন একটি নাজুক অবস্থানে ছিলাম। আমরা ঠিক করলাম যে দূতাবাসের লোকেরা সমাবেশে যোগ দেবেন না। এজন্য আমাদের অনেক ধিক্কার সহ্য করতে হয়। এর অবসান হয় ৪ আগস্টে।

আটাশে থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে বাঙালিরা জড়ো হতে লাগলেন। সোদন রাতে আমার বাড়িতে থাকলেন ডেট্রোয়েট থেকে আগত সতেরজন দেশপ্রেমিক। এদের অনেকেই বহুবছর ধরে দেশে যাননি। নিউজার্সি থেকে অনেকে আসলেন যারা পঞ্চাশের দশকে বা তারও আগে প্রবাসী হয়েছেন। দেশের জন্য সে কি ভালোবাসা। প্রায় ৩০ বিক্ষোভকারী কেপিটল হিলের সিড়িতে পোস্টার, ব্যানার নিয়ে দাঁড়ালেন ২৯ তারিখের সকাল ১০ টার মধ্যেই। সকলের দাবি একটি । পাকিস্তানের ভয়াবহ সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে মার্কিন অস্ত্র বাবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন চাই। সেই যুগে নিরাপত্তা নিয়ে এতো ধকল ছিল না বলে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সর্বত্র চলতে পারতো। তিনটি জায়গায় হলো বিক্ষোভ প্রদর্শন। কেপিটল হিলে সবচেয়ে বেশি সময়, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে এবং মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের সামনে। কেপিটল হিলে একটু সমস্যা হয় যখন দূতাবাসের কর্মচারী গউসুদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের পতাকায় আগুন দেন। প্রকাশ্যে কোথাও আগুন জ্বলাতে অনুমোদন লাগে কিন্তু সেই অনুমোদন আমাদের ছিল না। আমাদের নোবেল বিজয়ী ড. ইউনুনূ টেনেসি থেকে এসে পোস্টার লিখেন আর বিক্ষোভ করেন। শিকাগোর ড. শামসুল বারি দূতাবাস কর্মচারী ফজলুল বারির নামে নেওয়া অনুমোদনপত্র সংরক্ষণ করেন। বোস্টনের প্রয়াত ড. মাহবুব আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর খোরশেদ আলম, ড. আলমগীর মহিউদ্দিন এবং আরো অনেকে অনেক দূর থেকে এসে সমবেত হন। ওয়াশিংটনের প্রয়াত ড. এনায়েতুর রহিম, ড. মহসিন সিদ্দিক, ডা. শামসুল হক, আবদুল আজিজ- আরো সবাই সমবেত হন। আমরা দূতাবাসের লোকেরা পালিয়ে বেড়াই। সমাবেশ শেষে দূরপাল্লার অধিবাসীরা সরাসরি চলে গেলেন তবে প্রায় শতজনের মতো আবার মিলিত হলেন আমার বাড়িতে। জুন মাসের শেষে এই বাড়ির ঠিকানা হয় ওয়াশিংটন বাংলাদেশ মিশন। তবে আগস্টের শেষে আমাদের আনুষ্ঠানিক মিশন স্থাপিত হয় ১২২৩ কানেটিকাট এভেন্যুয়ে। আর এখানেই পত্তন হয় ৫মে-তে বাংলাদেশের গঠিত দূতাবাস। ২৯ মার্চর সান্ধ্য আসরে ঠিক হলো যে বাংলাদেশের স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। ২৯ মে-তে খবরের কাগজ বেরুলো নিউইয়র্ক টাইমসে সিডনি শ্যানবার্গের প্রতিবেদন storks, spears against tanks. ওয়াশিংটন ইভনিং স্টারে হেনরি ব্যাডশার বলেন Pakistan in agony after the storm. ওয়াশিংটন পোস্ট জানালো Pakistan is control of Dacca. সেইন্ট লুইসপোস্ট ডেসপাচ সম্পাদকীয়

মন্তব্য করল crumbling dream of Pakistan. উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ আমি ঘোষণা দিলাম আজ থেকে আমি আর পাকিস্তানের হয়ে কোনো কাজ করবো না। বাংলাদেশকে স্বাধীন করবো। বাস্তবেও আমাকে আর কখনো পাকিস্তানের সেবা করতে হয়নি।

পয়লা এপ্রিলে বিশ্বব্যাংকে আমার বন্ধু বিল ম্যাকুলককে নিয়ে আমি ধারণা দিলাম সিনেটর কেনেডি ও সিনেটর হ্যারিসের দপ্তরে। তারা দুজনই সেদিন বাংলাদেশে পাকিস্তানি অত্যাচার ও আক্রমণ রোধ করার আহ্বান জানান। তাদের আবেদন ছিল যে তাদের সরকার এই সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা জানাবে এবং তা বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিবে। এই কাজটি কিন্তু মার্কিন নির্বাহী বিভাগের নিক্সন কিসিঞ্জার জুটি একাত্তরের নয় মাসে করলেন না। কংগ্রেসের সিনেটেও হাউসে দুই দলের প্রায় ৬০ জন মোট ১৯২টি বক্তৃতা বাংলাদেশের পক্ষে দেন এবং নিক্সন নীতির পক্ষে সাফাই দেন মাত্র আট জন মোট ১৮ বক্তব্যে তবে সেখানেও ছিল ধরি মাছ না ছুই পানির মানসিকতা।

লাই পেলে দস্যুগিরি যে কোনো নিকৃষ্ট পর্যায়ে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রেখে যায় অমানুষ ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী। সারা দেশে আনাচে-কানাচে তিনযুগ পরেও বধ্যভূমি অনবরত আবিষ্কৃত হচ্ছে। ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের বাহিনীর কোনো শেষ নেই। অথচ একটি দুষ্ট দেশ বা তার সহযোগীদের অনুশোচনার আজো কোনো নীতিবোধ জেগে ওঠেনি।

প্রতিবার স্বাধীনতা দিবসে নানা সংকট বা হতাশা এবং ব্যর্থতার চিত্রে দুঃখ লাগলেও একাত্তরের কথা স্মরণ করলে বুক কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠে। প্রবাস জীবনের নিরাপত্তার প্রতি কোনো দস্যু বা তার গোলাগুলির হুমকি ছিল না। কিন্তু দেশ হারানোর আশঙ্কা ছিল, আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্নতার ভয় ছিল। তবুও একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও গৌরবতম কীর্তি। সে সময়ে ক্ষোভ ছিল প্রবল এবং দ্রোহ ছিল তেমনি অসীম। যে কোনোভাবে দখলদার জানোয়ারদের নিঃশেষ করা এবং তাদের কলঙ্কিত হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল জীবনের ও কর্মপ্রেরণার অনন্য উৎস। নয় মাসে প্রায় চল্লিশটি রাজ্য ঘুরেছি। প্রতিদিন বিশ ঘণ্টা বা তারও বেশি কাজ করেছি। কিন্তু অবসাদ আসেনি। মাঝে মাঝে যে বিষাদগ্রস্ত হইনি তা বলা সঠিক হবে না। একাগ্রচিত্তে ও সুদৃঢ় বিশ্বাসে বাংলাদেশের দাবি, তার সুমহান সব আদর্শ ও চেতনার কথা বলেছি, বিশ্বসমর্থন আদায়ে ব্রতী হয়েছি। সেই কাজে প্রেরণা পেয়েছি দেশব্যাপী জনযুদ্ধে মানুষের নিবেদন, ত্যাগ ও দৃঢ়তা থেকে। আরো

প্রেরণা পেয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা কোণ থেকে নানা গোষ্ঠীর নিঃস্বার্থ সমর্থনে ও সমবেদনায়। অপরিচিত লোক সান্ত্বনা দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, আপনজন হয়ে গেছে। আর প্রবাসে ছিটিয়ে-ছিটকে পড়া বাঙালি যারা দেশের সঙ্গে তেমন সম্পর্কও রাখে না, তাদের আগ্রহ মনোবেদনা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদন মনকে উদ্বেলিত ও উত্তোলিত করেছে। ভারতীয় গোষ্ঠী, যাদের সঙ্গে অতীতে সম্পর্ক রাখতে কার্পণ্য করেছি, তারা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রবিশঙ্কর বা আকবর আলী খানের বেদনা হয়তো বুঝেছি। কিন্তু অভিভূত হয়েছি জর্জ হ্যারিসন, ডাবলান টমাস, বা জোয়ান বায়েজের অথবা গিনসবার্গের সমবেদনার তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখে। তখন বয়স ছিল সাইত্রিশ। স্বপ্নের দৌড় শেষ হয়নি, কর্মক্ষমতা ছিল প্রচুর, দুঃসাহসেরও অভাব তেমন ছিল না। তেমন সময়টি জীবনে আর দ্বিতীয়বার ছিল না এবং সম্ভবত হবেও না। সাঁইত্রিশ বছর পরে দেশটি আছে মহাসংকটে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারিতে একটি দুর্বৃত্ত রাজাকার সরকার ও তার বশংবদ ইয়াজউদ্দিন সরকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমার প্রত্যাশা দারুণভাবে বেড়ে যায়। গত স্বাধীনতা দিবসে ছিল আনন্দ ও উচ্চাসন, ভেবেছিলাম ন্যায় ও সত্যের পথে আমরা এগিয়ে যাবে, সুস্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হবে। আইনের শাসন অবশেষে প্রতিষ্ঠার পলে এগুবে। মানুষের মুক্তির সম্ভাবনা কাছে আসবে। কিন্তু প্রথমেই আসলো রাজনীতি বিসর্জন দেওয়া ও রাজনীতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধি। দেখলাম সরকারটির সমন্বয়হীনতা, উপলব্ধি করলাম তার পূর্ণ গণবিচ্ছিন্নতা। সোয়া বছরে সেই প্রত্যাশা পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পরিবর্তে দেখছি মানুষের সীমাহীন কষ্ট, দুর্নীতির ব্যাপক বিকাশ, মানবাধিকারের গতানুগতিক দলন। কিন্তু তবুও বলবো বাংলাদেশের স্বপ্নটি ভুল ছিল না। এখনো যা কিছু নিয়ে গর্ব করতে পারি সে হলো একাত্তরের চেতনা, একাত্তরের অভিজ্ঞতা, একাত্তরের প্রেরণা। 'জয় বাংলা' একদিন গড়বে সোনার বাংলা। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

গোপন বেতারে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা

বাহজাদ আহমেদ

গত ১৬ ডিসেম্বর আমার দেশ পত্রিকায় জনাব মনসুর মুসার একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা ও বিসংবাদী সাংবাদিকতা পড়ছিলাম। লেখাটি নিঃসন্দেহে সুস্থ মানসিকতা ও খোলা মন নিয়ে লেখা হয়েছে; যা সচরাচর হয় না। তবে লেখাটি পড়ে আমার মনে হয়েছে জনাব মুসাসহ অনেকেরই জানা নেই যে বঙ্গবন্ধুর গোপন বেতারের কথা। জনাব মুসা ১৯৭১এর ২৭ মার্চ দি স্টেটম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত যে সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমান এবং শুধু 'রহমান' উল্লেখ করা হয়েছে; তা জনাব মুসা, শেখ মুজিবরের বদলে জিয়াউর রহমানের বলে দাবি করেছেন। এমনকি শুধুমাত্র জিয়াউর রহমানের ঘোষণা উল্লেখ করার সময়ও এই দি স্টেটসম্যান-এর কথা উল্লেখ করা হয়। বিনয়ের সাথে মুসা সাহেবসহ অন্য সকলকে বলছি যে, আপনারা একটি তথ্য ঘাটতিসহ বিভ্রান্তিতে আছেন।

শুরুতেই দুই কথা বলে রাখি। প্রায়শ ধরে নেয়া হয় যে, শেখ মুজিবের সকণ্ঠে কোনো ঘোষণা ছিল না আর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটির রেফারেন্স হচ্ছে ২৭ মার্চের দি স্টেটসম্যান পত্রিকা। বাস্তবে দুটি ধারণাই সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমে বলে রাখি মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথম ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন ১৯৭১-এর ২৭ মার্চ সন্ধ্যে ৭-৩০ মিনিটে। তাহলে দি স্টেটসম্যান পত্রিকার ২৭ মার্চ ইস্যুতে তা আসবে কি করে? সুতরাং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার রেফারেন্স হিসেবে দি স্টেটসম্যান-এর উল্লেখ করা একটি মারাত্মক ভুল। তাছাড়া দি স্টেটসম্যান-এর সংবাদের বর্ণনা মুসা সাহেবের লেখায় উল্লিখিত জিয়ার ঘোষণার রিফলেকশন বহন করে না, যতো না করে শেখ মুজিবুরেরটা।

এবার আসা যাক শেখ মুজিবের ঘোষণার কথা। এটা অনেকেরই জানা নেই যে; শেখ মুজিব তার ২টি লিখিত ঘোষণা ছাড়াও সকণ্ঠে একটি প্রি-রেকর্ডে মেসেজ বাজিয়ে ছিলেন একটি হ্যান্ডি ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে যার সঠিক অবস্থান জানা গিয়েছিল স্বাধীনতার পর। এই প্রি-রেকর্ডেড মেসেজটি টিক্কা খানসহ

অনেকেই শুনেছিলেন এবং এর বিশদ উল্লেখ আছে ডেভিড লসাকের 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' বইতে। অবশ্য লসাক তার বইতে ট্রান্সমিটারটির অবস্থান উল্লেখ করতে পারেননি; যা আদৌ সম্ভব ছিল না। আমি বইটি থেকে ওই বিশেষ অংশ স্ক্যান করে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি।

তবে এটাও ঠিক দি স্টেটসম্যান যে সংবাদ প্রকাশ করেছিল তার সঠিক উৎস কি ছিল তা বলা কঠিন। উৎসের একটি হতে পারে প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ; ইপিআর থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অথবা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা যা এমএ হান্নানসহ অনেকে পাঠ করেছিলেন। যেহেতু ২৫ মার্চ রাতের পর পিটিআই, ইউএনআই ও বিবিসিসহ অন্যান্য সংবাদ মিডিয়ার জানা ছিল না শেখ মুজিবের সঠিক অবস্থান এবং যেহেতু স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বলা হচ্ছিল যে শেখ মুজিব তাদের সঙ্গেই আছেন; তাই শেখ মুজিবকে উল্লেখ করে দি স্টেটসম্যান তাদের সংবাদ প্রচার করে। তাছাড়া এমএ হান্নান যে ভরাট গলায় শেখ মুজিবের ঘোষণা পাঠ করেন তা আগরতলা থেকে খুব বেশি বড়জোর ৩০ মাইল ব্যাসের এবং পিটিআই, ইউএনআই, বিবিসিসহ অনেক সংবাদদাতা তখন আগরতলায় অবস্থান করছিলেন। আর এ সম্বন্ধে বিশদ লিখতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে এ লেখা প্রকাশে। এ নিয়ে আমি ইংরেজি ও বাংলায় বেশ কিছু লেখা ইতোমধ্যে লিখেছি, তাই গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রকাশিত আমার একটি লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি সত্য ঘটনা জানাবার জন্য।

এমএ হান্নান অবশ্যই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একটি ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। তারিখটা ছিল ২৬ মার্চ এবং সময় ছিল দুপুর ২.৩০ মিনিট। এটা ঠিক যে, এ ঘোষণা খুব কমসংখ্যক মানুষ শুনেছিল। যদিও ওই দিন ওই ঘোষণা আরও কয়েকবার পুনপ্রচার করা হয়—যারা এই ঘোষণা শুন উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মীর শওকত একজন, তিনি ১৫ খণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাসে খুব উদার কণ্ঠে ওই ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অল্পসংখ্যক মানুষ শোনার কারণ হচ্ছে। ওই সময় মানুষ হয় ঢাকা নয়তো আকাশবাণী বা বিবিসি বেশি শুনছিল দেশের অবস্থা জানার জন্য। তখনও মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার সম্বন্ধে অবগত ছিল না, তবে তারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্বন্ধে অবগত হয় আকাশবাণী থেকে ২৬ মার্চ রাতে ও ২৭ মার্চ সকালে। পিটিআইয়ের সংবাদদাতা অনিল ভট্টাচার্যের বরাত দিয়ে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কথা জানানো হয় আকাশবাণীতে এবং ভারতীয় পত্রিকায়।

এমনকি ২৬ মার্চের রাতে বিবিসি থেকেও বঙ্গবন্ধুর গোপন বেতার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হয়। অবশ্য তখনও জিয়া বা তার ঘোষণা সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানত না। কারণ জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে তার প্রথম ঘোষণা পাঠ করেন। এটা কোনভাবেই ঠিক নয় যে; জিয়ার ঘোষণার বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এবং বিবিসি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম প্রচার করে। প্রকৃতপক্ষে পিটিআই এবং পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক সংবাদদাতারা প্রথম ঘোষণা পান বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই ।

... বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন এতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ঘোষণা প্রদানের পরিকল্পনা এবং ধরন একটু ভিন্ন হওয়ায় অনেকে এই ঘোষণা হয়তো মিস করেছেন। তাছাড়া ঘোষণার বিষয়ে আগে থেকে কোনো প্রচারণা না থাকায়, ঘোষণা কিভাবে দেয়া হবে তা জানা না থাকায় এবং পাক বাহিনীর আক্রমণে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানোর কারণে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা না শোনাটাই স্বাভাবিক। তবে বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশে ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিল। তিনি চেছিলেন দেশি বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলো জানুক যে বাংলাদেশ ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও যুদ্ধ ঘোষণা দিয়েছিল পৃথকভাবে এবং একাধিক মাধ্যমে। খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করছি এখানে। প্রথমেই বলে রাখি, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। তবে তা তার ৬ দফার বাইরে নয়। তার উদ্দেশ্য ছিল ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে কনফেডারেশনে পরিণত করা এবং পরবর্তীতে নিজেরা মিলে স্বাধীনতা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। আর এ লক্ষ্যেই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন ২৫ মার্চ পর্যন্ত। কারণ ইয়াহিয়া খান কথা দিয়েছিল যে ওই তারিখের মধ্যে শান্তি পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সন্ধ্যাতে আশা করেছিলেন ইয়াহিয়া খান একটি এলএফও পাঠাতে যাচ্ছে তবে তার আশঙ্কাও ছিল যে, পাকিস্তানীরা ক্র্যাকডাউন করতে পারে বাঙালিদের দমাবার জন্য। সে জন্য তিনিও প্রস্তুত ছিলেন। কিভাবে যুদ্ধ শুরু হবে; যুদ্ধে কয়টা সেক্টর থাকবে; কে মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডার হবেন ইত্যাদি (সিদ্দিক সালিকের 'হুইটনেস টু স্যারেন্ডার' পড়ুন)। আর তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন পাক বাহিনীর আক্রমণের পর - এটাই ছিল তার স্ট্রাটেজি। যাতে বিশ্ববাসী বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত না করতে পারে। ক্র্যাকডাউন করে পাকিস্তানিরা সত্যিই ভুল করেছিল এবং ডিপ্লোমেটিক্যালি বঙ্গবন্ধু যে জয় অর্জন করেছিলেন

তা অতুলনীয়। আর এ জন্যে আজ আমরা স্বাধীন (প্লিজ দয়া করে বলবেন না যে হঠাৎ এক অপরিচিত মেজরের ডাকে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানিরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে—এটা অবাস্তব)।

এবার ঘোষণার বিষয়টায় আসি। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এবং মেসেজ গিয়েছে একাধিকবার। বঙ্গবন্ধু মেসেজ আকারে প্রথম যে বক্তব্য দেন সেটাই আসল ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু এবং তার সিনিয়র সহকর্মীরা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে আলোচনা ব্যর্থ হলে পাকিস্তানি জান্তা ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাতে পারে। ভারতের কাছ থেকেও সে রকম তথ্য ছিল এবং সে জন্য বঙ্গবন্ধুকে ভারত গ্রিন সিগনাল দিয়ে রেখেছিল যে আক্রান্ত হলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে দিতে (মূলধারা '৭১ দ্রষ্টব্য)। তাই অত্যন্ত গোপন পরিকল্পনা অনুসারে একটি প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বা ঘোষণা তৈরি করা হয়। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু'চার জন ছাড়া কেউ জানত না। ২৫ মার্চ রাতে যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল যে ইয়াহিয়া খান বাঙালি জাতিকে ব্লাফ দিয়ে পালিয়েছে এবং বাঙালি নিধনের নির্দেশ দিয়েছে, তখন বঙ্গবন্ধুর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর কি কি ঘটেছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। বঙ্গবন্ধু তার প্ল্যান মতো সিনিয়র কর্মীদের ঢাকা ত্যাগ করে ভারত চলে গিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করতে বললেন। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসায় অনেকে তার এই নির্দেশ পেয়েছিল, তাদের সাথে কথা বললেই হয় (এখন যারা বেঁচে আছেন তাদের নাম বলে দিচ্ছি, তাদের সাথে কথা বলুন —আতাউস সামাদ, খন্দকার মোঃ ইলিয়াস, নায়ীম গওহর, প্রাক্তন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন এবং আরও অনেকে)। এর পর তিনি নায়ীম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মাধ্যমে টেলিফোনে বার্তা পাঠান চট্টগ্রাম মুক্ত করে কুমিল্লা পর্যন্ত চলে আসার নির্দেশ ছিল। এর পর ঘটে বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বাজানো হয় বলধা গার্ডেন থেকে। তখন ২৫ মার্চের রাত গড়িয়ে ১১.৩০ মিনিট হয়ে গেছে। এই মেসেজটিই হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা, যা বাংলাদেশ ডকুমেন্ট হিসেবে ভারতে সংরক্ষিত আছে এবং স্বাধীনতার দলিলে জিযার সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা কিভাবে প্রাচারিত হয়েছিল তা বলে নিই যা অনেকে জানেন না বা জানার সুযোগ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর গোপন নির্দেশে বলধা গার্ডেনে একটি হ্যান্ডি ট্রান্সমিটার সেট করা হয় এবং রেডিও পাকিস্তান ঢাকার খুব কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সিতে তা প্রচার করা হয়, যাতে যারা রেডিও পাকিস্তান ঢাকা শুনবে তারা ওই ঘোষণাও শুনে ফেলবে। বঙ্গবন্ধুর আসল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক যে

ব্যক্তিরা ঢাকায় আছেন তারা যেন বিষয়টি জেনে যান। তখন ঢাকায় ছিলেন দি ডেইলি টেলিগ্রাফের ডেভিড লসাক, তিনি এ ঘোষণা শুনেছিলেন এবং তার বই। পাকিস্তান ক্রাইসিস'- এ উল্লেখ করেছেন।

They were sustanined, for a time, by the broadcasts of the clandestine Radio Bangladesh soon after darkness fell on March 25, the votee of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close the official Pakistan Radio, In what must have been and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. He called on Bangalis to go underground, to reorganize and to attack the 'Invaders'. And he claimed to be as free as Bangladesh'- a tragically true claim for he was in prison. But it was a claim which fired the resolve of the Mukti Fouj in those early, fraught weeks before they succumbed to the legions of the West. Radio Bangladesh continued to broadcast but its claim grew wilder...

এই ঘোষণা ঢাকার অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ টিক্কা খান এবং তার সহকর্মীরাও শুনেছিল (মুসা সাদিক ও রেজাউর রহমানকে জিজ্ঞাসা করুন) আর এই ঘোষণারই মেসেজ ইপিআর পাঠানো শুরু করে মধ্যরাতের পর থেকে, অর্থাৎ তখন ২৬ মার্চ শুরু হয়ে গেছে। বস্তুত ম্যাস পিপল এই ঘোষণা যখন রিসিভ করেছে তখন ২৬ মার্চ হয়ে যাওয়া আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ। এই ঘোষণার কথা ইয়াহিয়া খানও তার পরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে বলেছিল এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত শ্বেতপত্রেও উল্লেখ করা হয়। ঘোষণাটি ছিল এই রকম—দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ, ফ্রম টুডে বাংলা দেশ (আলাদা শব্দ) ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট...। এ ছাড়া ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে যখন জানা গেল পাকবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইপিআর এবং অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করেছে তখনই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ ঘোষণার আর একটি মেসেজ ডিকটেট করেন এবং এটাও ইপিআর-এর মাধ্যমে পরবর্তীতে পাঠানো হয়। এই মেসেজটি ছিল এ রকম—পাক আর্মি সাডেনলি এটাক ইপিআর বেইস অ্যাট পিলখানা এ্যান্ড রাজারবাগ পুলিশ লাইন কিলিং সিটিজেন্স... (রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার পড়ুন)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ; বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ে বেশ কটি

মেসেজ পাঠিয়েছিলেন; এর মধ্যে দুটি ছিল সারা দেশে আর ছোটখাটো ইন্সট্রাকশন আকারে নায়ীম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মারফত টেলিফোনে চট্টগ্রামে গিয়েছিল চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে এক হাত থেকে আরেক হাতে এবং যেহেতু তখনকার দিনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অত উন্নত ছিল না, তাই স্বাভাবিকভাবে মেসেজের শব্দগুলির বিন্যাস বা সঠিকতা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল; আর তাই জহুর আহমেদের কাছে রক্ষিত মেসেজগুলি বঙ্গবন্ধুর পাঠানো মেসেজ থেকে হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এর ফলে আসল ইন্সট্রাকশনের মর্মার্থ বুঝতে কারও একবিন্দুও অসুবিধা হয়নি। তাই তো স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ লাউডস্পীকারে (মাইকিং করে) এবং এমএ হান্নান স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে দুপুর ২.৩০ মিনিটে প্রথম প্রচার করেন। শুধু তাই নয়, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে জনগণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রচার করেন (কথা বলুন—বেলাল মোহাম্মদ, মুসা সাদিক ও আরও অনেকের সঙ্গে। মোদ্দাকথা হলো, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল এটা বাস্তব সত্য এবং চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিআরের মাধ্যমে মেসেজ চলে যায় এবং মাইকিং করে জনগণকে জানানো হয়। আপনাদের জন্য কিছু রেফারেন্স দিয়ে রাখছি কোনো উদ্ধৃতি ছাড়াই, কারণ এখানে এতো কিছু লেখা সম্ভব নয়। দয়া করে পড়ুন ডেভিড লসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস, সিদ্দিক সালিকের হুইটনেস টু স্যারেন্ডার, আমেরিকান স্পট রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, টিক্কা খানের ইন্টারভিউ, রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার, ২৬ ও ২৭ মার্চ, ১৯৭১-এ প্রচারিত আকাশবাণী ও বিবিসির খবরের স্ক্রিপ্ট, আরও অনেক আছে। সতরাং বঙ্গবন্ধুব স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, এ কথা আর বলার অবকাশ নেই। অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে—বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে যে ঘোষণা সত্যায়িত করেছিলেন তা সরকারি দলিলে স্থান পায়নি কেন ? এর কোনো উত্তর নেই, দলিলে অন্তর্ভুক্ত করলেই হলো। তবে বঙ্গবন্ধুর সত্যায়িত করা ঘোষণাটি আসলে ছিল যুদ্ধ ঘোষণার মেসেজ যা তিনি ড. মযহার, তাজউদ্দিন, ওসমানী ও আর কয়েকজনের সামনে বসে লিখেছিলেন। কিন্তু এই মেসেজ, প্রচারিত হওয়ার আগে প্রচারিত হয় প্রি-রেকর্ডেড ঘোষণা, এই প্রি-রেকর্ডেড মেসেজের উল্লেখ আছে ডেভিড লুসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস বইতে। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন এবং কিছুদিন পর লন্ডনে ফিরে এই বইটি লেখেন। এই বই যখন প্রকাশিত হয় তখনও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। সুতরাং এই বইয়ের তথ্য অন্তত বানোয়াট বলার কোনোই অবকাশ নেই (আশ্বস্ত করছি যে

বইটি আমি লন্ডনের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছি)। তবে ২৭ মার্চ ভারতের স্টেটম্যান পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছিল তা ছিল বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিফলন।

...এটা অবশ্য সঠিক যে জিয়ার ঘোষণাই মানুষ বেশি শুনেছে এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যে দাবি করা হচ্ছে যে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ সবচেয়ে প্রথম ঘোষণা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ যা বলধা গার্ডেন থেকে প্রচারিত হয় ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে। হোক না সেটা খুবই স্বল্পসংখ্যক মানুষ শুনেছে। এর পর আসে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ২৬ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে এমএ হান্নানের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা। শুধু তাই নয়, কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে আবুল কাশেম সন্দ্বীপ বিপ্লবী ঘোষণা দেন যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আপনাদের আশ্বস্ত করছি এই বলে যে আমার কাছে এই ঘোষণার রেকর্ড আছে। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এও প্রচার করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু তাদের সঙ্গে আছেন এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এমন কি জিয়াও তার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন। এর অর্থ এই যে বঙ্গবন্ধু ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্ভব ছিল না আর এ জন্য কৌশল করে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল। আর একটা কথা বলে রাখি যে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাত্র ইউনিয়নের কিছু বিপ্লবী কর্মী, চট্টগ্রাম বেতারের কিছু কর্মচারী কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিএনপির কিছু ব্যক্তি বলে বেড়ান যে, জিয়া এবং তার সহকর্মীরা এটা প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্বকে জানানোর জন্য এটা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত গল্পের কথা। আসল ঘটনা হচ্ছে যে; জিয়া এবং তার ফোর্স প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতে পিছিয়ে পটিয়া চলে আসে। তখন তাকে অনুরোধ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাহারা বসানোর জন্য। ২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিদর্শনে এলে বেলাল মোহাম্মদ তাকে অনুরোধ করেন যে সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে জিয়া যেন একটি ঘোষণা দেন। জিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সাথে একটি ঘোষণা লেখেন এবং তা প্রচার করেন সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে (মমতাজ উদ্দিনও সামনে ছিলেন)। এই ঘোষণার প্রথম লাইন হচ্ছে—আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হেয়ারবাই ডিক্লয়ার দি ইনডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ... (পড়ুন স্বাধীন

বাংলা বেতার কেন্দ্র বেলাল মোহাম্মদ)। এর পর আরও আছে, শুনতে চাইলে লিখুন শুনিয়ে দেব। সত্যি কথা বলতে কি, জিয়ার ঘোষণায় অনেক বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিক দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভেবে যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে পলিটিক্যাল ওয়ার শুরু হয়েছে তাতে বাঙালি সৈনিকরাও যোগ দিয়েছে।

... আবারও বলছি বঙ্গবন্ধু অবশ্যই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এই ঘোষণা সারাদেশে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীর উদ্যোগে। যেমনি জিয়া করেছিলেন কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে জনগণের অনুরোধে। আর পরিশেষে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার ও স্থপতি নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কাতারে দাঁড়াবার কারোরই যোগ্যতা নেই, সে যতো বড়ই ব্যারিস্টার বা পিএইচডিধারী হোক না কেন। জিয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। এই বিশ্বাস আমরা যারা নোংরা পলিটিক্স করি না, কিন্তু ইতিহাসে আস্থা রাখি তারা মনে-প্রাণে ধারণ করি। সুতরাং জিয়াকে টেনেহিঁচড়ে বঙ্গবন্ধুর কাতারে আনার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন এবং ইতিহাসকে চলতে দিন তার নিজস্ব গতিতে। কারণ আমাদের ইতিহাস আমাদের গৌরব। মনে রাখবেন মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই আমাদের সত্তার জলাঞ্জলি দেয়া।

সবিনয়ে আশা করব, উপরোল্লিখিত আলোচনা আপনাদের তথ্য ঘাটতি ও বিভ্রান্তি দূর করবে এবং নিশ্চিত করবে যে দি স্টেটসম্যানসহ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল তা সবটুকুই শেখ মুজিবুর রহমানের।

তবুও জানতে হবে সঠিক ইতিহাস

সরদার সিরাজুল ইসলাম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্থপতি। স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি এখনও সংবিধানের অংশ। এতে মুজিবনগর সরকারের ১০ এপ্রিল, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণার যে দলিলটি সংবিধানের অংশ বলে গৃহীত হয়েছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ, '৭১ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই স্বীকৃত সত্য আজ হলেও নিজামী-খালেদা জোটের কাছে অস্বীকৃত। ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। মেজর জিয়া ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে বেতার ভাষণ দেন—যার সুবাদে তাকে ঘোষক বলে চালানো হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারে তারিখটি ২৭-এর বদলে ২৬ দাবি করে। এখনও তাই চলছে সরকারি প্রচারযন্ত্রে এমনকি প্রগতিশীল দাবিদার পত্রিকায় (প্রথম আলো ১-১-২০০৪)। এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য প্রকাশ নাগরিক দায়বদ্ধতা।

২৫-২৭ মার্চ মেজর জিয়া কোথায় কী করছিলেন? কখন, কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান এবং বেতার কেন্দ্রে গমন, ইতিহাসের এই সব প্রাসঙ্গিক তথা লিপিবদ্ধ রয়েছে জিয়া লিখিত দু-একটি প্রবন্ধে।

(ক) সেদিন চট্টগ্রামে যেমন করে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছিল- দৈনিক বাংলা ২৫/২৬ মার্চ ১৯৭২। (স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র নবম খণ্ড পৃ. ৪০-৪৫)।

(খ) একটি জাতির জন্ম সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২২ মার্চ, ১৯৭৪।

জিয়ার এসব প্রবন্ধে "বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির জনক" এবং "৭ মার্চের ভাষণ গ্রীন সিগনাল" বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তিনি ছাড়াও তার তৎকালীন সহকর্মী ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লে. জে. মীর শওকত আলী বীরউত্তম লে. শমশের মবিন চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার হারুন আহম্মদ চৌধুরী, মেজর এনাম, মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, মে. জেনারেল এমএসএ ভূঁইয়াসহ বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার বক্তব্য রয়েছে জেনারেল জিয়া কর্তৃক ১৯৭৭ সালের নিযুক্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প দ্বারা সঙ্কলিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল (মোট ১৬) নবম খণ্ডের পৃঃ ৪০-১২৭ পৃষ্ঠায়। মেজর জিয়ার ইউনিট ছিল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ৫ মাইল দূরে ষোলশহর টিসিবি গুদাম, বর্তমানে শপিং কমপ্লেক্স।

সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহে বর্ণিত তথ্যাদি মেজর জিয়ার ভাষায় ২৫শে মার্চ ('৭১) রাত সাড়ে এগারোটায় সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য ষোলশহর ইউনিট থেকে বন্দরে রওনা হন। কিন্তু আগ্রাবাদে (প্রকৃত স্থান পাঠানটুলী ১১ তলা সাধারণ বীমা ভবন) রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে যেতে তার দেরি হচ্ছিল। এক পর্যায়ে তার সৈনিকসহ ট্রাক থেমে পড়ে। এখানে থেকে ডিউটি অফিসার ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তাকে ইউনিটে ফেরত নেন। এরপর জিয়ার ভাষায় শুরু হলো বিদ্রোহ। রাত তখন দুটো (২৬ মার্চ) ইউনিটে এসে জিয়া কী করেন তা বিবৃত রয়েছে লে. (অব.) শমশের মবিন চৌধুরীর (বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব) ভাষায় (নবম দলিল খণ্ড—পৃ. ৫৯) মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করা হলো। মেজর জিয়াউর রহমান টেবিলের উপর উঠে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন, আজ থেকে আমি অষ্টম বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করলাম। এবং আমার নির্দেশেই সব কিছু চলবে। আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন। এখন এখানে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমরা সবাই কালুরঘাটের দিকে যাবো। সেখানে গিয়ে আমরা রি-অরগানাইজ করবো।

এরপর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ইউনিটের জোয়ানরা শেষ রাতে রেললাইন দিয়ে পদব্রজে এবং মেজর জিয়া জিপে কালুরঘাট ব্রিজ পার হয়ে বোয়ালখালী থানার করলডাংগাগ্রামে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নেন ২৬ মার্চ ভোরে। সমশের মবিনের ভাষায়, 'আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং রি-অনগানাইজ করলাম। ২৬ শে মার্চ এভাবে কেটে গেল।'

মেজর জিয়ার বেতার কেন্দ্রে গমন ও ভাষণ প্রদানের তথ্য রয়েছে জিয়াসহ উল্লিখিত সেনা কর্মকতাদের লেখায় এবং তারিখটি ২৭ মার্চ। কর্নেল অলি আহমদ জীবনের শেষ নেই গ্রন্থে (পৃঃ ৯৭) তারিখটি ২৭ মার্চ। বলা নিষ্প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট স্থানটি ছিল পাক-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিভাবে বেতার কেন্দ্রে গেলেন তা এসব লেখায় অনুপস্থিত। ২৭ মার্চ সকালে বেতার কর্মী বেলাল মোহাম্মদ বেতার কেন্দ্র পাহারার জন্য জিয়ার সন্ধানে যান। পটিয়া থেকে ৩টি লরিতে জোয়ান এবং ১টি জিপে জিয়াকে বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন বিকাল ৫টা নাগাদ। (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পৃ. ৫৮-৫৯)। বেলাল মোহাম্মদের এ তথ্যের প্রতিবাদ কেউ করেননি। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর-শামসুল হুদা চৌধুরী পৃষ্ঠা-৪৩। মেজর জিয়ার ভাষায় : '২৭ মার্চ শহরের চারদিকে বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রেডিও স্টেশনে এসেছিলাম। এক টুকরো কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটি এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তা প্রচার করা হলো। ২৮ মার্চ সকাল থেকে পনেরো মিনিট পর পর

ঘোষণাটি প্রচার করা হলো।" স্বাধীনতার ঘোষক কে এই বিতর্কের পরিসমাপ্তি টানছি জিয়ার তৎকালীন বিশ্বস্ত সহচর বর্তমান বিএনপি নেতা লে. জে. মীর শওকত আলীর ১৯৮১ সালের প্রদত্ত একটি সাক্ষাতকারের সংশিষ্ট অংশের উদ্ধৃতির মাধ্যমে (বাংলাদেশের সাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ৯ম খণ্ড ১২০-২১ পৃ.)।

প্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বেতারে কখন প্রচারিত হয়েছে বলে আপনি বলতে চান?

বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সব সময় বিতর্ক চলতে থাকে যে জেনারেল জিয়া করেছেন, না আওয়ামী লীগ থেকে করেছেন, আমার জানা মতে সব চাইতে প্রথম বোধহয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬ মার্চ, '৭১ অপরাহ্ন দুটোর দিকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরক যন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরো দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তাহলে আমি বলব যে, চট্টগ্রামের হান্নান ভাই সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ ৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণা প্রচারের পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়।' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সংশিষ্ট বেতার ঘোষণাস্থলে কোনো স্মৃতিস্তম্ভ না করে মেজর জিয়ার অষ্টম বেঙ্গল ইউনিটটি যেখানে ছিল সেখানে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর একটি পার্ক তৈরি করেন। এর ফলকটি নিম্নরূপ :

বিপ্লব উদ্যান—এখানে—বীর চট্টলার অধিবাসীবৃন্দ এবং ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসার জুনিয়র কমিশনড অফিসার ও সৈনিকরা মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে নিরপরাধ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সরকারের বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে ২৬ মার্চ, ৭১ তারিখে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি লে. জে. জিয়াউর রহমান বিইউ. পিএসসি

১৯ শে এপ্রিল, ১৯৭৯ জিয়া লিখে গেছেন তারিখটি ২৭, এখন তারা বলছেন, ২৬ মার্চ। জিয়ার ভাষায় বঙ্গবন্ধু জাতির জনক; ওরা মানে না। মিথ্যাবাদী কে? কী আছে সেই ঘোষণায় যে তা বাজে না? তাহলে শোনা যাক জিয়ার কণ্ঠে :

"The govt. of the sovereign state of Bangladesh on behalf of our great leader the supreme Commander of Bangladesh Sk. Mujibur Rahman, we hearby proclaim the independence of Bangladesh.

স্বাধীনতার তৃতীয় ঘোষক

ডা. এস এ মালেক

'৭৫-পরবর্তী অনেক রাজনৈতিক তামাশার মধ্যে একটা বড় তামাশা হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। যদিও রাষ্ট্রপতি জিয়া নিজেকে কখনও স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবি করেনি, বরং নিজেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তথাপি তার দলের অনুগামীরা তার মৃত্যুর পর তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাদের রাজনৈতিক প্রয়াস আজও অব্যাহত রেখেছেন এবং সুযোগ পেলেই তারা বার বার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসছেন ও তাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছেন। অপ্রচারের মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা নিরন্তর চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি কোনো ইতিহাসবহির্ভূত বায়বীয় ঘটনা না হয়ে থাকে তবে তার একটা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস আছে, যাকে অগ্রাহ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ কখন ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে কী বলেছেন, তা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বলে বিবেচিত হতে পারে না। সুদীর্ঘ দেড় দশক ধরে যারা চেষ্টা করেও রাষ্ট্রপতি জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, তারা স্বাধীনতার তৃতীয় ঘোষককে হঠাৎ করে আবিষ্কার করে বসেছেন।

জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব '৭০ এর ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী কর্তৃক উচ্চারিত 'আসসালামো আলাইকুম' কে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তার অন্ধ দৃষ্টি ও বিকৃত বিবেক স্বাধীনতার ঘোষণা খুঁজে পায়নি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ঘোষণায় 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি জাতির জনকের সেই ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা যা টেলিগ্রাম আকারে গোটা বাংলাদেশের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার কাছে দেয়া হয়েছে ২৬ থেকে ২৮ মার্চের ভিতর। প্রতিটি ফ্রন্ট, প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রতিটি সংগ্রামরত জনতার কাছে পৌঁছে

গেলেও, তা পৌঁছেনি তার কাছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হওয়ার মতো গৌরব অর্জন করবার পরও তিনি বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনককে তার প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে রাজি নন। দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতায় আবদ্ধ তার বিবেক সত্যকে তুলে ধরার মতো সৎ সাহস অর্জন করতে পারেননি। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী কখন কী কারণে পাকিস্তানি শাসকদের 'আচ্ছালামো আলাইকুম' বলেছিলেন এদেশের রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই তা জানা আছে। '৭০ সনের প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করবার পরও যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এদেশের মাটিতে পা রাখেননি তখন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এরূপ একটা উক্তি করেছিলেন সত্য কিন্তু সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল তা ভেবে দেখা দরকার। তাছাড়া মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ওপর শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয় যে, স্বাধীনতা ঘোষণার স্বপক্ষে তিনি তখন কতটুকু বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন? এ কথা সত্য যে, এ সময়ে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরও নেতা ছিলেন। এটাও সত্য যে, এ দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান কম নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে চিহ্নিত করবার কোনো বাস্তব অবস্থা বিদ্যমান আছে কি?

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনায় মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর অবদান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত অনেক আন্দোলনে তিনি সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলেন। তবে একথাও সত্য যে, ৬ দফার মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী সাহেব সমর্থন করতে পারেনি, বরং সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তখন পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু হিসেবে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা মাত্র মানুষই শত্রু পক্ষ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতো, তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে অনেক নেতারই অবদান আছে। তবে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভুল-ভ্রান্তি মতিভ্রমের ঊর্ধ্বে থেকে সঠিকভাবে গোটা আন্দোলনকে পরিচালিত করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার মূল কৃতিত্ব একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের, আর কারও নয়। আর এটাই হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি

বিরোধীদের বিদ্বেষ ও ঈর্ষার মূল কারণ। হীনমন্যতাকে পরিহার করে বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার মতো মানসিকতায় অনেক নেতাই উন্নীত হতে পারেননি।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জননেতা মওলানা ভাসানী দু'জনেই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে শ্রদ্ধেয় দুই ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু তাদের কিরূপ শ্রদ্ধা করতেন তা রাজনৈতিক কর্মী মাত্রই অবগত আছেন। যারা জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাদের উচিত ওসব জাতীয় নেতৃবৃন্দের ওপরও শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পোষণ করবার অবকাশ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাস্তব ঘটনা প্রবাহের যিনি মূল নিয়ন্ত্রক তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিব, স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠক, নীতি নির্ধারক, ঘোষক ও নির্দেশক বলতে শুধুমাত্র তাকেই বুঝায়, অন্য কাউকে নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ছয়'দফা আন্দোলন ও '৭০-এর নির্বাচন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নে ছয়'ছফার আন্দোলনই বাঙালিকে তার স্বাধীকার ও জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠার সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই ছয়'দফা আন্দোলনের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ভাষা আন্দোলন থেকেই একটা বিশেষ রূপ-পরিগ্রহ করে। কিন্তু সেই আন্দোলনকে জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠার ঠিক চেতনায় পৌঁছে দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বাঙালির পক্ষে '৭০-এর নির্বাচন ছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি ম্যান্ডেট। '৭০-এর নির্বাচনে একচ্ছত্রভাবে জয়ী হয়ে জাতির কাছ থেকে সে ম্যান্ডেট একমাত্র বঙ্গবন্ধুই পেয়েছিলেন।

জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান স্থগিত রেখে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানি শাসকেরাই সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণায় বাধ্য করেছিলেন। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে, জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে, '৭০-এর নির্বাচনে স্বাধিকারের প্রশ্নে ৬ দফাভিত্তিক একচ্ছত্র ম্যান্ডেট লাভ করে, জাতীয় জীবনে সেই ভয়াবহ সংকটকালীন অবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণার রাজনৈতিক, নৈতিক ও আইনগত অধিকার একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই অর্জন করতে পেরেছিলেন।

একথা সত্য যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সুদূর অতীতকাল থেকেই এতদঞ্চলের মানুষের ভিতর সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান ছিল। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন এই চেতনাকে শাণিত করে। ছয়'দফার আন্দোলনই সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনে রূপান্তরিত

করে জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান রচনা করে। শোষণ ও বৈষম্যের অবসানকল্পে ৬ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অর্থেই বাঙালি তার স্বাধীন জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ হয়। ৬ দফার ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক দুর্বার গণআন্দোলনের মাধ্যমে গোটা বাঙালিকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। '৭০-এর নির্বাচনে একচ্ছত্রভাবে বাংলার গণম্যান্ডেট লাভ করে তিনি বাঙালির একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। পাকিস্তানি শাসক ও শোষকরা তাকে ১ নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত করে।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে অনেকে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে অনেক কথা বলে থাকেন। ইতিহাসে যার যা প্রাপ্য তাকে অবশ্যই তা দিতে হবে। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সমসাময়িক সকল নেতার সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ভ্রান্তিকে অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধুই সঠিকভাবে আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে তাকে সফল পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক, আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের অবশ্যই অবদান আছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বাস্তব রূপায়ন ঘটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও '৭০-এর নির্বাচন হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রেক্ষাপট, আর এ প্রেক্ষাপটের রচয়িতা হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। অতীতের অনেক নেতাই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, অনেকে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিলেন। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশকে একমাত্র বঙ্গবন্ধু মুজিবই উপহার দিতে পেরেছেন। তবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর অবদান অন্যান্য অনেক নেতার চাইতে যে বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাথমিক ভুল-ভ্রান্তি কাটিয়ে বিপথগামী সহযোগিদের উপেক্ষা করে মওলানা সাহেব সঠিকভাবে বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনে একটা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তিনি সংযোজিত হয়ে আন্দোলনকে তার সঠিক পরিণতিতে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হন।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যারা রাজনৈতিক ফায়দা অর্জন করতে চান, তারাও ভালো করে জানেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এদের কেউই একে

অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় জুড়ে এরা স্ব স্ব প্রতিভায় বিকশিত হয়ে আছেন।

প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করবার অভিযোগে যারা বঙ্গবন্ধুকে অভিযুক্ত করেন, তাদের ভেবে দেখা উচিত যে এক লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাংলার জনগণকে বঙ্গবন্ধু এমন একটা বিপর্যয়ের ভিতর ঠেলে দেননি যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের নিধন যজ্ঞের ভয়াবহ সম্ভাবনা বিরাজমান ছিল। এটাই ছিল তার নেতৃত্বের বিচক্ষণতা। আবার ধাপে ধাপে তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিলেন যখন স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ঘোষণার জন্য আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ আর অপেক্ষমাণ ছিল না। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ৭ মার্চের এই ঘোষণার মাধ্যমেই তিনি জনগণকে আমাদের সংগ্রামের মূল লক্ষ্য যে স্বাধীনতা তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। আর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন ঠিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই। যে কারণে গোটা বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বলে অভিযুক্ত করবার সুযোগ পায়নি।

কোনো মর্যাদাশীল জাতি তার স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ করতে পারে না। ডজন খানেক স্বাধীনতার ঘোষক আবিষ্কার করবার অপচেষ্টায় যারা লিপ্ত তাদের উদ্দেশ্যবাদী তৎপরতা কোনোদিনই সফল হবে না। এভাবে জাতির জনককে হেয় করবার চেষ্টা করে তারা গোটা জাতিকেই হেয় করছেন। যদি সত্যিকার অর্থেই জাতিকে তার স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে সকলেরই উচিৎ হবে সংযত ও দায়িত্বশীল আচরণ। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে অনেক অযোগ্য ব্যক্তিও যোগ্যতম স্থানে উন্নীত হয়েছেন। এটা গণতন্ত্রের দুর্বলতা। এই দুর্বলতাকে মেনে নিতে কারও সঙ্কোচ নেই। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য সত্যের অপলাপ ও মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে দায়িত্ব ও বিবেকহীন আচরণ করলে গোটা দেশের মর্যাদাই ক্ষুণ্ন হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মহানায়ক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা পরায়ণতার কারণে কেউ স্বীকার করুক বা না করুক এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। একে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে বিরুদ্ধবাদী অনেকেই এ দেশের স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসকে মেনে নিতে পারছেন না। নিজেদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতাই তাদের ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলেছে। এটা কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়।

১৯৭৫-এর পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন তারাও পরবর্তীতে তাদের স্বৈরশাসনের ছত্রছায়ায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাসকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। শাসককুল ইতঃপূর্বেই সত্য ও বাস্তবতার বিপরীতে এক বানোয়াট ও বিকৃত ইতিহাসকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। জনগণকে বিভ্রান্ত করাই এর মূল লক্ষ্য। সে স্বৈরশাসনের আমলে যা করা হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ খুব একটা বিব্রতবোধ করে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশে যদি ক্ষমতাসীনরা স্বৈরশাসকের ভাষায় কথা বলেন বা একইভাবে ইতিহাস বিকৃতির দায়িত্ব পালন করেন তবে তার পরিণতি ভালো হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শাসন করতে আর ফিরে আসবেন না, তার সৃষ্ট রাজনৈতিক দল কবে ক্ষমতাসীন হবে তা জনগণই কেবল বলতে পারেন। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতির জনক হিসেবে তার অবস্থান চির সত্য হিসেবে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধুই হচ্ছেন বাঙালির ইতিহাস। আর বাঙালির ইতিহাস হচ্ছে বঙ্গবন্ধু। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। তিনি ইতিহাসকে জয় করেছেন। এ বিজয় কেউ কোনোদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

ড. হারুন-অর-রশিদ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ড জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যের জীবনই শুধু কেড়ে নেয়নি, আমাদের রাষ্ট্রীয় রাজনীতির গতিধারাকেও উল্টে দেয়। একাত্তরের পরাজিত সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি ধারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। গত একুশ বছর ধরে সে ধারায় দেশ চলে। প্রতিক্রিয়ার এ ধারার পক্ষে শক্তি সঞ্চয় ও তা প্রবল হয়ে ওঠার জন্য স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ধারা ও আদর্শকে উপেক্ষা, খাটো করে দেখা কিংবা নস্যাৎ করা প্রয়োজন হয়। প্রতিক্রিয়ার শক্তি দীর্ঘদিন ধরে সে পন্থাই অবলম্বন করে। শুরু হয় দীর্ঘ সংগ্রাম ও সর্বোপরি একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি এ অপচেষ্টারই অংশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে মহল বিশেষ কর্তৃক বিতর্ক সৃষ্টি ভিন্ন কিছু নয়। সরাসরি যুক্ত নয় এমনি তৃতীয় একটি পক্ষ হিসেবে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা কিভাবে এসেছে তা দেখা যাক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতায় ফলাও করে সর্বপ্রথম ২৭ মার্চ, ১৯৭১ ছাপা হয়। ২৬ মার্চ The Times পত্রিকার প্রথম পাতায় ২৫ মার্চ রাতের প্রথম ভাগে করাচি থেকে পত্রিকার প্রতিনিধি পিটার হেজেলহার্স্ট কর্তৃক প্রেরিত একটি রিপোর্ট এভাবে ছাপা হয় Shots in Dacca as E. Pakistan drifts nearer to secession অর্থাৎ ঢাকায় গুলির শব্দ : পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতার দ্বারপ্রান্তে। এতে আরো বলা হয় যে, সংকট নিরসনে মুজিব-ভুটো-ইয়াহিয়ার আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। সমুদ্র ও আকাশপথে পাকিস্তানি সৈন্য ও অস্ত্র আসছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান করাচি ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে মুজিব ২৫ মার্চ সন্ধ্যা রাতে ঢাকায় এক জনসমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চরম ত্যাগ স্বীকারে (supreme Sacrifice) সবাইকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন বলে পত্রিকার এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে আরো বলা

হয়, মুজিব পূর্ব বাংলার সঙ্গে সরাসরি পাট ব্যবস্থা শুরু করার জন্য বিদেশি কোম্পানীসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিদেশের সঙ্গে ডাক ও তার যোগাযোগ এখন থেকে করাচী না হয়ে ম্যানিলা (ফিলিপাইনস) ও লন্ডন রুটে হবে বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। রিপোর্টে এও বলা হয় যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আর্মড রিজার্ভ পুলিশের সকল বাঙালি সদস্য ও পুলিশ বাহিনী মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছে। ভুট্টোর উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়, আওয়ামী লীগ আলোচনা বৈঠকে যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছে তা কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতারই শামিল। পিটার হেজেলহার্স্টের এ রিপোর্টটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বের অবস্থার বিবরণ রয়েছে। এতে দেখা যায় যে তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা দানের একেবারে দ্বারপ্রান্তে উপনীত। যে কোনো মুহূর্তে তা ঘটতে পারে। সে ক্ষণটি এলো ২৫ মার্চ মধ্যরাতের কিছু পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর নির্বিচার আক্রমণ শুরু করে বঙ্গবন্ধুর জন্য যেন সে সুযোগটি সৃষ্টি করে দিলো। ওই রাতে পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তিনি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণাদানের কথা জানিয়ে দেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান ও আরো দু-একজন একাধিকবার তা রেডিওতে প্রচার করেন।

২৭ মার্চ The Times পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার হেডিং Heavy fighting as Shikh Mujibur declares E. Pakistan independent অর্থাৎ শেখ মুজিবুর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষরা করেছেন, সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। পিটিআই'র বরাত দিয়ে এতে বলা হয় যে, একটি গোপন রেডিও থেকে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার এ ঘোষণা শেখের নামে জনৈক ব্যক্তি (এম এ হান্নান) প্রচার করেন। একই সম্প্রচারে শেখ মুজিবুর রহমানকে, 'স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের একমাত্র নন্দিত নেতা' হিসেবে উল্লেখ করে। 'শেষ শত্রু সৈন্য' নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে, যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান হয়। অপর এক সম্প্রচারে বলা হয় যে, শেখ মুজিবুরের অনুগত বাহিনী চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন দখল করে নিয়েছে। টাইমসের এই রিপোর্টে ২৬ মার্চ পাকিস্তানি জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের উল্লেখ করে বলা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে এই মর্মে ইয়াহিয়া ঘোষণা দেন। গত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ

আসনে বিজয়ী শেখের আওয়ামী লীগ দলকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে বলে পত্রিকা জানায়।

একই দিন Financial Times পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় Civil war after East Pakistan declare independence-এ শিরোনামে লিখে, গতকাল (২৬ মার্চ) শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা দিলে সেখানে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার এ ঘোষণা প্রচার করা হয় এ কথা উল্লেখপূর্বক পূর্ণ ঘোষণাটি পত্রিকার পাতায় উদ্ধৃত হয়।

২৭ মার্চ The Guardian পত্রিকার Heavy fighting after UDI (Unilateral Declaration of Independence) by East Pakistan এ শিরোনামে এতদসংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে বলা হয় যে, ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণের পরপরই The Voice of Bangladesh নামে একটি গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর এই ঘোষণা অপর এক ব্যক্তি পাঠ করেন।

একই তারিখে The Daily Telegraph পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নতুন দিল্লি থেকে পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোসাক কর্তৃক পাঠানো সংবাদের ভিত্তিতে CIVIL WARFARES IN E. PAKISTAN : Sheikh a traitor, Says President এ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়।

২৮ মার্চ The Sunday Observer পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় Sheikh calls on UN for help এ শিরোনামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ তুলে ধরে উল্লেখ করা হয় যে, মুজিব বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি তাঁর জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

২৯ মার্চ The Daily Express পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় Send help appeal goes out শিরোনামে কলকাতা থেকে ২৮ মার্চ ডোনা সিম্যানপ্রেরিত এক ভিন্নধর্মী প্রতিবেদন ছাপে। এতে বলা হয় অদ্য (২৮ মার্চ) রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি রেডিও থেকে মেজর জিয়া খান (হবে, জিয়াউর রহমান) নামে একজন আর্মি অফিসার স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এই

মর্মে ঘোষণা দেন এবং চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে সবাইকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। দিল্লি রেডিও'র বরাত দিয়ে তার ভাষ্য অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তাকে (মেজর জিয়া) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অস্থায়ী প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে এ কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কথিত এই নিয়োগের ব্যাখ্যা কিংবা উল্লিখিত এই মেজরের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি বলে প্রতিবেদনটিতে মন্তব্য করা হয়। মেজর জিয়ার এ ঘোষণা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি কোনো চ্যালেঞ্জ কি-না এ ধরনের সংশয় এতে প্রকাশ পায়। The make or break question over the Pakistan civil war tonight is not only WHO is winning but WHAT is happening to the leader who launched the struggle to make East Pakistan independent, Sheikh Mujibur Rahman ?

উল্লেখ্য, ২৭ মার্চ মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর নামে On behalf of our Great leader, the Supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman স্বাধীনতার যে একটি ঘোষণা চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ অস্থায়ী বেতার থেকে প্রচার করেছিলেন তা একাধিকবার সম্প্রচারিত হয়। ২৮ মার্চ রাতের একই সম্প্রচার The Daily Express, পত্রিকার পাতায় পরের দিন স্থান পেলেও জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এরূপ কিছুই এতে নেই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোনো ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় জিয়ার নামটি মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে আর একবারও আসেনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির জনক সারা বিশ্ব সেভাবেই জানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা যে তাঁরই, ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতায়ও তা স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান। এটাই ইতিহাস-বিকৃতিহীন ইতিহাস। ২৬ মার্চই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার কথা। আমাদের সংবিধানের Preamble বা প্রস্তাবনার শুরুতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আওয়ামী লীগের গণপ্রতিনিধিদের পক্ষে অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার যে সনদ পাঠ করেছিলেন তাতেও একই তারিখ উল্লিখিত। এতে বলা হয়, "উদ্ধৃত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা

ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জনা বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান ... আমাদের এই স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণা হইবে।" (এম এ বারী, মুক্তিযুদ্ধের রক্তিম স্মৃতি, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭৩)। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপনকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্যই প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার উপর থেকে হয় নাই।" মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত) বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ. ৪৬)।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বাংলাদেশ তার বিশ্বাস, জীবন, স্বপ্ন, ভালোবাসা। তা বুকে ধারণ করেই তিনি সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, বছরের পর বছর কারাভোগ করেছেন। তবুও এর মধ্যে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন। তিনি যেন ২৬ মার্চের ওই ক্ষণটির জন্যই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিলেন। ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতায় সেই সত্যটিই ফুটে উঠেছে।

এরপরেও হয়তো কেউ কেউ আমাদের ভিন্ন কথা শুনাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তা হবে কথা মাত্র, ইতিহাস নয়, কথামালা দিয়ে আর যাই হোক ইতিহাস হয় না। ইতিহাসের উপাত্ত হবে শুভ, নির্ভেজাল। এটি প্রবন্ধকারের ১৯৯২-৯৩ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও জনমতের ভূমিকা' বিষয়ক গবেষণা থেকে রচিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী

১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি সিডনি শোওনবার্গের লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা রেকর্ড করা হয়। ওইদিন রাতে টিএন্ডটি/ইপিআর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচারিত হয়।

একথার বাস্তব স্বীকৃতি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যার সময় ঢাকায় নিযুক্ত পাক আর্মির জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইরে (পৃ. ৭৫) লিখেছেন।

লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ তৎকালীন বিশেষ সংবাদদাতা ডেভিড লোসাক তার 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' নামক গ্রন্থে ঢাকায় তার ২৫ মার্চ রাতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন, ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালের রাতে অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গুলিবর্ষণের শব্দ শোনার পর সরকারি পাকিস্তান রেডিওর তরঙ্গের কাছাকাছি একটি শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে শেখ মুজিবের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলে ঘোষণা দেন (ক্রাইসিস পৃ.৮৯)

বঙ্গবন্ধুর দেয়া ২৫ মার্চ রাতে ঘোষণাটি ২৬ মার্চ বেলা ২টা ৩০ মিনিটের সময় বাংলায় অনুবাদ করে স্বাধীনতার ঘোষণাটি কালুরঘাট রিলে স্টেশন থেকে প্রথম প্রচার করেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। একই বিষয় ওইদিনই কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (প্রথম নাম) অনিয়মিত প্রচার শুরু করে।

মেজর জিয়াউর রহমানকে অনুরোধ করে এই বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। কারণ, সেনাবাহিনীর একজন বাঙালি অফিসার দ্বারা শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারের জন্যে। যাতে করে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি জওয়ান ও অফিসারগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে উক্ত বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। আমি ও আরো অনেকেই রেডিওর সামনে সমবেত হয়ে জিয়াউর রহমানের বক্তব্য শুনেছি। পরের দিন ২৮ মার্চ সকাল থেকে পনের মিনিট পরপর ঘোষণাটি প্রচার করা হয়।

৩০ মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধক্রমে।

মেজর জিয়াউর রহমান এই বেতার কেন্দ্র থেকে তিনটি আবেদন পাঠ করেছেন। তিনি কোনোটিতেই বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলেননি। তিনি নিজেও কোনোদিন স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করেননি। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার পাঠক ছিলেন। এই সত্যকে মেনে নেয়া সকলের উচিত। এর বিকল্প বা কোনো কিছু বিকৃতি করা উচিত নয়। এই সত্যকে এতো সহজেই হত্যা করা নিজেদেরই হেয় প্রতিপন্ন করা হবে বৈকি।

কালুরঘাটের বেতার-কর্মী বেলাল মোহাম্মদ বলেছেন যে, তৎকালীন মেজর জিয়াকে কালুরঘাট প্রচার ভবনে ব্যক্তিগতভাবে আমিই নিয়ে এসেছিলাম পটিয়া থেকে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায়। আর আমি তাঁকে কথায় কথায় নিজ কণ্ঠে কিছু প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেই মর্মে তিনি আমার সঙ্গে বসেই তার ইংরেজি খসড়াটি তৈরি করেছিলেন, যার প্রথম বাক্যটি ছিল : "I Major Zia, on behalf of our great national leader Bangabundhu Sheikh Mujibur Rahman do hereby declare independence of Bangladesh." সেইদিন মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বরের মহিমা ছিল বহুগুণে বেশি। মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর শুনেই নিরস্ত্র বাঙালিরা সেদিন আশ্বস্ত হয়েছিল। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর অনুসারী সামরিক বাহিনীও আছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আগে ২৫ মার্চ রাত দেড়টার পরে তাৎক্ষণিকভাবে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার যে ঘোষণাটি দেন তা ছিল নিম্নরূপ :

"The Pakistani Army has attacked police lines at Rajarbagh and East Pakistan Rifles headquarters at pilkhana at midnight gather strength to resist and prepare for a war of independence" Massage By Robert Payne (Page 25): The Macmillan Company New York.

বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী বাংলায় অনুবাদ করে ২৬ মার্চ অনিয়মিতভাবে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। ফলত পাক হানাদার বাহিনী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সর্বত্র শুরু করে ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা করে হাজার হাজার নর-নারী। রক্তে রঞ্জিত করে ফেলে বাংলাদেশের সর্বত্র।

২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পক্ষে "কালুরঘাট বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে ঘোষণাপত্র পাঠ বারবার প্রচার হতে শুরু করে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে আবার বিতর্ক

কে জি মুস্তাফা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ তাঁর গ্রেফতারের প্রাক্কালে। পূর্বনির্ধারিত ব্যক্তিদের কাছে ওই ঘোষণার মেসেজ পাঠানো হয়। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় ২৫ মার্চ গভীর রাতে। দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয় ২৫ মার্চ রাতেই। ঘোষণাকাল উল্লেখ করা হয় ২৬ মার্চ, যেহেতু ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর ২৬ মার্চ ধরা হয়। এ নিয়ে সম্প্রতি অনর্থক বিতর্ক উস্কে দিলো বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান তার জীবদ্দশায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন একটা দলিল তৈরির প্রকল্প হাতে নেন। প্রকল্পের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন কবি সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। জেনারেল জিয়া নিহত হবার পরও প্রকল্পের কাজ চালাতে থাকেন হাসান। তিনি ১৫টি খণ্ডে দলিলের কাজ প্রায় সমাপ্ত করেছেন এমন সময় অসুস্থ হন এবং পরে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। এরপর দলিলের কাজ সমাপ্ত করার কাজ পান সাংবাদিক মুস্তাফা রওশন আখতার। এম আর আখতার মুকুল যথাসময়ে ১৫ খণ্ড দলিল প্রকাশ করেন। ওইসময় ক্ষমতায় ছিলেন জেনারেল এরশাদ। দলিলের একটি খণ্ডে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক মেসেজটি দেশ-বিদেশে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং তাঁর তৈরি তালিকা অনুযায়ী। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান রাত ১২টার পর বঙ্গবন্ধুর বহু প্রত্যাশিত মেসেজটি পেয়ে তা মাইকযোগে প্রচার করেন এবং বেতারে সম্প্রচার করার উদ্যোগ নেন। এদিকে পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৩ মার্চ থেকে ঢাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে জাতীয় সংসদ অধিবেশন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ১৯ মার্চ আলোচনা একটা ফলপ্রসূ স্তরে উপনীত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো আলোচনা বানচাল করার চক্রান্ত করতে থাকেন।

১৯ মার্চ ঢাকার জয়দেবপুর এলাকায় মিলিটারি ও জনতার মাঝে সংঘর্ষ বাঁধে। দু'জন নিহত হয়। ফলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। নিহত দু'জনের লাশ নিয়ে একটা বিরাট মিছিল ৩২ ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে আসতে থাকে। বঙ্গবন্ধু তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। এই অবস্থার মধ্যে আলোচনার গতি স্তিমিত হয়ে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা মমতাজ দৌলতানা এবং আব্দুল ওয়ালী খান আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না বিবেচনা করে ঢাকা ত্যাগ করেন ২০ মার্চ। ওইদিনই করাচি থেকে ঢাকায় আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি ২১ মার্চ ইয়াহিয়া ও মুজিবের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। ২২ মার্চ হয়াহিয়া ও তার অফিসারদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেন আওয়ামী লীগ ও পিপিপি নেতৃবৃন্দ। ২৩ মার্চ ঢাকার সর্বত্র আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের ডাকে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ওই দিনটি পাকিস্তান দিবস হওয়ার কারণে সরকারি ভবন ও কূটনীতিকদের বাসা ও কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঢাকার কয়েকটি দূতাবাসে পতাকা নামিয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করতে রাজি করান ঢাকার ছাত্র-যুবকরা। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং অন্যরা ২৪ তারিখের নির্দিষ্ট বৈঠকে যাননি। বৈঠক বাতিলও করেননি।

২৫ মার্চ বেলা ৩টার সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো ইন্টারকনে এক অনির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সকালের আলোচনায় আসেননি। তিনি ক্যান্টনমেন্টে গেছেন, হয়তো ট্রুপস ইনসপেক্ট করছেন সেখানে। তার বডি ল্যাংগুয়েজ জানিয়ে দিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হয়তো সৈন্যদের অ্যাকশনে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক একতরফাভাবে ভেঙ্গে দিয়ে গোপনে ক্যান্টনমেন্টে চলে যান ২৫ মার্চ অপরাহ্নে। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টায় তিনি করাচি যাত্রা করেন বলেও খবরে রটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একদিকে উগ্র অবাঙালিদের মধ্যে সাজ সাজ রব শুরু হয় এবং অন্যদিকে মুক্তিকামী তরুণরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সুসংহত করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সেনানীরা রাস্তায় রাস্তায় গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করেন। যদিও ট্যাঙ্কের সামনে গাছের গুঁড়ির প্রতিরোধ কোনোই কাজে আসে না, তবুও ব্যারিকেড দেয়ার সাহস সঞ্চয় করাটাও মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

একাত্তরের পঁচিশ মার্চের রাতটা চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে কাটালাম আমরা অবজারভারের সাংবাদিক প্রেস কর্মচারীরা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারী

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। পুরনো ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে আগুন দেয়া হলো বাড়িঘরে। আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যারা বাইরে আসেন তাদের গুলিবর্ষণে স্তব্ধ করা হয়। রাত ১১ টার দিকে ট্রেসার বোমা নিক্ষেপ করা হলো রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলাবর্ষণ। সমগ্র পুলিশ লাইনে মৃত্যুর বিভীষিকা। একই সঙ্গে গোলাবর্ষণ করা হলো পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানে নর হত্যার তান্ডব। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স ও ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স থেকে সরে পড়েন অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর যোদ্ধা। তারা যোগ দেন মুক্তিফৌজে। ওই রাতেই গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ইত্তেফাক ও নিউনেশন পত্রিকার কার্যালয় এবং জাতীয় প্রেসক্লাব। রাজধানীর শিখদের প্রাচীন গুরুদুয়ারা, হিন্দুদের মন্দির সবই ধ্বংস হয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উন্মত্ত হামলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রাবাসে চালানো হয় সেনা-অভিযান, হত্যা করা হয় ছাত্র-শিক্ষক। জগন্নাথ হল হিন্দু ছাত্রাবাসের সকল শিক্ষক ও ছাত্রকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক ড. জিসি দেব। লাইনের একজন ছাত্র অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে হানা দিয়ে শিক্ষকদেরও লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। সংবাদ দৈনিকে ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করা হয় দু' তিন দিন পর। সেখানে নিহত হন সাংবাদিক শহীদ সাবের। ঢাকার বিভিন্ন বাজারে হত্যাকাণ্ড চালানো হয় রাতের অন্ধকারে।

২৬ মার্চের সকাল থেকে চলে বিশেষ টার্গেটে অগ্নিসংযোগ ধরপাকড় লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার। ২৫ তারিখের রাতেই জারি করা হয় কার্ফ্যু সমগ্র রাজধানীতে, একটানা ৭২ ঘণ্টা। ফলে ২৬ মার্চ সারাদিন ও সারারাত কার্ফু চলে। কার্ফ্যুর মধ্য পত্রিকা অফিস থেকে দেখেছি, ঢাকা জ্বলছে। চারদিকে আগুন ছোট কোনো ছাপাখানাও বাদ যায়নি। সবই ধ্বংস করা হয়েছে। ঢাকা থেকে প্রাণভয়ে পালানো মানুষজন রাস্তায় ধরা পড়লে নিহত হন জল্লাদ বাহিনীর আক্রমণে। বুড়িগঙ্গা পার হতে যাওয়া ছাত্ররা নদীর বুকেই প্রাণ দিয়েছেন হায়েনাদের গোলার আঘাতে অথবা ব্রাশফায়ারে। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পতনোন্মুখ জাতির উদ্দেশে বেতার ও টিভিতে ভাষণ দেন। তিনি ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয় উল্লেখ করে বলেন, মুজিব তাঁর

সমর্থকদের পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁকে দেশদোহী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সেই হিসেবেই বিচার হবে। ইয়াহিয়ার ভাষণের কোনো অংশেই পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার চক্রান্তকারী রূপে মেজর জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করা হয়নি। জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চের গভীর রাতে অথবা ২৬ তারিখের সকালে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছেন এমন কথা কোথাও উল্লেখ করেননি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা অন্যকোনো নেতা।

কার্ফ্যু প্রত্যাহারের পর ২৭ মার্চ সকাল আটটায় আমরা পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার অফিস থেকে বের হই। সেখান থেকে হেঁটে (কোনো যানবাহন ছিল না বলে) আজিমপুর এস্টেটের বাসায় আসার পথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যালীলার স্বাক্ষর রাজপথের দু'পাশে দেখতে পাই। দেখতে পাই প্রেসক্লাবের ক্ষত-বিক্ষত দালান, মাটিতে গুঁড়িয়ে ফেলা শহীদ মিনার, ইকবাল হলের (পুরনো শেড) সামনে সারিবদ্ধ মৃতদেহ ছাত্রদের, তখনও সরিয়ে ফেলা যায়নি।

বাসায় ফিরে পেলাম একটি জরুরি খবর। জননেত্রী মিসেস জাহানারা ইমাম খবর পাঠিয়েছেন, আমরা সপরিবারে যেন অবিলম্বে তার মায়ের ধানমন্ডি ৬ নম্বর রোডের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করি নিরাপত্তার কারণে। মিসেস ইমাম একসময় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং সাবেরা ছিলেন ওই স্কুলের শিক্ষিকা, সেই সূত্রে আমাদের পরিচয়। অবশ্য আমার রাজনৈতিক ও পেশাগত পরিচিতিও তিনি জানতেন। যা হোক, তার খবর অনুযায়ী যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ছেলেদের নিয়ে আজিমপুর এস্টেটের বাসা ছেড়ে চলে যাই মিসেস ইমামের মায়ের বাসায়। সেখানে শান্তিনগর থেকে আমার স্ত্রীর খালু, গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস ভুঁইয়া এবং তার জামাতা ড. বদীউজ্জামান তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসেন মিসেস ইমামের মায়ের বাসায়।

এতো কথা লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা আমি কিভাবে শুনলাম, তার সবিস্তার বর্ণনা দেয়া। ওই বাড়িতে রেডিও শুনতে শুনতে হঠাৎ কানে আসে কোনো এক মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন। আমার খালু শ্বশুর আব্দুল কুদ্দুস ভুঁইয়া এ খবর শুনে বলে উঠলেন, 'ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে জিয়া নামে আমার এক ছাত্র ছিল। এ মেজর সেই ছাত্র হতে পারে। আমরা হিসেব করে দেখলাম, ফৌজদারহাট কলেজের

ছাত্র জিয়ার সঙ্গে এই মেজরের বয়স মিলছে না। জিয়ার ঘোষণায় আমরা সবাই খুব এক্সইটেড। কয়েক ঘণ্টা পর আরও একটি ঘোষণা শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুব সহজের মেজর জিয়ার পরিচয় পাওয়া গেল। জিয়া আমাদের সাংবাদিক বন্ধু ফজজুল করিম তারার চাচাত ভাই। তারা জিয়ার বড়। জিয়া তার দুটি ঘোষণার কথাই স্বীকার করেন।

পরবর্তী কথা প্রসঙ্গে শুনেছি, একাত্তর সালের ২৭ মার্চে জিয়াউর রহমানের দুটি ঘোষণা প্রচারিত হয় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে। দুটি ঘোষণাই ২৭ মার্চ করা হয়েছে। প্রথম ঘোষণায় জিয়া বলেছিলেন, 'আই, মেজর জিয়াউর রহমান, ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট। এই ঘোষণা শোনার পর চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একে খান কয়েকজন নেতাকে ডেকে বেলন, 'কে জিয়া, তাকে কেউ চেনে না। ওই ঘোষণা সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিতে বলো। তাহলে লোকে বিশ্বাস করবে'। এ কথা শুনে দ্বিতীয় ঘোষণা দিতে জিয়াউর রহমান রাজি হন এবং দ্বিতীয় ঘোষণা ব্রডকাস্ট করা হয়। আমরা মিসেস জাহানারা ইমামের মার বাসায় শ্রোতারা দুটি ঘোষণাই শুনেছি এবং দুটি ঘোষণাই ২৭ মার্চ, ১৯৭১-এ দেয়া দ্বিতীয় ঘোষণায় জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

একাত্তরের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের একদা বিশিষ্ট ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব আবদুল হাফিজ কারদার ঢাকায় আসেন। তিনি তখন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) অন্যতম নেতা এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক আইন সভার সংসদ সদস্য। তিনি ঢাকায় এসে অন্যান্যদের মধ্যে আমার সঙ্গেও সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পিপিপিতে তখনকার দুই নম্বর নেতা ছিলেন মিরাজ মোহাম্মদ খান। মিরাজের বড় ভাই মেনহাজ বার্না বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (পিএফইউজে)-এর প্রথম সারির নেতা। সেই সূত্রে মিরাজ ছাড়াও পিপিপিতে আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তারা সবাই হাফিজ কারদারকে আমার খবর নেয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন।

কারদারের সঙ্গে সাক্ষাত হলো ইন্টার কন্টিনেন্টাল (বর্তমান শেরাটন) হোটেলে। তিনি আমার ব্যক্তিগত খবরাদি শোনার পর জানতে চাইলেন শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়া কী। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এ খবর তো আমরা-পাইনি।

তিনি হেসে বললেন, 'আপনারা যে পরিস্থিতিতে বাস করছেন তাতে অনেক খবরই জানতে পারবেন না। শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজটি পাকিস্তানি সিগন্যালস ইন্টারসেপ্ট করে। এটা পাকা খবর। এ ব্যাপারে পাকিস্তান শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে হাইট্রিজনের মামলা করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়া কী রকম?

আমি বললাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা যে অত্যাচার করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর তাতে কেউ যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তো সমর্থন পাবেন সমগ্র জাতির। যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করবেন তারা চিহ্নিত হবেন পঞ্চম বাহিনী, রাজাকার ইত্যাদি অভিধায়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করে থাকলে সারা দেশ তার পক্ষে দাঁড়াবে, তার জয়গান গাইবে এটা সুনিশ্চিত।

এতো কিছু ঘটে যাওয়ার পরও আজ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার প্রচার করছে বঙ্গবন্ধুর ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। এসব ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে জোট সরকার নিজেদের অবস্থা দুর্বলতর করবে মাত্র।

২৬ মার্চ ১ম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী

বিশ্বের দেশে দেশে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই সুদীর্ঘ সংগ্রাম করে তাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। এসব নেতাদের মধ্যে ঘানার খামা নক্রুমা (Kwame Nkrumah), ভিয়েতনামের হো চি মিন (Ho chi Minh), কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা (Patrice Lumumba), ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ (Sukarno), বার্মার আউঙ্গ সান (aung San), শ্রীলংকার বন্দরনায়িক (Bandaranaike), দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা (Nelson Mandela), প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত (Yassir Arafat) এবং আলজিরিয়ার আহমেদ বেন বেল্লার (Ahmed Ben Bella) নাম প্রণিধানযোগ্য। নিজ দেশ ও জাতির জন্য এদের অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে কালজয়ী হয়ে থাকবে। তাই তারা বিশ্বনন্দিত নেতা এবং স্ব স্ব দেশের জাতির পিতা। এসব নেতৃবৃন্দের মাঝেও বঙ্গবন্ধু চিরভাস্বর, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অবদানের জন্য। বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে প্যাট্রিস লুমুম্বার মতো সাহসিকতা, নেলসন ম্যান্ডেলার মতো ঔদার্য, সুকর্ণোর মতো বাগ্মিতা, হো চি মীন-এর মতো দৃঢ়চেতা মনভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। এ যেন একের মাঝে অনেক নেতার সমাহার।

কঙ্গোর ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রে প্যাট্রিস লুমুম্বা নিহত হবার পূর্বে বলেছিলেন : I prefer to die with my head high, unshakable faith and greatest confidence in the destiny of my country, rather then live in slavery.

সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর রেসকোর্স ময়দানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ-বাক্য পাঠ করানোর প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু যে বক্তব্য প্রদান করেন তা মনে হয় প্যাট্রিস লুমুম্বার কথারই প্রতিধ্বনি : "I am not interested in being the Prime Minister. Prime Ministers come and go. But the love and respect of the people that have been showered on me is the only thing which I wouuld cherish all through my

life. Netiher the jails of Ayub Khan and Monem Khan,. nor a conspiracy case could daunt me. But the overwhelming love of the people makes me feel weak." (Voice of Freedom, edited by Zahid Hassan, Bangabandhu Parishad, 118 Bashiruddin Road, Dhaka, pp. 173)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হয়ে ফাঁসির রজ্জু অথবা পরাধীন দেশে মুক্ত জীবন—এ দুয়ের মাঝে ফাঁসির রজ্জুই বেছে নিয়েছিলেন, স্বাধীনতাহীনতা নয়। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাতের ঘটনা সম্বন্ধে ডেভিড ফ্রস্টকে বলতে যেয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাতে জনগণের জন্য তাঁর ভালোবাসা, ত্যাগ ও সাহসিকতার একই সুর অনুরণিত হয় : "They will kill my whole people. They will make a massacre. I thought it is better I die and at least save my people who love me so much . I must share the sufferings of my people along with them. I must share. I can't leave them on the face of fire. I cna't" (মহম্মদ আবদুল হাই : ইতিহাস বিকৃতির বেড়াজালে বঙ্গবন্ধু, দৈনিক জনকণ্ঠ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ২১)। এমনকি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের প্রলোভন ও তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক জনমত এবং ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানদের হস্তক্ষেপেই তার ফাঁসির আদেশ কার্যকর হওয়া বিলম্বিত হয়েছিল। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্তি দেওয়ার প্রাক্কালে তাঁকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দেন যা বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যান করেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর কথোপকথন ছিল নিম্নরূপ : Bhutto ? Mujib Bhai (brogher), is there any possiblity that we can live together ?

Mujib : I will hold a public meeting in Dhaka. I will meet my people, discuss with them and inform you.

Zulfi played with his Bengali prisoner for another eleven days, leaving Mujib to simmer and sweat,. On 27 (December 1971) you said that we can have two or three things together, Zulfi reminded.

Mujib : Before that you have to allow me to go.

Zulfi offered : "You should be our president".

Julfi also offered fifty thousand dollors. But Mujib did not take money from him suggesting instead that he contribute it for his chartered plane" (Stanely Wolpart - Zulfi Bhutto of Pakistan, Oxford University Press, 1993, page 173-176). এমন অত্যাচার এবং প্রলোভন তাকে টলাতে পারেনি। এমন নেতাই তার দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার একমাত্র বঙ্গবন্ধুরই ছিল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার অর্জন করেছেন এ-বাংলার জনগণের জন্য তার সারাজীবনের আন্দোলন সংগ্রাম এবং সত্তরের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মধ্য দিয়ে। এটি কারো দান নয়। আর ওই অধিকার এবং স্বাধীনতা ঘোষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একাত্তরের ১০ এপ্রিলের (১৯৭১) স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে। যা হলো নিম্নরূপ :

"যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন। এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহুত এই পরিষদ স্বেচ্ছায় এবং বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবের্ত বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনে আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

১ মার্চ একাত্তর, দুপুর ১-০৫ মিঃ, বেতারে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। খবর শুনেই বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে এলো। তাদের নিকট এটা প্রতিভাত হলো যে

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর হাতে পশ্চিমারা কিছুতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। পূর্বাণী হোটেলে তখন আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভা চলছিল। হাজার হাজার ছাত্র জনতা পূর্বাণী হোটেলের দিকে ছুটল বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়া শুনার জন্য। সেখানে বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করলেন। ২ মার্চ রাতে কার্ফ্যু জারি করা হলো। ছাত্র-জনতা কার্ফু ভঙ্গ করলে সেনাবাহিনী গুলি চালাল। বেশ কিছু লোক হতাহত হলো। বাংলাদেশের সর্বত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুত ৩ মার্চ থেকে বাংলাদেশ পরিচালিত হলো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ২০ লক্ষ জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু কার্যত স্বাধীনতাই ঘোষণা করলেন। উচ্চারণ করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এর মাঝে পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রে বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা শুরু হলো। সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রচুর বাঙালি নিহত হলেন। সারাদেশে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটি সেনানিবাস ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো চিহ্নই রইল না সারা পূর্ব বাংলায়। বস্তুত বঙ্গবন্ধু দেশকে de facto স্বাধীন করে ফেললেন। এ বিষয়ে প্রতিথযশা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী জেড. আর খান-এর মতে: "He was the only political leader in the world history who established a de facto government in a nation of 75 million people through non-violent civil disobedience movement (Gandhi and King never established de facto government)" (illur R. Khan, The Third World Charismat : Sheikh Mujib and the Struggle for Freedom, University Press Ltd. dhaka 1996, pp. 1-5).

এ সময়ে বাংলাদেশের উপর বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ এতই ব্যাপক ছিল যে এ সম্বন্ধে লন্ডনের The Evening Standard যথার্থই লিখেছেন : "Sheikh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East Pakistan, with complete support of the population. Rahman's home in dhanmondi, already known as Number 10, Downing street in imitation of the British Prime Minister's residence, has been besieged by bureaucrats, politicians, bankers, industrialists and the people from all walks of life."

২৩ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন। এর মাঝে জেনারলে ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং পশ্চিম

পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনীতিবিদরা ঢাকায় এলেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক সহচরদের সঙ্গে তাদের আলোচনা শুরু হলো। কিন্তু ইয়াহিয়া ও ভুট্টো কিছুতেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উপস্থাপিত রাজনৈতিক সমাধানের ফরমুলা মেনে নিতে পারল না। আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তন থেকে সেনা ও সমরাস্ত্র আনা শুরু করল। এরই একপর্যায়ে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় জেনারলে ইয়াহিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা ত্যাগ করল এবং যাওয়ার পূর্বে সামরিক কমান্ডারদের নির্দেশ দিয়ে গেল গণহত্যা চালিয়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে দমন করার জন্য। ইয়াহিয়া পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার খবর এবং ক্যান্টনমেন্ট-এ পাকিস্তান আর্মির সাজসাজ রব, এর কিছুই দৃষ্টি এড়ালো না বঙ্গবন্ধুর। আসন্ন সামরিক হামলার বিষয় দেশবাসীকে সজাগ করলেন তিনি। প্রস্তুতি নিতে বললেন আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ, ছাত্র, শ্রমিক এবং জনগণকে আসন্ন হামলা প্রতিরোধে। ইপিআর পুলিশ, আনসার এবং সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন।

"The time comes in the life of any nation when there remains two choices- submit or fight. That times has now come to South Africa. We shall not submit and we have no choice but to hit back by all means in our power in defence of our people, our future and our freedom." (Manifesto of Umkonto, 16 Dec. 1961; by Nelson Mandela in Pretoria supreme Court on 20 april 1964). বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির জীবন ২৫ মার্চ এমনি একটি দিন। তড়িৎ গতিতে সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তা ছিল যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করা। আর সেজন্য ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগের খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু তার প্রতিবেশী এ কে এম মোশাররফ হোসেন (পরবর্তীতে শিল্পসচিব এবং বিএনপি এমপি ও প্রতিমন্ত্রী) মারফত জরুরি ভিত্তিতে একটি মেসেজ পাঠান চট্টগ্রামের এম আর এ সিদ্দিকীর কাছে। তার আত্মীয় মোশাররফ হোসেন প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশটি ছিল নিম্নরূপ :

"Liberate Chittagong, take over administration, Proceed for comilla." মোশাররফ হোসেন সরকারি প্যাডে পত্র নং সচিব/শিল্প-৬৩/৯০ তাং ৭/৩/৯০ মারফত লেখককে জানান, তিনি এম আর সিদ্দিকীর কাছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশটি টেলিফোনে প্রেরণ করেন (সরদার সিরাজুল ইসলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ জুলাই, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৭)। ২৫-এর রাতে সন্ধ্যা থেকে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন বিভিন্ন ভাবে লোকের মাধ্যমে। যে নির্দেশের মর্মার্থ

ছিল পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা। নয়ীম গহর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, রাত ৮ থেকে ১১ পর্যন্ত এই তিন ঘন্টার মধ্যে আমাকে চারবার বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আসা যাওয়া করতে হয়েছে। তার কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে এম আর সিদ্দিকীর কাছে বার্তা ও নির্দেশ পাঠানো। এম আর সিদ্দিকীর ওপর দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুর নতুন নির্দেশগুলো কার্যকর করা। নির্দেশগুলো এরকম :

Talk has failed, (2) Don't surrender arms (EPR, Police , Ansar, general public), (3) Let the people and other start..... (4) Liberate Chittagong, (5) Proceed towards Comilla, (6) Carry out my earlier orders even if I am not available (dead or captive), (7) confirm me back that Chittagong understood me clearly. (নয়ীম গহর, প্রসঙ্গ ২৫ মার্চে বঙ্গবন্ধুর চট্টগ্রাম পাঠানো নির্দেশ, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৭)।

২৫ তারিখ সন্ধ্যা রাতে যখন রক্তপাত এড়ানোর সকল পথ বন্ধ হলো, পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহরের রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং গণহত্যা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবার প্রক্রিয়া প্রায় শেষ করে আনেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দুটি ঘোষণা দেন। প্রথম ঘোষণাটি প্রস্তুত করেন রাত ১০ থেকে ১০-৩০ মিঃ এর মধো ঘোষণাটি প্রস্তুত ও বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে টেপে ধারণ করা হয় তার ৩২নং বাস ভবনে। ঘোষণাটি নিম্নরূপ : "This may be may last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to hte last. Your fight must to on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধারণকৃত এ টেপটি প্রচারিত হয় EPR (Signal) এর Subedar Major Sawkat Ali কতৃক প্রস্তুত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে তার EPR Head Quarters-এর বাসা থেকে। প্রচারের সময় ছিল ১২-১৫ মিঃ ভোর রাত ২৬ মার্চ। এ ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছিল voice mail এবং Morse Code G EPR head Quarters-এ গোলাগুলি শুরুর পর মুহূর্তে এটি প্রচার করা হয়। (প্রফেসর ড. সেলীনা পারভীন, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ইপিআর ওয়ারলেসে স্বাধীনতার ঘোষণা। আরও তথ্য দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুলাই, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৬, সংবাদ ৩১ মার্চ, ১৯৯৭)। এ সম্প্রচারের সত্যতা পাওয়া যায় পাকিস্তান

সেনাবাহিনীর গণসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের বই Witness to Surrender-এর বর্ণনা থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন, "When first shot has been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly thorough a wavelength close to that of official Pakistan Radio. In what must have been and sounded like, a prerecorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh" (Witness to surrender, Oxford University Press, Karachi 1977, page-75).

এর আরও প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর এবং বেলুচিস্তান এবং বাংলাদেশের গণহত্যার নায়ক জেনারেল টিক্কা খানের একটি ইন্টারভিউ থেকে। (মুসা সাদিক, স্বাধীনতার ঘোষণা; বঙ্গবন্ধু, জিয়া ও টিক্কাখান, দৈনিক 'জনকণ্ঠ' স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২৬ মার্চ, ২০০৪)। ১৯৮৮ সনে টিক্কাখান মুসা সাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমার কোঅর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি-ব্যান্ড রেডিও এনে বলল, 'স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।" আমি নিজে রেডিওতে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম। শেখ সাহেবের কণ্ঠ আমি ভালো করেই চিনতাম। সে ঘোষণা তখন দেশ-দ্রোহিতার শামিল ছিল। সে ক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমার কোনোবিকল্প ছিল না।" আর এক প্রশ্নের উত্তরে টিক্কা খান বলেন, "আমি ভালো করেই জানতাম শেখ মুজিবের মতো নেতা তার নিজের লোকদের ছেড়ে যাবে না কোথাও। আমি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জনা ঢাকার সমস্ত জায়গায়, প্রতটি বাড়িঘরে এমন কি কোণায় কোণায় তল্লাশি চালাতাম।"

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ : এটি প্রস্তুত করা হয় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর। এটি প্রচার করা হয় টিএন্ডটি এবং ইপিআর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে :

Declaration of war of independence :

Pak Army suddenly attacked EPR. Base at Pilkhana, Rajarbag Police Line and killing citizens. Street-battles are going on in every street of Dhaka and Chittagong. I appeal to the nations of the world for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to

fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, EPR, Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight. No compromise. Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland, Convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. May Allah bless you.

Joy Bangla
Sk. Mujibur Rahman
(দৈনিক বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২, পৃ. ১২)

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যোষণার বার্তাটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার জন্য তিনি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে যাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন, তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হলো। গণভবনে রক্ষিত ইংরেজিতে লিখিত উক্ত ঘোষণাপত্র যেভাবে তাদের নাম ও ঠিকানা লিখিত আছে তার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া গেল :

(1) Management and guidance by : A.K.S.M.A. Hakim, A.E.E., (2) Received and transmitted by : Md. Jalal Ahmed (T.T.R.) E.S.W., (3) Aided by : Gulhasuddin, Ex. E.P.R. T.T.R., (4) Aided by: Md. Shafiqul Islam, E.S.W., (5) Aided by : Abul Kashem Khan, T.T.R., (6) Aided by : Abul Fazal, Cashier.

এদের সাক্ষাতকার নিয়েছেন এবং সত্যতা যাচাই করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মযহারুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধু মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৬৪৪-৬৫০)।

এছাড়াও সারা বিশ্বের গণমাধ্যমে বিশেষ করে Print Media-তে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষরার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ২৭ মার্চ ১৯৭১ The Times পত্রিকার শিরোনাম ছিল Heavy Fighting as Sheikh Mujib Declares E. Pakistan Independent. Financial Times- এ ওই দিন ছাপা হয় Civil War After East pakistan Declares Independence. The Guardian পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় শিরোনাম ছিল

"UDI (Unilateral Declaration of Independence) by East Pakistan. বিশ্ববিখ্যাত এসব পত্রিকার শিরোনামই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য declassified documents থেকেও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ, ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলিলটি ছিল নিম্নরূপ :

Defense Intelligence Agency : Operational Intelligence division : 26 March 1971: 1430 EST transmitted.

Civil War in Pakistan :

Pakistan was thrust into civil war to day when Sheikh Mujibur rahman proclaimed the east Wing of tow-part country, the sovereign independent People's Republic of Bangladesh. Fighting is reported heavy in dhaka and other eastern cities where 10,000 men paramilitary Pakistan Rifles has joined police and private citizen in conflict with an estimated 23,000 West pakistani regular army troops. The continuing re-enforcement by sea and air combined with government stringent martial law regulation illustrated Islamabad committment to preserve the unity by force... the scapegoat." (Message received in White House, 26 March, 1971 at 3-55 p.m.)

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। ২৬ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়া তার ভাষণ বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বলে এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তিনি আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র বঙ্গবন্ধুই পাকিস্তানের শত্রু এবং পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার জন্য দায়ী :

"His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion- the man and his party are enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country- this crime will not go unpunished."

মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার মাধ্যমে "পূর্ব পাকিস্তানে মুজিব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো আইনগত জটিলতা আছে কিনা জানতে চান ইয়াহিয়া প্রখ্যাত আইনজীবি ব্রোহীর কাছ থেকে।" এটাও ছিল বঙ্গবন্ধুর রক্তপাত এড়িয়ে দেশ স্বাধীন করার কৌশল মাত্র। "মুজিব কৌশলে এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোনো সমঝোতায় না এসে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঘোষণা আদায় করতে চেয়েছিল।" ("জনকণ্ঠ" ১৩ জুলাই, ২০০৪ ইংরেজি, পৃষ্ঠা-৭৬।

ওয়্যারলেস-এ প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা চট্টগ্রামে পৌঁছে রাত ১টা নাগাদ এবং তা পেয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা লিফলেট, মাইকিং করে শহর ও গ্রামাঞ্চলে। সে রাতেই চট্টগ্রামের কতিপয় সেনা-কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুরোধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন পরে মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম প্রথম বিদ্রোহ করেন। মুক্তিযুদ্ধে স্বীয় অবস্থান গ্রহণের প্রেক্ষিত বর্ণনা করে ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম বিজয়মেলার অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে, "বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয় নিশ্চিত না হয়ে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সম্ভব ছিল না। কেননা সে সময় যদি রাজনৈতিক মীমাংসা হয়ে যেতো সে ক্ষেত্রে যদি কোনো সৈনিক বিদ্রোহ করত, কেউ তার কোর্ট মার্শাল ফেরাতে পারতেন না। তাই বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। মেজর জিয়াও বিদ্রোহ করেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর এবং স্বীয় জীবন রক্ষার তাগিদে যিনি ২৫ মার্চ রাত ১১-৩০ মিনিটের সময় "সোয়াত" জাহাজ থেকে পাকিস্তানিদের জন্য অস্ত্র খালাস করতে অগ্রসর হন। তার পক্ষে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে স্বাধীনতা ঘোষণা তো দূরের কথা, বিদ্রোহ করার মতোও মানসিকতা ছিল না।"

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা চট্টগ্রাম বেতার থেকে এম এ হান্নান ২৬ মার্চ দুপুরে প্রচার করেন। সে সূত্রে বিবিসির সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে এবং ২৭ মার্চ ব্রিটিশ ও অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক পূর্বপাকিস্তানকে স্বাধীন ঘোষণার খবর প্রচার করা হয়। (স্বাধীনতার দলিল, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৪৫১ এবং ৪৭২)।

ইপিআর ওয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য পাওয়া গেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মযহারুল ইসলামের "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব" গ্রন্থে (৩য় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, পৃ. ৬৪৭-৬৫০)। তিনি উল্লেখ করেছেন ২৫ মার্চ রাতে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে তিনি, কর্নেল ওসমানী এবং তাজউদ্দিন একটি কক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রস্তুত করার ব্যাপারে

বঙ্গবন্ধুকে সাহায্য করেছেন। বঙ্গবন্ধু dictate করছিলেন এবং ওসমানী সাহেব লিখছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রস্তুত করা হয় পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার পর। এটি প্রচার করা হয় টিএন্ডটি এবং ইপিআর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। প্রথম ঘোষণাটি সম্বন্ধে ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান রাত সাড়ে ১০টার সময় ইকবাল হলে এসে ছাত্রদের বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়ারলেসে প্রচারিত হবে। (সরদার সিরাজুল ইসলাম, "জনকণ্ঠ" জুলাই ১৪, ২০০৪ইং)। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর সাথে যারা দেখা করেছেন, তাদের মধ্যে সাংবাদিক আতাউস সামাদও ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি আক্রমণের খবর দিলে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরাও প্রস্তুত। তিনি আরো বলেন, I have given you independence, now preserve it (আজকের কাগজ, ২২-১-১৯৯৩)। এসব তথ্য প্রমাণ করছে বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণাটি সেই সময়ে টেপেবিধৃত হয়েছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার টেপটি জনৈক ছাত্র (শামসুল আলম মিলন) ২৫ মার্চ ১১টার কিছু সময়ের পূর্বে ইপিআর-এর পিলখানায় পৌঁছে দেন। মেসেজটি তিনি যখন সুবেদার মেজর শওকত আলীর নিকট হস্তান্তর করেন, তখন ওয়্যারলেস অপারেটর সিরাজুল ইসলাম সেখান উপস্থিত ছিলেন। সিরাজুল ইসলামের সূত্রেই এ তথ্য মিলেছে।

সুবেদার মেজর শওকত আলীর একমাত্র সন্তান ড. সেলিনা পারভিন (বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী-বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক) তখন ১ম বর্ষ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। রাজশাহী থেকে বাবার কর্মস্থল ঢাকায় বেড়াতে আসেন ফেব্রুয়ারি মাসে। তখন তিনি তার বাবাকে বেশ চিন্তিত দেখতেন। তিনি আরো দেখেন, তার বাবা নিজের কোয়ার্টারে (ইপিআর হেডকোয়ার্টার্সে) বসে একাধিক ট্রান্সমিটার তৈরি করছেন। ট্রান্সমিটারগুলো বসানো হয়েছিল নাবিস্কো বিস্কুটের চারকোণো টিনে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে ওর ভিতরে কী আছে। যুক্তরাষ্ট্রের Kansas Institute of Techonology থেকে Electronics-এ দেড়বছর ট্রেনিং সেরে ফিরে আসার পর সুবাদার মেজর শওকত অমানুষিক পরিশ্রম করে গড়ে তোলেন ইপিআর এর সিগনাল ওয়ার্কশপ। এই সময় কাজ-পাগল বলে পরিচিত সুবেদার মেজর কোন পার্ট নিয়ে কী করছেন, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান নাই। বাবা-কে ট্রান্সমিটার বানানোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় বকুনি খেতে হয় সেলিনা পারভীনকে। তখন কেউ না জানলেও পরে আর কারো বুঝতে বাকি থাকেনি, কেন বানানো হয়েছিল এসব ট্রান্সমিটার।

ড. সেলিনা পারভীনের কথায় :

২৫ মার্চ সন্ধ্যা হবার কিছুক্ষণের মধ্যে ইপিআর সিগনাল সেন্টার বন্ধ করে দেয়া হয় অস্বাভাবিকভাবে। তখন ঢাকা শহরে থমথমে অবস্থা। সিগনালের পাঞ্জাবি সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কর্নেল আওয়ান সবাইকে ব্যারাকে যেতে বলে নিজে সেন্টারে তালা লাগিয়ে দেয়। অপারেটররা একথা ত্বরিত গতিতে গিয়ে জানান সুবেদার মেজর শওকত আলীকে যিনি ছিলেন সিগনালস-এ বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চপদে। তিনি তখন সবাইকে তাদের ঘরে শুতে নিষেধ করেন এবং ছাদে বা অন্য কোথাও গিয়ে ঘুমাতে বলেন। এর কয়েকদিন আগে থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অবাঙালি সৈনিকদের হেলিকপ্টারে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পিলখানায় নিয়ে আসেন। এ নিয়ে পিলখানার বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে তীব্র বিরূপভাব বিরাজ করছিল। ২৫ মার্চের আগেই অধিকাংশ বাঙালি সৈনিককে কৌশলে নিরস্ত্র করা হয়। আর ২৪ মার্চ ওরা সুবেদার মেজর শওকতের কাছ থেকে সিগনাল সেন্টারের চাবি নিয়ে নেয়।

২৫ মার্চ রাত ১১টার কিছু পরে ইপিআর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নেসার আহমেদের বাড়ির দিক থেকে পশ্চিমা সৈন্যরা একটা ট্রেসার শেল ফায়ার করে। ট্রেসার শেল ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী গোলাগুলি শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ইপিআর ব্যারাক, কোয়ার্টার গার্ড দখলে নিয়ে নেয়। এ দিকে সুবেদার মেজর শওকত আলী তার কোয়ার্টারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সচল হয়ে ওঠে তার ট্রান্সমিটার। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি ট্রান্সমিট করতে শুরু করেন। তার সাথে আরো দু-একজন জড়িত ছিলেন। একজন ছিলেন তারই অপারেটর সিরাজুল ইসলাম। সেকথা পরে মিসেস শতকত জানতে পারেন কর্নেল আওয়ানের কাছ থেকেই। মিসেস শওকত তখন রাজশাহীর কোনো এক কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনি তার মেয়ে সেলিনা পারভীনকে সঙ্গে নিয়ে সেপ্টেম্বরের দিকে ইপিআর হেড কোয়ার্টার্স -এ আসেন এবং তার নিখোঁজ স্বামীর খবর জানতে চান। সে সময় কর্নেল আওয়ান মিসেস শওকতকে বলেন, "শওকতকে কি করে বাঁচাবো; সে ধরা পড়ে শেখ মুজিবের বাণী প্রচার করার সময়।" কর্নেল আওয়ান শওকত সাহেবকে বেশ পছন্দ করতেন তার ইলেক্ট্রনিক্স-এ দক্ষতার জন্য। সে রাতে অন্যরা বোধহয় বাকি সব ট্রান্সমিটারগুলো নিয়ে অন্য কোথাও থেকে সেই একই মেসেজে ট্রান্সমিট করার চেষ্টা করছিলেন। মিসেস শওকত পরে জানতে

পেরেছিলেন, রাত সোয়া দুটা বা তার কিছু পরে বেতারের মাধ্যমে মেসেজ ট্রান্সমিটরত অবস্থায় শওকত সাহেব পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

ধরা পড়ার পরে তাকে সেই রাতে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ নম্বর ব্যারাকে, তারপর মোহাম্মদপুর শরীরচর্চা কলেজের টর্চার সেন্টারে। পিলখানা থেকে শওকতের সাথে আরো বন্দি করে যাদের আনা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন সুবেদার মোল্লা, সুবেদার জহুর, সুবেদার মুন্সি, সুবেদার আবদুল হাই, সুবেদার আইয়ুব প্রমুখ। এদের সবাইকে পাকবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। নির্যাতন-অত্যাচারের পর প্রায় সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে। অলৌকিকভাবে বেঁচে যান সুবেদার আইয়ুব। মিসেস শওকত ঢাকা সেনানিবাসে ক্যাপ্টেন আখতার ও মেজর এজাজ মাসুদের সাথেও দেখা করে তার স্বামীর খোঁজ পাওয়া যায় কিনা জানার চেষ্টা করেন। তারাও মিসেস শওকতকে শেখ মুজিবের মেসেজ ট্রান্সমিট করা অবস্থায় ধরা পড়ার কথা বলেন।

মিসেস শওকত ও তার পরিবারের সদস্যরা বেঁচে যাওয়া সুবেদার আইয়ুব এবং মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল সেন্টারে খাবার সাপ্লাই দেওয়ার লোকদের কাছে জানতে পারেন, শওকত সাহেবকে অন্যান্যদের সঙ্গে কী অমানুষিক নির্যাতন করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সুবেদার আইয়ুব পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। কিছুদিন আগে সুবেদার আইয়ুব মারা গেছেন। এছাড়াও মিসেস শওকত ১৯৭২ সালে পেনসান তুলতে পিলখানায় গেলে তার স্বামীর সহকর্মীরা তাদের বন্দি জীবনের কথা তাঁকে জানায়। ইপিআর-এর একজন স্টেনোগ্রাফার মোহাম্মদ ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে চরমভাবে অত্যাচারিত হবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে মোহাম্মদপুর টর্চার কেন্দ্র থেকে মুক্তি পান। তিনিও এইসব ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী এবং এখনও জীবিত আছেন। আরো দুইজন সৈনিক মিসেস শওকতকে জানিয়েছিলেন, তার স্বামীর বন্দীদিনের কথা এবং তার ওপর বয়ে যাওয়া চরম অত্যাচারের কথা। তাদের একজনের নাম আবদুল মজিদ। সবকিছু পরিস্কার রাখা এবং বন্দীদের একবেলা করে খাবার দেওয়ার জন্য পিলখানা থেকে দু'জন সুইপার এবং একজন কার্পেন্টার আবদুল রউফকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মোহাম্মদপুর শরীরচর্চা কলেজে। তারাও এইসব ঘটনার সাক্ষী। তারা দেখেছেন, পাক জোয়ানরা ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত ও মুজিবের মেসেজ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য কী অমানুষিক অত্যাচারই না করত সুবেদার মেজর শওকতসহ অন্যান্যদের!

ইপিআর-এর ওয়ারলেসে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি টাঙ্গাইলেও ধরা পড়ে ২৬-এর ১ম প্রহরে। মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার আসাদুজ্জামান সেই ঘোষণা মাইকে ২৬ তারিখে দিনের বেলায় টাঙ্গাইল শহরে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সারাদিনই ওই প্রচার চলে। সারদা পুলিশ একাডেমির সিগনাল কোরও জানায় তারা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এবং শওকত সাহেবের গলায় ঢাকার বিদ্যমান অবস্থার বিবরণ সেই রাতে শুনেছেন। রাজশাহীর ইপিআর সিগনালস-এর লোকেরা ওই ঘোষণা শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। দিনাজপুরেও ইপিআর-এর এই ঘোঘণা ২৬-এর ১ম প্রহরে শুনতে পেয়েছিলেন।

চট্টগ্রামেও এই ঘোষণা শোনা যায় রাত দেড়টায়। সুবেদার মেজর শওকত দু'টার কিছু পর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ঢাকা আক্রান্ত হওয়ার খবর ওয়্যারলেসে সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে বিগ্রেডিয়ার নেসার (পাকিস্তানি) তার রিসিভারে ট্রান্সমিশনের সিগনাল দেখে শওকতকে খুঁজতে থাকেন, কারণ তারা জানত শওকত ওয়ারলেসে অত্যন্ত দক্ষ কর্মকর্তা। রাত দুটার কিছু পরে ওয়ারলেসে টান্সমিশনরত অবস্থায় সুবেদার মেজর শওকত তার বাসায় পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। অসহনীয় অত্যাচারের পর ২৮ মার্চ তারিখে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। এভাবেই শহীদ হন বাঙালির এই বীর সন্তান দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করার দায়ে। জাতির আজ এমনই দুর্ভাগ্য যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ২৬ মার্চে ইপিআর ওয়্যারলেসে পাঠানো স্বাধীনতার ঘোষণাকে অস্বীকার করার ফলে শুধু যে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করা হচ্ছে তা নয়, অস্বীকার করা হচ্ছে ইপিআর-এর এই সব বীর অফিসারদের জীবনদানের ঘটনাকেও।

ইতিহাসের বিকৃতি ও বাংলাদেশ

হাসান ফেরদৌস

"কমিসার ডিসএপিয়ার্স" অর্থাৎ কমিসার হাওয়া হয়ে গেলেন, এই নামে একটি বই আমার সংগ্রহে রয়েছে। লেখক ডেভিড কিং; নিউইয়র্ক থেকে ১৯৯৮ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। স্তালিনের রাশিয়ায় আলোকচিত্র ও চিত্রকথাকে মিথ্যা ইতিহাস নির্মাণে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, বইটি তারই প্রামাণ্য বিবরণ।

পাশাপাশি দুটি ছবি। প্রথম ছবিতে মস্কো-ভোলগা ক্যানালের সামনে স্তালিন, তার বামদিকে হাসিমুখে কেন্দ্রীয় জলবিষয়ক মন্ত্রী (বা কমিসার) নিকোলাই ইয়াজভ। ছবিটি সম্ভবত ১৯৩৭ বা ১৯৩৮ সালে তোলা। দ্বিতীয় ছবিটি দেখুন। একই ছবি, তফাৎ মাত্র এই যে, ইয়াজভ সেখানে আর নেই। ১৯৪০ সালে স্তালিন ইয়াজভকে গুলি করে হত্যা করেন। আপদ বিদায় হয়েছে। কর্তার নির্দেশে ইতিহাসের পাতা থেকেও সে আপদকে ছেটে বাদ দিয়ে তা নতুন করে বই ছেপে বের করা হলো।

ইতিহাসকে কর্তার ইচ্ছেমতো ঢেলে সাজানো, বইয়ের পাতায় সত্য-মিথ্যা যা খুশি ভরে দিয়ে তাকে ইতিহাস বলে চালানোর চেষ্টা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি আর্ট ফর্মে পরিণত হয়েছিল। প্রতিবাদ করলে সাইবেরিয়া, চাকরিচ্যুতি বা অন্য নানারকম নিগ্রহের ভয় ছিল। ফলে মানুষ চুপ করে থেকেছে। অনেকে সে ইতিহাস বিশ্বাসও করেছে। ডাণ্ডার ভয় দেখিয়ে প্রায় ৫০ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস এভাবেই লেখা হয়েছে। ডাণ্ডার ভয় যতো কমেছে, সে ইতিহাসে বিকৃতিও ক্রমশ ধরা পড়েছে। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে কোনো দেশই নেই। তার মোহাফেজখানার সিন্দুকের চাবি হাতবদল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের ইতিহাসের তাবৎ মসীলিপ্ত অধ্যায়, তার সব কলঙ্কও ফাঁস হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে কলঙ্কিত হয়েছেন সে দেশের লৌহমানব মহানায়ক স্তালিন। তার জীবদ্দশায় এমন কোনো বীরত্বসূচক বিশেষণ ছিল না যা তার নামে বাবহার করা হয়নি। এখন আমরা জানি তার সবটাই মিথ্যা। তিনি কোনো মহান বীর ছিলেন

না, তিনি ছিলেন এজন বর্বর, রক্তচোষা একনায়ক। এক স্তালিন নন, রাজতোষণ করে যারা সে একনায়কের ছাতার নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারাও আজ কলঙ্কিত। আমি কেবল রাজনীতিবিদদের কথা বলছি না। যারা স্তালিন ও তার সময়ের সোভিয়েতের মিথ্যা ইতিহাস লিখেছেন, আজ তারাও কলঙ্কিত। ইতিহাস এভাবেই তার বিকৃতির প্রতিশোধ নয়।

কিন্তু শুধু স্তালিন কেন, রাজদণ্ড ব্যবহার করে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা হয়েছে সভ্যতার একদম প্রথম প্রভাত থেকেই। প্রাচীন মিসরের ফেরাউন এবং গ্রিসের রাজারা সে চেষ্টা করেছেন। সেখানে যিনিই রাজা হয়েছেন, তিনিই নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছেন, অথবা তার পছন্দের দেবতাকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতার যেই হাতবদল হয়েছে, নতুন রাজা নির্ধারণ করেছেন নতুন ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পাতার অদল-বদল হয়েছে।

সময় বড় নির্মম বিচারক। এখন আমরা যখন পেছন ফিরে তাকাই, আর মূঢ় সেসব রাজরাজাদের কথা পড়ি, তখন না হেসে থাকতে পারি না। নিজেকে ঈশ্বর অথবা মহান বীর বা স্বাধীনতার ঘোষক বলে ঘোষণাকরলেই কি সে রাজা ঈশ্বর বনে যান? যে রাজার গায়ে বস্ত্র নেই, বংশধরেরা তাকে যতো বস্ত্রশোভিত বলে ঢক্কা-নিনাদ বাজাক না কেন, অধিকাংশ মানুষই কিন্তু নির্মোক রাজাকে দেখে মুখ টিপে হাসে, আর অপেক্ষায় থাকে কবে ক্ষমতার হাতবদল হবে।

আমার ধারণা, এসব রাজা ও তাদের বংশধরদের কথা মাথায় রেখেই দারুণ এক আপ্তবাক্য ছেড়েছিলেন আমার প্রিয় দার্শনিক জর্জ কান্তানজা। আশা করি জর্জকে আপনারা চেনেন। 'সায়েনফেলড' নামে যে সিটকম শোটি বছর দুয়েক আগেও আমেরিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান ছিল, তার অন্যতম কুশীলব জর্জ। মুখ্য চরিত্র জেরি সায়েনফেলডের তিনি সাইডকিক। তো এই জর্জ ঘোষণা করেছিলেন, যেকোনো মিথ্যা কথা কেউ যদি সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে মিথ্যা আর মিথ্যা থাকে না। তা সত্যই হয়ে পড়ে।

জর্জের সে দর্শন শুনে আমার বস্ত্রহীন সেই রাজার কথাই মনে পড়েছিল। তার গায়ে এক টুকরো সুতো নেই, অথচ তাবৎ পরিষদবর্গ "বাহ কী সুন্দর জামা!" বলে হাততালি দিচ্ছেন। রাস্তা দিয়ে আমাত্যবর্গ নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে যাচ্ছেন সে রাজা। ভয়ে টুঁ শব্দ করে না কেউ। কিন্তু এক বালক তার বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বলে ওঠে, 'ও মা, এ রাজা যে ন্যাংটো'!

মিথ্যাকে সত্য বলে যে বিশ্বাস করে, তা সে রাজা, রানী বা তার পারিষদ যেই হোক না কেন, তার দশা ওই ন্যাংটো রাজার মতোই।

বাংলাদেশে ইতিহাস নিয়ে বিকৃতির যে চেষ্টা চলছে, তার তুলনা খোঁজার জন্য আমাদের মিসর, গ্রিস বা সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে হবে না। প্রতিবেশী ভারত বা পাকিস্তানে গেলেই চলবে। বাংলাদেশের মতো এই দু'দেশেও ইতিহাসের বিকৃতির চেষ্টা মূলত হয়েছে স্কুলপাঠ্য বইতে। কারণ মিথ্যা কথাটা যদি একদম ছোটবেলা থেকে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে জর্জ কান্তানজার আপ্তবাক্যই যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে। তবে একেবারে দলিল-দস্তাবেজ থেকে নাম কেটে নতুন নাম ঢোকানোর যে চেষ্টা বাংলাদেশে হচ্ছে, তার তুলনা বোধ হয় এই দু'দেশেও পাওয়া শক্ত হবে। সে জন্য হাত বাড়াতে হবে ওই সোভিয়েত ইউনিয়নে।

সরকারি প্ররোচনায় ও উদ্যোগে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে প্রধান দুটি কারণে। এক, ক্ষমতায় নিজেদের অবস্থান জায়েজ করতে। রাজত্ব যতটা সম্ভব দীর্ঘায়িত করতে হলে দরকার কোনো নেতা বা দলকে 'গ্লোরিফাই' করা। ক্ষমতায় গিয়ে ফেরাউন নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করতেন ঠিক ওই কারণেই। স্তালিন থেকে মাও, কিম ইল সুং থেকে জিয়াউল হক, ইতিহাস নিয়ে তারা সবাই খোদকারি করতে গেছেন সে কারণেই। দুই, ক্ষমতাসীনদের আদর্শগত ক্ষেত্র পোক্ত করতে। পাকিস্তান তার ইতিহাসের গোড়া থেকেই নিজেকে একটি 'আইডিওলোজিক্যাল স্টেট' হিসেবে দাবি করে এসেছে। সে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে যুক্তি খোঁজা হয়েছে ইতিহাসে, প্রধানত ইতিহাসের বিকৃতির মাধ্যমে। ভারতেও বিজেপি ক্ষমতা দখলের পর একই চেষ্টা হয়েছে। বিজেপি নিজেদের একটি বিশেষ আদর্শের আধার ও নিয়ন্ত্রক বলে দাবি করে এসেছে। ক্ষমতায় বসে তাদের 'লেজিটিমেসি' নিশ্চিত করার জন্য তারা হিন্দুত্বের আদর্শ প্রচার করেছে সর্বতোভাবে। সে প্রচারণার অংশ হিসেবেই তারা ইতিহাস বই নতুন করে লেখার উদ্যোগ নিয়েছিল। বিজেপি আর ক্ষমতায় নেই, তাদের সে ইতিহাস প্রকল্পও তাই ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের বেলায় ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চলছে এই দু'কারণ থেকেই। ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে একজন হিরো চাই, চাই একজন দেবতা। সেটা এক কারণ। অন্য কারণ, বাংলাদেশ ক্রমশই একটি "আইডিওলজিক্যাল" রাষ্ট্রে রূপ নিচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের নির্বাচিত "আইডিওলজি" জায়েজ করার জন্যই তাই চাই ইতিহাস বিকৃতি।

পাকিস্তানের উদাহরণ থেকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। বছর দশেক আগে পাকিস্তানি গবেষক ও ঐতিহাসিক কে কে আজিজ "দি মার্ডার অব হিস্ট্রি" নামে একটি অসাধারণ গ্রন্থ লিখেছিলেন (ভ্যানগার্ড বুকস, লাহোর, ১৯৯৩)।

তাতে পাকিস্তানের স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের নেতৃত্বে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত কিভাবে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চলছে, তার প্রামাণিক বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একদম গোড়া থেকেই এই বিকৃতি চলছে, কিন্তু তা একটা রীতিমতো আন্দোলনে রূপ নেয় সামরিক শাসক জিয়াউল হকের সময় থেকে। জিয়া বেআইনিভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, কিন্তু সে দখলদারিত্বকে জায়েজ করার জন্য নিজেকে ইসলামের অকৃত্রিম খাদেম বলে হাজির করলেন তিনি। পাকিস্তানে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া ভুট্টোর আমল থেকে শুরু হলেও এই জিয়ার আমলেই তা একটি "টপ প্রায়োরিটি"র সরকারি প্রজেক্ট হয়ে ওঠে। নতুন করে ইতিহাস লেখাও শুরু হয় এই প্রজেক্টের অংশ হিসেবে। আজিজের বিশ্লেষণ থেকে এই বিকৃতির তিনটি স্পষ্ট লক্ষণ ধরা পড়ে।

প্রথমত, পাকিস্তানের আদি ও অকৃত্রিম ইসলামী ঐতিহ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ। এই নতুন ইতিহাস অনুসারে, এ দেশটি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পেলে কী হবে, সভ্যতার প্রথম প্রহর থেকেই সে ইসলামিক। তার বৌদ্ধ, হিন্দু বা শিখ কোনো ঐতিহ্য নেই, এসব সভ্যতার কোনো ইতিহাস তার ইতিহাসের অংশ নয়। সে বরাবরই ইসলামিক। কোনো কোনো পাকিস্তানি "ঐতিহাসিক" সিন্ধু-বিজেতা আরব ও মুসলমান সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাসেমকে প্রথম পাকিস্তানি বলে বর্ণনা করেছেন। (এ উদাহরণটি দিয়ে আয়েশা জালাল পাকিস্তানে সরকারি ইতিহাস চর্চাকে "Past as invention" বলে বর্ণনা করেছেন। তবে তার কথায় পরে আসছি।) ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন জাতীয় ভাষা উর্দু সবার শেখা উচিত, তার ব্যাখ্যা হিসেবে যেসব কারণ উল্লেখ করে তার অন্যতম ছিল এই যে, উর্দু শিখলে ইসলামী জীবনধারা ও দর্শন অনুধাবন ও তার অনুসরণ সহজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে কোমলমতি বালক-বালিকারা এ কথাটুকুও বুঝবে যে পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতির উৎস স্থানীয় সংস্কৃতি বা রীতিনীতি নয়,বরং তার সব নীতিই নির্ধারিত হয়েছে ইসলাম দ্বারা। সংস্কৃতির এই ইসলামীকরণের ফলে পাকিস্তানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যে তালেবানিকরণ ঘটে গেছে, তা এখন অবশ্য দিনের মতো ফর্সা।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলিম লীগ ও তার নেতাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। পাকিস্তানি সরকারি ইতিহাস অনুসারে, ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেন জিন্নাহ ও অন্যানা মুসলিম লীগ নেতা। ভারতীয় কংগ্রেসের এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা তো নেই-ই, উল্টো তারা ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলায় মুসলমানদের স্বার্থহানি করতে। ইংরেজ-বিরোধী

আন্দোলনে মুসলিম লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা কস্মিনকালেও যে কারাভোগ করেনি, সে কথা কোনো পাঠ্যবইতে ভুলেও জানানো হয় না।

তৃতীয়ত, ১৯৪৭ পরবর্তী ইতিহাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। পাকিস্তানি ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়েছে, ভারতই বারবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। আর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বারবারই সে আক্রমণ বীরত্বের সঙ্গে ভুল করে দিয়েছে (এমনকি ১৯৭১-এও) হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা কতটা শ্রেষ্ঠ তাও নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হলে কী হবে, এসব গ্রন্থ অনুসারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক-একজন জোয়ান ১০ জন ভারতীয় সৈন্যের চেয়েও শক্তিশালী। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আম ও ছালা দুটোই হারাতে বসলেও পাকিস্তানি পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে ভারত জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করলে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়ে অধিকৃত ভারতীয় এলাকা ছেড়ে চলে আসে। ১৯৭১ এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে ইতিহাস সেখানে লেখা হয়েছে এবং যার যুক্তিসঙ্গত বিবরণ আজিজ দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট হয় পাকিস্তানের চোখে পুরো ব্যাপারটি একটি ভারতীয় ও হিন্দু ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। সে ষড়যন্ত্রের নাটগুরু ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ও অন্যান্য পাকিস্তান বিরোধী চক্র তার সে ষড়যন্ত্রে পা দেয়। ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে, ফলে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আজিজের সে বই প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তানের ভেতরে ও বাইরে আরো অনেকেই সেখানে ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে লেখালেখি করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, এখন টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আয়েশা জালাল। পাকিস্তানে এখন ইতিহাস হচ্ছে সরকারী কল্পনার প্রকাশ (history as official imagining) সে কথা উল্লেখ করে আয়েশা জালাল ১৯৯৫ সালে লিখেছিলেন, পাকিস্তানের সরকারি নির্দেশে লিখিত ইতিহাসে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো বালাই নেই। আইডিওলজি সেখানে প্রথম এবং একমাত্র বিবেচনা। সরকারিভাবে গৃহীত আইডিওলজি জায়েজ করতে অতীত অর্থাৎ past নতুন করে নির্মিত হচ্ছে। পাকিস্তানের বেলায় সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো সরকারিভাবে আবিষ্কৃত ও সরকারি নির্দেশে লিখিত এই ইতিহাসকেই একমাত্র ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে এবং দেশের মানুষ ক্রমশ তা বিশ্বাসও করছে। জালালের ব্যাখ্যায়, পাকিস্তানের

রাষ্ট্রীয় আইডিওলজির ক্ষেত্রে যেমন; তার ইতিহাস রচনাতেও তেমনি প্রধান বিবেচনা হলো "আমরা বনাম তারা" এই বিভেদাত্মক সমীকরণ। আমরা অর্থাৎ মুসলমানরা হলাম সবচেয়ে সাচ্চা। ওরা অর্থাৎ হিন্দু ও অন্যসব ধর্মাবলম্বীরা, কোনোভাবেই আমাদের সমকক্ষ নয়। পাকিস্তানে যারাই ক্ষমতা দখল করেছে, তারাই "আমরা বনাম ওরা" ইতিহাসকে তাদের পক্ষে একটি মিত্র হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। জালাল মন্তব্য করেছেন, ইতিহাস যখন কল্পনানির্ভর হয়, তখন সে ইতিহাস শুধু ভুলই নয়, তা বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক হতেও বাধ্য।

জালাল লিখেছেন "Proximity to political power or state power, potential or actual, frequently drives creative imaginings to cut the corner into bigotry. The more ferocious the contest for power over representations of the 'us' the more likely the strains of bigotry towards not only 'them' but also the recal-cltrant us within" অন্যকথায়, ক্ষমতা আটকে রাখার উদ্দেশ্যে এই সরকারি ইতিহাস কেবল বহিরাগতকেই শত্রু করে বলে চিহ্নিত করে না, দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তিসমূহ, তা রাজনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিগত, যাই হোক না কেন, তাকেও শত্রু বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। পাকিস্তানের বেলায় তো বটেই, আজকের বাংলাদেশেও ঠিক এই লক্ষণটি প্রবল হয়ে উঠেছে।

সরকারি ইতিহাস চর্চায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আরো এক জায়গায় চমৎকার মিল রয়েছে। পাকিস্তান প্রসঙ্গে জালাল লিখেছেন, সেখানে ইতিহাসচর্চা মূলত কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ও সরকারি বুদ্ধিজীবীদের একটি যৌথ প্রকল্পে দাঁড়িয়ে গেছে। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলায় সরকারি পক্ষের একদল বুদ্ধিজীবী। সরকারি অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তারা যুক্ত। আমলাতন্ত্র ও সরকারি বুদ্ধিজীবীরা মিলে পাকিস্তানে যে ইতিহাসচর্চা—তা একটি বিশেষ ধরনের 'আর্ট ফর্ম'। বাংলাদেশেও এখন ঠিক এই আর্ট ফর্মের চর্চাই চলছে।

রাজনীতিবিদ ও আমলারা কেন ইতিহাসের বিকৃতি ঘটায় তা আমরা বুঝি। তাদের লক্ষ্য হালুয়া-রুটি। কিন্তু আপাতভাবে সৎ, বুদ্ধিমান গবেষক হিসেবে স্বীকৃত এমন বুদ্ধিজীবীরাও কেন সে ফাঁদে পা বাড়ান? এ প্রশ্ন তুলে নিজেই তার জবাব দিয়েছেন আরেক ভিন্নমতাবলম্বী পাকিস্তানি লেখক-বুদ্ধিজীবী আজমল কামাল। তার কথায়, একটা কারণ অবশ্যই মাল-কড়ি, চাকরি, সরকারি আনুকূল্য। কিন্তু সেটিই একমাত্র কারণ নয়। এসব বুদ্ধিজীবীর অনেকেই

সরকারিভাবে প্রস্তাবিত ও প্রচারিত আইডিওলজিতে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন বলেই নির্বিকার মিথ্যাচারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। এই আদর্শগত আনুগত্য থেকেই পাকিস্তানের সাদাত হাসান মান্টোর গল্পে হিন্দুয়ানি অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। যারা এ কাজ করেছেন, তাদের অধিকাংশই ক্ষমতা বলয়ের অন্তর্গত ছিলেন না। কিন্তু তা করেছেন বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ থেকেই। (ঠিক যেমন নজরুলের ওপর খোদগারি করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানি কবি গোলাম মোস্তফা।)

আমার মনে হয়, আজকের বাংলাদেশে ইতিহাস বিকৃতির যে প্রবণতা দেখছি, তাও এই দুই কারণপ্রসূত। শুধু মাল-কড়ি নয়, আদর্শগত আনুগত্যও একটি প্রধান কারণ।

সন্দেহ করি, এসব বুদ্ধিজীবী-ঐতিহাসিক তাদের অজ্ঞাতেই মহান দার্শনিক জর্জ কান্তানজার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা এই মুহূর্তে হয়তো বেশ আনন্দেই আছেন। কিন্তু বস্ত্রহীন রাজার গল্পটি যদি তারা মনে রাখেন, তাহলে ন্যাংটো বলে পরে গাল খেতে হবে না।

ঘোষণা পাঠ ২৬ মার্চ না ২৭ মার্চ

কে এম সোবহান

৩০ মে জে. জিয়ার একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী। তার দল তখন ক্ষমতাসীন। কাজেই স্বাভাবিভাবেই তার মৃত্যুবার্ষিকী খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়েছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ক্রোড়পত্র বেরিয়েছে। ক্রোড়পত্রে জিয়ার প্রস্বস্তি গাওয়া হয়েছে। তাও সাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জে. জিয়ার অবদান অবশ্যই আছে। তার অবদান শুরু হয় ২৭ মার্চ, '৭১-এ বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ থেকে। রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণার পাঠ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। দলগতভাবে বিএনপি এই ঘোষণাকে জিয়ার কৃতিত্ব হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছে এবং সেই সাথে ওই দল বলতে চায় যে ঐ ঘোষণা পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। জে. জিয়াই প্রথম ঐ ঘোষণা পাঠ করেন। বিএনপি'র গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে ঐ ঘোষণাটি উনি পাঠ করেন (দলের মতে ঘোষণা দেন) ২৬ মার্চ। এটি ইতিহাস বিকৃতির প্রচেষ্টা এবং যাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা তার অবদানকে খাটো করা।

সরকারি পর্যায়ে মৃত্যুদিবস পালিত হয়েছে এবং তার জন্যে যথেষ্ট অর্থ বায় করা হয়েছে বোধকরি সরকারি তহবিল থেকেই। টিভি যা সরকারি দল দলীয় প্রচার মাধ্যম হিসেবে প্রধানত ব্যবস্থা করে আসছে বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকেই জে. জিয়ার মৃত্যুদিবস পালনের দৃশ্য ফলাও করে বেশ সময় নিয়ে। তারপর একটি বিশেষ প্রোগ্রাম দেখানো হলো যার সময়সীমা ছিল পূর্ণ একটি ঘণ্টাব্যাপী। এতে আপত্তি ওঠে তখনই যখন এতে বৈষম্যের ছাপ থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে জে. জিয়ার মৃত্যু ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে যথা ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৭ই মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৭ই এপ্রিল, ২৬শে এপ্রিল, ৭ই জুন, ১৫ই আগস্ট ও ১৬ ডিসেম্বর ইত্যাদি। ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৬ই ডিসেম্বর বাদে এতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আর কোনোদিন পালিত হয়নি। সাত মার্চ জাতির জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন, ওই দিন বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণ সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয় না রেডিও-টিভিতে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন সম্পর্কেও কোনো কথা বলা হয় না। ১৫ আগস্ট যা বাংলাদেশের ইতিহাসের বাঙালি

জাতির একটি নিকৃষ্টতম কলঙ্কের দিন। কিন্তু যারা ওই দিনের হত্যাকাণ্ডের আত্মস্বীকৃত ঘাতক তারা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি চাকরি পায়, সংবিধান সংশোধনীর মধ্য দিয়ে তারা ক্ষমা লাভ করে। ওইদিনে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি একটি শ্রদ্ধার কথাও বলা হয় না। ওই কালোদিন পালন করা হয় না রাষ্ট্রীয়ভাবে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক। তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করা হয় না। বাংলাদেশ কোনো দলের নয়, বাংলাদেশের কোষাগারও কোনো দলের নয়। একজন রাষ্ট্রপতির মৃত্যুদিবসে পালিত হবে রাষ্ট্রীয়খাতে আর রাষ্ট্রের যিনি প্রধান পুরুষ তিনি থাকবেন রেডিও-টিভিতে উপেক্ষিত এটা জাতি কোনোদিন মেনে নেবে না। একটা দেশের ইতিহাস একদিনের ইতিহাস নয়। ইতিহাস বিকৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না যেমন হয় না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। ইতিহাস সম্পর্কে বলতে যেয়ে কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক শীলার বলেছেন, "পৃথিবীর ইতিহাস পৃথিবীর বিচারালয়।"এই বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সকলকেই। ইতিহাস তাদের বিচার করবে, সময় তাদের বিচার করবে। মহাকালের কোনো সময়সীমা নেই।

জে. জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অবদান কেউ অস্বীকার করে না তবে মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান শুরু হয় ওই ঘোষণা পাঠ থেকেই। মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার ঠিক আগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে একটি বার্তা ইপিআর-এর ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামে পাঠান থেকে। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান এটি পান। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং অবাঙালি সেনাদের সঙ্গে তাদের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানেও বাঙালিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইপিআর-এর মেজর রফিকুল ইসলাম (পরে বীরউত্তম) তার সৈন্যদের ক্যান্টনমেন্টের পেছনে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। অপরদিকে মেজর জিয়া তার সৈন্যদের কালুরঘাটের দিকে নিয়ে যান। বাঙালি সৈন্যরা এই দুই জনের নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে যায়। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতারা চট্টগ্রাম সৈন্যদের বিদ্রোহের কথা জনসমক্ষে প্রচার করার জন্যে একটি খসড়া তৈরি করেন। এই খসড়াতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঙালিদের রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতাদের কাছে আবেদন জানান হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের আহ্বান অনুযায়ী বাঙালিদের যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলার কথাও ছিল। প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন আওয়ামী লীগের এম এ হান্নান ২৬ মার্চ দুপুরে বঙ্গবন্ধুর নামে।

আওয়ামী লীগ নেতারা মেজর জিয়াকে ২৭ মার্চ সংগ্রামরত বাঙালি সৈন্যদের উদ্দেশে রেডিওতে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান। মেজর জিয়া ওই দিন (২৭ মার্চ) যে ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন তা তার নিজ কণ্ঠে হুবহু বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত ক্যাসেটে গৃহীত হয়েছে। ইংরেজিতে সেই ঘোষণায় মেজর জিয়া বলেন, "আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"। এটিই ছিল স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী কেন্দ্র থেকে তৃতীয় ঘোষণা পাঠ।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্বীকার করলে জে. জিয়ার অবদান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না এবং এটা অস্বীকার করে ঘোষণা পাঠের তারিখ ২৬ মার্চ এগিয়ে আনলে তার অবদান বৃদ্ধি পায় না। বরং তার ভাবমূর্তিকে খাটো করা হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের এগারটি সেক্টরের একটি সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি সেনাবাহিনীতে সর্বোচ্চ পদ পাননি। বঙ্গবন্ধুর সরকারই তাকে দুবছরের কম সময়ে মেজর থেকে মেজর জেনারেল করেন। এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা। আরও কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ সংক্ষেপে করা প্রয়োজন। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়। এর ফলে প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কথা আওয়ামী লীগকে। সাংবিধানিক সংকট এখান থেকেই দেখা দেয়। সংকটের মূল কারণ ছিল একদিকে ছয় দফার প্রতি বাঙালি ভোটারদের মত প্রকাশ অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পিপিপির নেতা জুলফিকার আলীর কঠোর মনোভাব যে কোনো মতেই আওয়ামী লীগের হাতে বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা চলবে না। ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীরও ওই একই মত ছিল। এর ফলে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা শুরু হয় যাতে যোগ দেন ভুটো এবং অন্য নেতারা। ১লা মার্চ থেকেই সারা বাংলাদেশে বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা বিরাজ করছিল। পাকিস্তান তথ্য দপ্তর ঢাকায় ৫ আগস্ট, '৭১-এ প্রকাশিত একটি শ্বেতপত্রে বলা হয় যে, '৭১-এর ১লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ১ লাখ বাঙালি প্রতিরোধকারীর মৃত্যু হয় সারা বাংলাদেশে। ঢাকায় ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং ইপিআর-এর পিলখানা যার কথা বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের পাঠান স্বাধীনতার ঘোষণায় ছিল। সিদ্দিক সালিক স্বাধীনতার ঘোষণায় ছিল। সিদ্দিক সালিক যিনি ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাবলিক রিলেশন্স অফিসার হিসেবে ১৯৭০-এর

জানুয়ারি মাসে আসে তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বই-এ কিছু ঘটনার বিবরণ আছে। সেখান থেকে জানা যাবে কি পরিস্থিতি ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের এবং সেখানকার রাজনীতি কিভাবে আবর্তিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর আদেশে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দৃষ্টিকোণ থেকে বইটি লেখা হয়েছে।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান '৪৭-এর আগস্টে দেশ বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। সে আন্দোলন ধীরেধীরে স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রামের রূপ নেয়। এই আন্দোলন থেকে সংগ্রাম এবং সর্বশেষে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির জয় হয়, বাঙালি জাতির জয় হয়, বাংলাদেশ বলে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা দেয়। এটা ছিল ২৪ বছরের দীর্ঘ আন্দোলনের ফল যাতে বাংলাদেশের গণমানুষ অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছে, অনেক রক্ত দিয়েছে, অনেক অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছে। মেজর জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল এটা মনে করাতে আত্মশ্লাঘা থাকবে তবে তার মধ্যে ইতিহাসের স্থান নেই। জে. জিয়ার ঘোষণা পাঠ থেকেই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত এটা জে. জিয়া নিজেও বিশ্বাস করতেন এবং অপরকেও তা বিশ্বাস করাবার সর্বপ্রকার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। এই অনৈতিহাসিক বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়ার জন্যে তিনি বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনারও সংশোধন করেন। সংশোধনের পূর্বে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল—"আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতির মুক্তির জন্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।" ১৯৭৮-এর সংবিধান সংশোধনে "জাতির মুক্তির জন্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথাগুলোর পরিবর্তে লেখা হলো—"জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধের"। এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে জাতির মুক্তির জন্যে ২৪ বছরের আন্দোলন ও সংগ্রামকে অস্বীকার করে "জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধের" কথা লিখে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামে যারা আত্মত্যাগ করেছে, রক্ত দিয়েছে তাদের কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে তাদের আত্মার প্রতি অসম্মান দেখানো হয়েছে। কৃতজ্ঞতা করা হয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণার ২৬ মার্চের কথা অস্বীকার করতে না পেরে জে. জিয়ার ২৭ মার্চের ঘোষণা পাঠকে এগিয়ে নিয়ে আসা হলো ২৬ মার্চে।

২৬ মার্চ না ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন (বিএনপির মতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন) এ নিয়ে বিতর্ক চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে।

জে. জিয়ার একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দৈনিক কাগজে যে ক্রোড়পত্রটি বের হয়েছে তাতেও ওই একই বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে বিভিন্ন লেখকের লেখার মধ্য দিয়ে। মনজুর আহমদ লিখেছেন '৭২-এর ২০ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাসে জে. জিয়ার যে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় সেটিই ছিল জে. জিয়ার সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি কিভাবে প্রথম চট্টগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন তারই বিবরণ। এই লেখাতে জে. জিয়ার বিদ্রোহের প্রথম চিন্তা আসে ৩ মার্চ '৭১। মনজুর আহমদের লেখায় আছে "বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলেন। বললেন, যার হাতে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হও, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।" পরে লেখা হয়েছে "২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান... প্রায় দেড় ঘণ্টা মোসাবিদার পর তিনি তৈরি করেন তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি। নিজেই সেটা তিনি বাংলা এবং ইংরেজিতে পাঠ করেন।" এখানে ঘোষণাটি পাঠের তারিখ এবং সময় ২৭ মার্চ সন্ধ্যা। রেজোয়ান সিদ্দিকীও দৈনিক বাংলায় তার লেখায় ২৭ মার্চের কথাই লিখেছেন। সৈয়দ আবদাল আহমদ এবং দৈনিক বাংলার উপসম্পাদকীয়তেও "সমদর্শী" লিখেছেন ঘোষণার তারিখ ২৬ মার্চ। "ডেইলি টেলিগ্রাফ" এ আকবর ইমাম লিখেছেন ২৭ মার্চ এবং ওই পত্রিকাতেই আবদুল মতিন লিখেছেন ২৬ মার্চ। এনায়েত খান 'নিউ নেশনে' লিখেছেন ২৭ মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

'দৈনিক সকালের খবর'-এ মন্ত্রী অলি আহমদ যিনি '৭১-এর মার্চে জে. জিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন লিখেছেন ২৭ মার্চ বিকালে জে. জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ওই কাগজেই জে. জিয়ার জীবনীতেও লেখা হয় ২৭ মার্চের কথা। 'সকালের খবর'-এর সঙ্গে জে. মীর শওকত আলীও যুক্ত আছেন। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত 'প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী'র (ঞ) অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে—'২৭ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই বিতর্কের অবসান হোক, সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক, জে. জিয়ার প্রাপ্য সম্মান তাকে দেয়া হোক।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের কয়েকজন রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধার বক্তব্য

তপন কুমার দে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন সে ঘোষণা চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ব্যক্তি পান। ঘোষণা পাবার পর তা বেতার মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে প্রচার করা হয় বিশ্ববাসীর নিকট।

রাত সাড়ে এগারটা থেকে বারটার মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার একটি বাণী টেলিফোনযোগে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসায় পৌঁছে।

সে সময় জহুর আহমদ চৌধুরী চট্টেশ্বরী রোডস্থ ওয়াপদা রেস্ট হাউসে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে কর্মপন্থা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী ডা. নুরুন্নাহার জহুর ফোন রিসিভ করে বাণীটি লিখে নেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে একাধিক কাগজে কপি করে পাঠান। এছাড়া টেলিফোনে চট্টগ্রামের সলিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশনে অবহিত করেন। মাঝ রাতে ১২টার পরে জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসা থেকে বাণীটি সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে আসার পর পরই নেতাদের মধ্য আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণীটি বিপুল সংখ্যায় সাইক্লোস্টাইল কপি করে মাঝ রাতে থেকেই সারা শহরে বিলি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ২৬ মার্চ সকালেই সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে বাণীটি রেডিওতে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণীটি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে ২৬ মার্চ দুপুরে প্রায় দুইটায় আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ও পরে ২৭ মার্চ কিছুটা পরিমার্জনাসহ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান পাঠ করেন। ২৬ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মরহুম এম এ হান্নান ও মরহুম জিয়াউর রহমানের ঘোষণা পাঠ ছাড়াও তৎকালীন বেশ কয়েকজন বেতার কর্মী এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ কর্মী স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারের ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগী ভূমিকা রেখেছিলেন।

(স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু প্রামাণ্য দলিল, মুহাম্মদ সামসুল হক। পৃ. ১৮-১৯)।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সম্পাদক এম এ হান্নান। এ সম্পর্কে জনাব এম এ হান্নান লেখেন ২৬ মার্চ খুব সকালে আমি, আতাউর রহমান কায়সার ও এম এ মান্নানসহ সেনানিবাসের দিকে যাই। পথের মধ্যে খুব সকালে আমি, আতাউর রহমান কায়সার ও এম এ মান্নানসহ বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদিগকে দেখতে যাই। উক্ত রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান তার কোম্পানি নিয়ে কালুরঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে আমরা জানতে পারি যে; সেনানিবাসে ইপিআর সেন্টারে প্রশিক্ষণরত বাঙালি জোয়ানদিগকে পাক বাহিনী রাতে হত্যা করেছে। জনাব হান্নান আরো উল্লেখ করেন; আমরা কালুরঘাটে যেয়ে জানতে পারলাম যে জিয়াউর রহমান বোয়ালখালির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা মেজর জিয়াকে বোয়ালখালি থানার কুসুমডাঙ্গা পাহাড়ের নিকট তার জোয়ানদেরসহ দেখতে পাই। তাকে শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাই এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাই। তবে ২৭ মার্চ তিনি কালুরঘাট আসবেন বলে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়।

জনাব এম এ হান্নান আরো বলেন, কালুরঘাট থেকে চলে আসবার সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, রেডিও মারফতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করি। প্রচারে আমাকে সহযোগিতা করেন রেডিও অফিসের রাখাল চন্দ্র বণিক, মির্জা আবু মনসুর, আতাউর রহমান কায়সার ও মোশারফ হোসেন প্রমুখ, এমপি ও এম এন-এ গণ।

২৭ মার্চ বিকেলে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেদিন রাতে আমি মির্জা আবু মনসুর ও মশারফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত প্রাক্তন মন্ত্রী এ কে খান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি পুনঃ ঘোষণার জন্য একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি হতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের নিকট আমি এ কে খানের খসড়াটি দেই এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ২৮ মার্চ সকালে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯১)।

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি ও জাতীয় পরিষদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা সম্পর্কে ইংরেজিতে লিখিত বিবরণে বলেন, ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টায় বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিবেশী মোশারফ হোসেন ও নঈম গওহরের মারফত টেলিফোনে জানান, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি সেনাবাহিনী ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীকে অস্ত্র ফেরত না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং জনসাধারণকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানাবার কথা বলেন।

চট্টগ্রাম জেলা সংগ্রাম পরিষদ পরিস্থিতি আলোচনার পর গোপন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরদিন ২৬ মার্চ সকাল প্রায় সাড়ে ৬টায় ইত্তেফাক, পত্রিকার চট্টগ্রামস্থ সংবাদদাতা মঈদুল আলম আমার স্ত্রী লতিফাকে টেলিফোন যোগে বঙ্গবন্ধুর একটি বাণী প্রদান করেন। বাণীটি চট্টগ্রামের ওয়্যারলেস অপারেটররা পেয়েছেন। তারবার্তার মতো সংক্ষেপিত ইংরেজিতে রচিত এই বাণীতে বলা হয় বাংলাদেশ ও বিশ্বের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাণী। রাত্রি ১২টার সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অতর্কিতে রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প ও পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি আক্রমণ করে। হাজার হাজার লোক নিহত হয়। ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের জন্য বিশ্বের নিকট আবেদন জানান। সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করুন। আল্লাহ আপনাদের সহায়ক হবে কামনা করি। জয় বাংলা। শেখ মুজিবুর রহমানের বাণীটি আমার হাতে দেওয়া হলো। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা করে বাণীটি অবিলম্বে বেতারে প্রচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে পাকবাহিনীর তৎপরতার ফলে আগ্রাবাদ রেডিও স্টেশনে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম শাখার বেলাল মোহাম্মদ, সুলতান আলী ও অন্যান্য স্টাফ সদস্যদের সাথে মিলিত হয়ে আলোচনার পর তারা কালুরঘাট রীলে স্টেশন থেকে বাণীটি প্রচার করার পরামর্শ দেন। ড. আবু জাফর এবং আরো কয়েকজন বাংলায় একটি ঘোষণা তৈরি করেন। এম এ হান্নান ঘোষণাটি পড়বেন বলে স্থির করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ মার্চ বেলা প্রায় ২টা ৩০ মিনিটের সময় এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর নামে ঐতিহাসিক ঘোষণাটি পড়েন। এই ঘোষণা স্বাধীনতার ঘোষণা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার এই ঘোষণা অনুযায়ী ২৬ মার্চ জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে।

মেজর জিয়া ও তার সৈন্যরা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরদিন ২৭ মার্চ জিয়া এক বেতার ভাষণে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা

করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানান । এর ফলে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা এবং জনসাধারণ হতভম্ব হয় । বেতার ভাষণ শুনে এ কে খান বলেন, এর ফলে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং দেশ-বিদেশের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না । তিনি ইংরেজিতে একটি নতুন খসড়া তৈরি করেন । মেজর জিয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরে নতুন খসড়াটি বেতারে প্রচার করেন । নতুন খসড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং ঘোষণাটি তার পক্ষে প্রচার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় । (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন, পৃ. ২২) ।

চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাবেক শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে বলেন : সে সময় আমি চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম । ২৫ তারিখে সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা আমরা সবাই চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এম আর সিদ্দিকী সাহেবের বাটালী হিলস্থ বাসভবনে একটি জরুরি বৈঠকে বসি । বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি । সেখানে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটা টেলিফোন দেয়া হয়েছিল । পাশের বাসায় সাবেক শিল্প সচিব থাকতেন । তার বাসায় যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোনে আমাদের জানিয়ে দেন । বঙ্গবন্ধু আপনাদের চট্টগ্রামের জন্য একটা ম্যাসেজ রেখেছেন, Proxceed to Comilla take over the local administration. এই নির্দেশ পাওয়ার পর আমরা স্থানীয় এম পি অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেই । সন্ধ্যে সাড়ে ৭টার দিকে আমরা তদানিন্তন এম সি এ মজিদ সাহেবকে বলে রেখেছিলাম যে, আপনি হালি শহরে ইপিআর-এর সাথে যোগাযোগ করুন । পূর্ব থেকে এ লাইনে আমাদের কিছু যোগাযোগ ছিল । অন্যানা নেতাদেরও যার যা করণীয় ঠিক করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ করার পর রাতে আমরা জহুর আহমদ চৌধুরীর বাসায় ফিরে আসি । সেখানে বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ ও করণীয় ঠিক করার একপর্যায়ে রাত সম্ভবত ১২টার কয়েক মিনিট পরেই দেখলাম যে, জহুর আহমদ চৌধুরী খামে করে আমাদের সামনে ৫/৬টা ম্যাসেজের খাম নিয়ে গেল । সেটা খোলা হলো, দেখা গেল সেখানে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘেষণা দিয়েছেন । ঠিক সে সময় অন্যানা বিষয় আলোচনার জনা বিভিন্ন দিকে আমরা চলে যাই । আমি এবং হান্নান সাহেব হাজারী গলির বিনেদা ভবনে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে গিয়ে বাণীটি বাংলায় বিলির জন্য কর্মীদের মারফত প্রেরণ করি । ২৬ মার্চ সকালে

পাথরঘাটাস্থ আক্তারুজ্জামান চৌধুরী সাহেবের বাসভবন জুপিটার হাউসে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয় যে, বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাটা বেতারে প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা আছে । সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৬ মার্চ দুপুর বেলায় সম্ভবত ২টার দিকে হান্নান সাহেব ঘোষণাটি বেতারে প্রচার করেন । পরের দিন ২৭ মার্চ মেজর জিয়া প্রথমে নিজের মতো এবং পরে সংশোধিত আকারে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন । (স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু প্রামাণ্য দলিল, মুহাম্মদ শামসুল হক পৃ. ২৬) ।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতা আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক এম এ হান্নান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দুপুরের পরে আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক ভাষণের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত বাণী সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করেন । তাঁর সাথে ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মোশারফ হোসেন ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আক্তারুজ্জামান সাহেব ও চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ জানতে পারেন ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, পাকবাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে এবং বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন । আওয়ামী লীগ অফিস হতে নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আক্তারুজ্জামান চৌধুরী তার বাসভবন জুপিটার হাউসে যান । সেখানে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেন । আলাপ আলোচনার পর কৌশল ঠিক করে কন্ট্রোল রুম থেকে তারা বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন করেন । ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অলি আহমদকে টেলিফোন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন । আপনারা বাঙালি অফিসাররা যে যেখানে আছেন সেখানে অবিলম্বে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন । চট্টগ্রামের ডিসি মোস্তাফিজুর রহমান, এস পি শামসুল হক, পার্বত্য চট্টগ্রামের ডিসি তৌফিক ইমাম এবং অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদেরও ফোন করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর দেয়া হয় । ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সাথেও তারা যোগাযোগের চেষ্টা করেন । তার স্ত্রী কাঁদো কাঁদো সুরে ফোনে বলেন, সামরিক কর্তৃপক্ষ তার স্বামীকে আগের দিন ২৪ মার্চ ঢাকা নিয়ে গিয়েছে । ২৬ মার্চ সকালবেলা আক্তারুজ্জামান চৌধুরী ও ডা. এম এ মান্নান ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমানকে খুঁজে বের করার

জন্য রওয়ানা হন। তাদের বলা হয় জিয়াউর রহমান কালুরঘাট ব্রিজ পার হয়ে বোয়ালখালির দিকে চলে গিয়েছে। বোয়ালখালিতে গিয়ে তারা খবর পান কয়েকজন আর্মি অফিসার করলডাঙ্গা পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে সম্ভবত মেজর জিয়াও ছিল। সকাল ১০টা-১১টার দিকে আক্তারুজামান সাহেব ও ডা. মান্নান বোয়ালখালি থেকে জুপিটার হাউসে ফিরে আসার পর চট্টগ্রাম জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে যোগাযোগকারীদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় পরিষদ সদস্য এম আর সিদ্দিকী, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম খালেদ, আবু সালেহ ও এম এ মজিদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জহুর আহমদ চৌধুরী, এম এম ওহাব, ডা. কাসেম, মোশারফ হোসেন, মির্জা আবুল মনসুর, ডা. ফয়েজ, মোহাম্মদ ইসহাক, আব্দুল্লাহ-আল-হারুন ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ মান্নান। আলোচনার পর নেতৃবৃন্দ স্থির করেন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বলিত বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রচার করা হবে।

আক্তারুজ্জামান চৌধুরী, এম এ হান্নান ও ডা. এম এ মান্নানকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের অফিসারদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা বেতার কেন্দ্রের প্রকৌশলীকে খুঁজে পেয়ে সন্ধ্যেবেলায় (২৬ মার্চ) তাকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে নিয়ে যান। আনুষ্ঠানিকভাবে বেতার কেন্দ্র চালু হওয়ার পর আক্তারুজ্জামান সাহেব ও ডা. এম এ মান্নান এবং আরো কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বিবৃতি তৈরি করেন। বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য দেশবাসী ও বিশ্বকে আহ্বান জানান হয়। হান্নান সাহেব বিবৃতিটি বাংলায় প্রচার করেন। পরে বিবৃতিটি ইংরেজিতে প্রচার করা হয়। আক্তারুজ্জামান চৌধুরী সাহেব তখন হান্নান সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। বেতার কেন্দ্র থেকে তারা জুপিটার হাউসে ফিরে আসেন। হান্নান সাহেবের বেতার ঘোষণা জহুর আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শুনেছিলেন। জহুর আহমদ সাহেব তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। সবাই মিলে স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণা দেয়ার কথা ছিল এবং কে এ ঘোষণা পাঠ করবে, তাও ঠিক করা হয়েছিল। এর ব্যতিক্রম হওয়ায় তিনি খুবই উত্তেজিত ও রাগান্বিত হন। তাকে বহু কষ্টে বুঝিয়ে বলার পর তিনি শান্ত হন। ঠিক হলো রাত ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে বেতার কেন্দ্রে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর বাণী পুনঃপ্রচার করবেন।

হান্নান সাহেবের ঘোষণা শোনার পর শিল্পপতি এ কে খান আওয়ামী লীগ নেতাদের বলেন, আপনারা বঙ্গবন্ধুর নামে অস্থায়ী সরকার গঠন করুন। অস্থায়ী সরকার গঠন না করলে পৃথিবীর কেউই স্বীকৃতি দিবে না। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ সম্পর্কে জরুরি আলোচনার পর স্থির করেন, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বলিত বাণী পাঠ করার পর তারা অস্থায়ী সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করবেন। কিন্তু চট্টগ্রাম শহরে ভয়াবহ গোলাগুলি চলার কারণে তারা ২৫ মার্চ রাতে বেতার কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেনি।

২৬ মার্চ সন্ধ্যে বেলায় মেজর জিয়ার সঙ্গে আক্তারুজ্জামান সাহেবের দেখা হয়। মেজর জিয়াকে তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে আপনি যদি বেতার যোগে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ডাক পুনঃপ্রচার করেন, তাহলে বাঙালি অফিসাররা বিদ্রোহে যোগদান করবে। কথায় কথায় আক্তারুজ্জামান সাহেব বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একটি অস্থায়ী সরকারের কথা চিন্তা করছেন। এ সম্পর্কে ঘোষণা প্রচারের কথাও তিনি জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেন। সম্ভব হলে সে যেন অস্থায়ী সরকারের কথাও ঘোষণা করে। জিয়া প্রথমে ঘোষণা প্রচার করতে রাজি হয়নি। বলে এই ঘোষণা প্রচার করলে সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে তার অসুবিধা হবে। আক্তারুজ্জামান সাহেব তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হলে তিনি তাকে সাহায্য করবেন।

আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলে, আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। জিয়া অস্থায়ী সরকারের কথাও উল্লেখ করে। এই বেতার ঘোষণা তিনি নিজে শুনেছেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন, পৃ. ২২-২৫)

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে জহুর আহমদ চৌধুরীর দ্বিতীয়পুত্র মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, বাবা তখন চট্টেশ্বরী রোডের ওয়াপদা রেষ্ট হাউসে ছিলেন। রাত সম্ভবত ১১ থেকে ১২টা হবে। আমাদের ৮০৭৮৫ নং টেলিফোনে একটি ফোন আসল। আম্মা ডা. নুরুন্নাহার জহুর ফোন রিসিভ করে তাড়াতাড়ি ইংরেজি কতগুলো কথা লিখে নিলেন এবং সাথে সাথে বাবাকে জানালেন, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের হত্যা শুরু করেছে। চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদের হেডকোয়ার্টারে বাবা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদেরকে স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানান এবং গুরুত্বপূর্ণ করণীয় বিষয়ে বক্তব্য দেন। স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারের ক্ষেত্রে ডা.

নুরুন্নাহার জহুরের ভূমিকা সম্পর্কে জানাব মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী বলেন'তিনি একজন সংগ্রামী ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন।' স্বাধীনতার এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি তিনি রাতের বেলা থেকেই বিভিন্ন স্থানে টেলিফোনে জানান এবং বাবার কথা মতো ওয়্যারলেস স্টেশনে পাঠান এবং বাইরের দুনিয়াতে প্রচার করতে অনুরোধ জানান।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হযেছে। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে কিছুটা তারতম্য লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী বলেন—আসলে ঘোষণাটি টেলিফোনে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে হয়। অনেকে লিখে নেয়ার সময় দু'এক শব্দ এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে। তাড়াহুড়োর মধ্যে টেলিফোনে সংক্ষিপ্তাকারে লিখে অন্যদের জানানো হয়েছিল। আর সময়টাতো ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। সব কাজই দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল। মানুষের মনে তখন আবেগ ছিল। উত্তেজনা ও ক্ষোভ ছিল সবার মধ্যে। এই অবস্থায় লেখার বা বলার সময় ভাষাগত কিছুটা এদিন-ওদিক হতে পারে।

জহুর আহমদ চৌধুরী অপর পুত্র হেলাল উদ্দিন চৌধুরী জানান, মাঝরাতে হঠাৎ একটা ফোন মা রিসিভ করেন। দু' চার কথা বলতেই ডেকে বলেন, এই কে আছিস, তাড়াতাড়ি একটা কাগজ ও কলম নিয়ে আয়, বঙ্গবন্ধুর বাণী এসেছে। আমি একটি খাতা ও কলম নিয়ে গেলাম। মা কি যেন কতগুলো কথা লিখে নিলেন। তারপর কয়েক জায়গায় ফোন করলেন। কিছুক্ষণ পর কয়েকটা টুকরো কাগজে একই কথাগুলো লিখলেন। আমি তখনও ছোট। অতএব, তখন সবকিছু বুঝিনি। পরে শুনেছি সেসব স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী যা যা কপি করেছিলেন। (স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু, প্রামাণ্য দলিল, মুহাম্মদ শামসুল হক পৃ. ২৬-২৭)।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতা মোশারফ হোসেন বলেন, হান্নান সহ আমি অনতিবিলম্বে কালুরঘাটস্থ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হই এবং আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি। হান্নান সাহেব স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম বক্তা এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্রঃ ১৫ খ, পৃ. ৩২৪)।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকালে সাড়ে সাতকোটি বাঙালির জন্য বয়ে এনেছিল এক সাগর রক্ত, হাহাকার আর শোকের কালো ছায়া। এমনি হতাশার মধ্যে চট্টগ্রামে বিলি হলো বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজি হ্যান্ডবিল। কেউ পেল, কেউ পেল না। সবাই তখন সঙ্কিত কম্পিত।

চট্টগ্রামের স্থানীয় চিকিৎসক ডা. সৈয়দ আনোয়ার আলী এমনি একটি হ্যান্ডবিল হাতে নিয়ে বাসায় এসে স্ত্রী ডা. মুনজুলা আনোয়ারের হাতে দিলেন। তিনি তাৎক্ষণিক অনুবাদ এবং কপি করেন। অনুবাদের কপিগুলো বিলি করাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। হ্যন্ডবিলে মুদ্রিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক বাণীটি চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রচার ছিল সর্বোত্তম কাজ। (একাত্তরের রণাঙ্গন; শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃ. ৩০।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক-উল-ইসলাম বলেন, টেলিফোনে আমি সর্বজনাব হান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী এবং এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাদেরকে একথাও বললাম যে, চট্টগ্রাম শহরে আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি একথা রেডিওতে প্রচার করা দরকার। সেই অনুসারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ একটি খসড়া ঘোষণা তৈরি করে দিলেন এবং সেটি চূড়ান্তভাবে সংশোধন করে দিলেন ডা. জাফর। বাঙালিদের হাতে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যও ঘোষণায় আহ্বান জানানো হয়। এই ঘোষণাটি চট্টগ্রাম রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টার কালুরঘাটস্থ স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ বেলা প্রায় আড়াইটায় চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান পাঠ করে শোনান। কালুরঘাটের ১০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারটির স্পষ্ট প্রচার ক্ষমতা ছিলো প্রায় ৬০ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত। তাই দেশের অবশিষ্ট অংশের জনসাধারণের অধিকাংশই কালুরঘাটে ট্রান্সমিটারের এই প্রথম ঘোষণা পরিষ্কার শুনতে পাননি। রেডিওর এই সীমাবদ্ধতার কারণে ২৬ মার্চ জনাব হান্নানের প্রথম ঘোষণা ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং পরে অপর কয়েকজনের ঘোষণাও স্পষ্টভাবে শোনা যায়নি। এমন কি প্রথম দিন অনেকেই রেডিওর কার্যকর আওতার মধ্যে থেকেও জনাব হান্নানের ভাষণ শুনতে পাননি। কারণে সাধারণত দুপুর আড়াইটায় অনেকেই রেডিও খোলেনি। (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, রফিক-উল-ইসলাম, পৃ. ৯৮ ও ৯৯।

স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সিরু বাঙালি লেখেন, ২৫ মার্চ দুপুর দুটোর দিকে পেট্রোল পাম্পের একজন কর্মচারী রেডিও-র নব ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ চট্টগ্রাম থেকে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" নামে একটি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা শুনতে পেল, সে খুশিতে চিৎকার করে আমাদের সবাইকে রেডিও-র সামনে জড়ো করল। ১ মিনিটের মধ্যেই চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন থেকে আমাদের সবার কানে মধু বর্ষণ করে একটি

দরাজ কণ্ঠ ভেসে আসল। কণ্ঠটি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান সাহেবের। তিনি তার নিজের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে থাকলেন বারবার। বঙ্গবন্ধুর ২৫ মার্চ রাত্রে ওয়ারলেস মারফত চট্টগ্রামে প্রেরিত একটি স্বাধীনতার ইস্তেহার তিনি পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন বারবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার সময় পুনরায় "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের" অনুষ্ঠান শোনার আহ্বান জানিয়ে রেডিও স্টেশনটি বন্ধ হয়ে গেল।

দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা একটি জাতির জন্য চট্টগ্রাম থেকে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এম এ হান্নান সাহেবের এই সাহসী পদক্ষেপ যে কি পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তা এখন আর বর্ণনা করা অসম্ভব। আমরা যে শেষ হয়ে যাইনি। আমাদের মহান নেতা যে, এখনও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে আছেন, এটা জেনে আমাদের মাঝে টনিকের কাজ করল।

সিরু বাঙালি আরো লেখেন, ২৭ মার্চ শনিবার দুপুরের পর আমি আবার গেলাম বহদ্দারহাট রেডিও ট্রান্সমিশন সেন্টারে। সেখানে আমি পৌঁছার আধঘণ্টা পর দেখলাম অত্যন্ত ব্যস্ত অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান মেজর জিয়াকে নিয়ে স্টেশনে প্রবেশ করলেন। সবাই তখন তাদের ঘিরে ধরেছে। মেজর জিয়া গাড়ি থেকে নেমেই চারদিকে লোকজন দেখে বেশ হম্বিতম্বি করলেন। সামরিক বাহিনীর একজন লোককে হুকুম দিলেন ফালতু লোকজনকে স্টেশনের বাইরে বের করে দিতে। মেজর জিয়া আরো নির্দেশ জারি করলেন, এখন থেকে সামরিক বাহিনীর লোকজনরাই ট্রান্সমিশন পাহারা দেবে। পাশ ছাড়া কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। এ সময় লেঃ শমসের মবিনকেও দেখলাম মেজর জিয়ার সাথে। মেজর জিয়ার এতো হম্বিতম্বি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে পলাতক একজন সৈনিক তিনি। অথচ এখনকার হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যে একজন দেশ বিজয়ী বীর। ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার একটি ভাষণ প্রচারিত হলো। মাত্র ৫০ কিলোয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রাম রেডিও ট্রান্সমিশনের এই সেন্টার থেকে প্রচারিত ভাষণটি চট্টগ্রাম শহরের ৩০/৪০ মাইলের মধ্যে সবাই শুনেন। তবে ২৭ মার্চে জিয়ার দেয়া ভাষণে অনেক অগোছালো ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য ছিল। তিনি প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে বসে থাকেন এবং বিদ্রোহের ডাক দেন। তাঁর এই অবিবেচনা প্রসূত বালকসুলভ বক্তব্যে চট্টগ্রামের সচেতন সমাজে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য মেজর জিয়ার নিজের কণ্ঠে আরেকটি

সংশোধিত ভাষণ প্রচারিত হয়। সে ভাষণে মেজর জিয়া আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ও বহির্বিশ্বের কাছে বিভিন্ন সাহায্যের আবেদন জানানোর কথা উল্লেখ করেন। মেজর জিয়ার এই ভাষণটি বহির্বিশ্বের সমর্থনের জন্য প্রয়োজন ছিল তখন। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বিভ্রান্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা সৈনিকদের এক জায়গায় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে এটি ছিল একটা সঠিক নির্দেশনা। যদিও চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর কোথাও এ ভাষণ শোনা যায়নি। তথাপি এটার গুরুত্ব সে সময়ের জনা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অন্ত ত চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেনাদের জন্য এ ভাষণ টনিকের কাজ করেছে বলে সকলের ধারণা। তবে আমরা যারা রাজনৈতিক সচেতন স্বাধীনতা প্রত্যাশী, তাদের কাছে হান্নান বা মেজর জিয়ার ভাষণের কানাকড়িও মূল্য ছিল না। (এটা বলা হলো এজন্য যে, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের এই ঘোষণা পাঠটি নিয়ে পরবর্তী সময়ে মেজর জিয়ার সৃষ্ট "বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসটিই বদলে দিবার অপচেষ্টা চালিয়েছিল এবং এ ব্যাপারটি নিয়ে নতুন প্রজন্মের যুবসমাজ ও চট্টগ্রামের বাইরের লোকজনকে বিরাট বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে ফেলেছিল।) কেননা এ ভাষণের বা আহ্বানের অপেক্ষায় আমরা কেউ বসেছিলাম না। তাদের এ ভাষণ বা আহ্বান প্রচারিত হবার অন্তত একমাস আগে থেকেই, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম।

ঢাকা বা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে চট্টগ্রাম রেডিও শোনা যায়নি, সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কারো কোনো প্রকার আদেশ, নির্দেশ বা আহ্বান ছাড়াই। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কবি আবদুস সালাম, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, এম এ হান্নান বা মেজর জিয়ার বেতারে ঘোষণা প্রচারিত না হলে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হতো না বা স্থবির হয়ে থাকতো? রংপুর, যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ কি চট্টগ্রাম বেতার শোনা গিয়েছিল? (বাংলা কেন যুদ্ধে গেল, সিরু বাঙালি, পৃ. ১২০-১২৩)।

মেজর জিয়া ও স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে বীর চট্টলার কৃতী সন্তান বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত সাংবাদিক সিরু বাঙালি লিখেছেন—চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আজিজ ভাই আমাকে কথায় কথায় একদিন জানিয়েছিলেন যে, মেজর জিয়া প্রথমে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বনামে কোনো ভাষণ প্রচার করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, তার স্বনামে বেতারে কিছু প্রচারিত হলে ক্যান্টনমেন্টে

অবস্থিত তার স্ত্রীকে পাকিস্তানিরা সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করবে। পরে অবশ্য তিনি কি মনে করে ভাষণ দিতে রাজী হন। সিরু বাঙালি আরো লিখেছেন, নিজের প্রাণ নিয়ে পালানো মেজর জিয়া জানতেনই না যে ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে যখন পাকিস্তানি হায়েনা সৈন্যরা বাঙালি নিরস্ত্র সৈন্যদের ওপর হামলা শুরু করে তখন তার প্রিয়তমা স্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়া (খালেদা বেগম পুতুল) অন্যান্য পলায়নপর সৈনিকদের সাথে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বেগম জিয়া ২৬ মার্চ সারাদিন চট্টগ্রামে কোন এক বাসায় অবস্থান করে মেজর জিয়ার কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারযোগে চাঁদপুর হয়ে ঢাকা আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিসেস জিয়ার দুর্ভাগ্য তিনি সেদিন চট্টগ্রাম ত্যাগ করতে পারেননি। ২৬ মার্চ সন্ধ্যার সময় মিসেস জিয়া যখন পাঁচলাইশ থানার দিক থেকে সদরঘাট নৌবন্দরের দিকে ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসছিলেন তখন চকবাজার অলিখা মসজিদের উত্তর পাশে কতিপয় যুবক তাঁকে আটক করেন। মিসেস জিয়া শারীরিক গঠন ও রুপলাবণ্য এতো বেশি ছিল যে, তিনি বারবার বাঙালি মেজরের স্ত্রী, বাঙালি মেজরের স্ত্রী বলে গর্বিত উচ্চারণ করতে থাকলেও কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি। ওখানে জমায়েত সকলেই এই মতো প্রকাশ করেন যে, এ মহিলা নিশ্চয়ই কোনো বিহারী বা পাঞ্জাবি অফিসারের বউ হবে, ঠেকায় পড়ে হয়তো বাঙালি জবান শিখেছে। বেশ কিছু উচ্ছৃংখল যুবক অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মিসেস জিয়াকে লাঞ্ছিত করারও চেষ্টা চালায়। তবে তার সৌভাগ্য যে আইয়ুব ও শামসু নামে দুজন সাহসী যুবক তাকে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করেন এর পর তিনি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা এডঃ বদিউল আলম এর জামালখান রোডস্থ বাসায় আশ্রয় পান। ২৭ মার্চ দুপুর পর্যন্ত মেজর জিয়ার কোনো হদিস না পেয়ে মিসেস জিয়া সেদিন স্টিমার যোগে চাঁদপুর চলে যান। মিসেস জিয়া চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পৌঁছার পরপরই পাকসেনাদের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেন এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর জেনারেল জামসেদ খানের তত্ত্বাবধানে ঢাকা সেনানিবাসে থাকেন। মিসেস জিয়ার পাক সেনাদের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেবার কারণ দেখিয়ে ১৯৭২ সালে মেজর জিয়া পুনরায় মিসেস জিয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হস্তক্ষেপে জিয়া তার স্ত্রীকে ফেরত গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

সিরা বাঙালি আরো লেখেন—৩০ মার্চ দুপুরে পাকিস্তান বিমান বাহিনী কর্তৃক চট্টগ্রাম বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে বিমান হামলা দেখে, মেজর জিয়া ৩০

তারিখ বিকেলে পেছনের যুদ্ধক্ষেত্রে তার অধীনস্থ সেনাবাহিনী ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে অরক্ষিত ফেলে রেখে রামগড় পালিয়ে গিয়েছিলেন।

যদিও তিনি যাওয়ার আগে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ জোগাড় করতে যাচ্ছেন তিনি। আদতে ওটি ছিল সত্যিকার অর্থে পালানোর একটি নিকৃষ্ট ওছিলা। পরবর্তী সময়ে মেজর মীর শওকত আলী কালুরঘাট ব্রিজের পূর্ব পাড়েও এক লোক সমাবেশে সুস্পষ্টভাবে মেজর জিয়ার পলায়ন মনোভাবের কথা উল্লেখ করে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। (বাংলা কেন যুদ্ধে গেল, সিরু বাঙালি, পৃ. ১২০-১২৫)।

চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের কর্মচারী পাংশা নিবাসী আব্দুল গফুর বলেন—২৫ মার্চ '৭১-এর বিকেলে চট্টগ্রাম লালদীঘির মাঠে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অভিবাদন গ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী এবং তার স্ত্রী জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী ডাক্তার নুরুন্নাহার চৌধুরী। সেই মুহূর্তে জনাব এম আর সিদ্দিকীর মুখে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত এক টেলিফোনের নির্দেশের কথা শুনে উক্ত অনুষ্ঠানেই ঘোষণা করেন যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক আজ তোমাদের পুরস্কার বিতরণী বন্ধ থাকবে।

বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিয়েছেন আগামী দিনের কালো রজনীর দুর্যোগের জন্য সবাই প্রস্তুত থাকুন। যার যার এলাকায়ও চরম প্রতিরোধের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করুন :

২৫ মার্চ, '৭১-এর রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে ক্যাপ্টেন রফিক ভাবছিলেন যুদ্ধে কি অন্যান্য সৈনিক আমাদের সাথে যোগ দিবেন? শেখ সাহেব কি ঢাকা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন? স্বাধীন জাতি দেখার সৌভাগ্য কি আমার হবে ?

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জেনারেল জিয়া শাজাহান সিরাজ, মীর শওকত ও কর্নেল অলির বক্তব্য

তপন কুমার দে

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপি নেতা লে. জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী (বীরউত্তম) বলেন, আমার জানামতে সবচাইতে প্রথম বোধহয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাই-এর কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬ মার্চ, '৭১ দুপুর দুটার দিকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরক যন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু পুরো দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তাহলে আমি বলব যে চট্টগ্রামের হান্নান ভাই এর সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ, '৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণার পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়।

মীর শওকত আলী আরো বলেন, এটা অনস্বীকার্য যে ২৫ এবং ২৬ মার্চ, '৭১-এর চরম মুহূর্তে প্রতিটি বাঙালির মনেই স্বাধীনতার কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই হিসেবে প্রতিটি বাঙালি সেদিন হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার এক একজন ঘোষক। কিন্তু কে সেই মহান নেতা যিনি সেদিন অন্তরালে থেকেও প্রতিটি বাঙালিকে যুগিয়েছিলেন এই সাহস? কার আহবানে বাঙালি সেদিন পেয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণা? ৭ মার্চ, '৭১ ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে কে জাতিকে ডাক শুনিয়েছিলেন? ২৬ মার্চ, '৭১ সন্ধ্যা হতে পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামের মূল বেতার কেন্দ্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে অবস্থান করে যারা স্বাধীনতার কথা বলেন, বিভিন্ন ঘোষণা প্রচার করলেন কে তাদের প্রেরণার উৎস ছিল? কার পক্ষে তারা প্রচার করেছিলেন সে সব ঘোষণা, স্বাধীনতার কথা? কাজেই বলুন, কে আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি? কে বা কারা ঘোষক ছিলেন, সেটা কি কেবল আনুষ্ঠানিকতা ছিল না? এই আনুষ্ঠানিকতার বিতর্কে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। (একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃ. ১৬৬-১৬৭)

১৯৭২ সালে "একটি জাতির জন্ম" শীর্ষক এক নিবন্ধে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বারবার জাতির পিতা বলে উল্লেখ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্টাফ একাডেমীতে শিক্ষা লাভকালে বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের অবহেলা ও অসম্মানের কথা উল্লেখ করে মেজর জিয়া বলেন : এমন কি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ক্যাডেড শেখানো হতো আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছে ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। মেজর জিয়া আরো বলেন : এরপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে সারাদেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগনাল বলে মনে হলো। এই নিবন্ধের কোথাও মেজর জিয়া ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে বলে দাবি করেনি। ২৫ মার্চ রাত্রি ১১টায় তার অবাঙালি কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জানজুয়া তাকে নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। বন্দরে যাওয়ার পথে মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী তাকে ক্যান্টনমেন্টে শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু হওয়ার সংবাদ দেয়। জিয়া তখন ফিরে গিয়ে কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেপ্তার করে। তারপর ব্যাটালিয়নে ফিরে গিয়ে সে লেঃ কর্নেল এম আর চৌধুরী ও মেজর রফিকের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করে। অতঃপর যে বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন কমিশনার ডিআইডি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের ওই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮ম ব্যাটালিয়ান কর্তৃক বিদ্রোহীদের খবর দেয়ার অনুরোধ জানায়। তারপর সে জে সি ও এবং জওয়ানদের ডেকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট, ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল।

মেজর জিয়া অপর একটি নিবন্ধে বলেন : ২৫ মার্চ রাত ১১টায় কমান্ডিং অফিসার জানজুয়া তাকে এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার নির্দেশ পাঠায়। রাত প্রায় সাড়ে ১১টার সময় জানজুয়া নিজে এসে তাকে সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে তুলে ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টে থেকে শহরের দিকে রওয়ানা করে দেয়। আগ্রাবাদ একটা বড় ব্যারিকেডের সামনে বাধা পেয়ে তার ট্রাক থামার পর ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান তার 'ডজ' গাড়ি থেকে নেমে এসে জিয়াকে টানতে টানতে রাস্তার একপাশে নিয়ে যান। তিনি জিয়াকে বলেন- পশ্চিমারা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরে বহু লোক হতাহত হয়েছে। জিয়া তখনই বিদ্রোহ করবে বলে ঘোষণা করেন। রাত দুটার সময় ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন-এর আড়াইশর মতো বাঙালি সৈন্যকে একত্রিত করে জিয়া তাদের

সব বুঝিয়ে বলে। সবাই একবাক্যে এই বিদ্রোহের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করে। ২৭ মার্চ সকালে বিমান বোঝাই হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে গেল পুরো দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন। নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ 'বাবর' কে নিয়ে আসা হয় বন্দরে। এতে ছিল দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য। ড্রেস্ট্রয়ার এবং এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ও নিয়োজিত হয়েছে এই যুদ্ধে।

পাক বাহিনীর বিরাট শক্তির কাছে মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না একথা বাঙালি সৈন্যরা বুঝেছিল। তাই শহরে ছেড়ে যাবার আগেই বিশ্ববাসীর কাছে কথাটা জানিয়ে যাওয়ার জন্য মেজর জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। প্রায় দেড় ঘণ্টা মুসাবিদার পর তিনি তৈরি করে তার সেই ঐতিহসিক ভাষণ। নিজেই সেটা বাংলা ইংরেজিতে পাঠ করেন। ৩০ মার্চ সকালে মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আর এক ঐতিহসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসাবে ঘোষণা করেন।

মেজর জিয়ার ডায়েরীতে নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—২৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল চট্টগ্রাম শহরের চারিদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রেডিও স্টেশনে এলাম। এক টুকরা কাজগ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটা এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণা লিখলাম। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছি সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘোষণা বেতারে প্রচার করলাম। ২৮ মার্চ সকাল থেকে পনের মিনিট পর পর ঘোষণাটি প্রচার করা হলো কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে। ৩০ মার্চ দ্বিতীয় ঘোঘণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধক্রমে। এই ডায়েরি অনুযায়ী মেজর জিয়া মোটামুটি ঘোষণা প্রচার করে। ২৭ মার্চ প্রচারিত প্রথম ঘোষণায় তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছে বলে উল্লেহ করেন। অথচ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গ্রন্থে বেলাল মোহাম্মদ প্রদত্ত বিবরণেও তার উল্লেখ নাই। বরং বলা হয় তার পরামর্শ অনুযায়ী মেজর জিয়া নিজের নামের শেষে তীর চিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন : অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার শেখ মুজিবুর রহমান। এম এ হান্নান, আবুল কাসেম খান, অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক, এম আর সিদ্দিকী, মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া ও মেজর রফিকুল ইসলাম তাদের লিখিত বক্তব্যে দাবি করেন, মেজর জিয়া তার প্রথম দিনের ভাষণে নিজেকে

অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক নেতাদের চাপে মেজর জিয়া তার উক্তি সংশোধন করে মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মুক্তিযদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছ বলে ঘোষণা করে। তারা বলেন—সংশোধিত ঘোষণা ২৮ মার্চ প্রচার করা হয় কিন্তু জিয়ার ডায়েরীতে রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধের কথা উল্লেখ করে বলা হয়—দ্বিতীয় ঘোষণাটি ৩০ মার্চ প্রচার করা হয়।

১৯৮১ সালের ২১ জুলাই এক সাক্ষাৎকারে মীর শওকত আলী বলেন—১৫ মার্চের দিকে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব জোরদার হচ্ছিল এবং ইতোপূর্বে ৭ মার্চ, '৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিলেন, তখন থেকেই আমরা বাঙালি সৈন্যরা চিন্তা করছিলাম যে একটা গণ্ডগোল বাঁধার এবং দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ২৫ মার্চ রাতে হত্যাকাণ্ড শুরু হয় তখন স্বভাবতই আমি বাঙালি হিসেবে আমার যা কর্তব্য আমি তাই করেছি। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল শওকত বলেন—"যখন থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ব্যাপারে বলতে শুরু করলেন এবং ৬ দফা দিলেন, তখন থেকেই আমরা খুব খুশি যে শেষ পর্যন্ত আমরা বাঙালিকে একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

আরো একটি প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল শওকত আলী বলেন—২৭ মার্চ, ৭১ সালে জেনারেল জিয়া বুঝতে শুরু করেন যে বেতারে একটা ঘোষণা প্রচার করা দরকার। ওই তারিখেই সন্ধ্যায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এটা করলেন তিনি। ২৭ মার্চ, ৭১ সন্ধ্যার পর থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হলো মেজর জিয়ার ভাষণ। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন, পৃ. ৩৪-৩৮।)

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সারা বাংলাব্যাপী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহযোগ আন্দোলন কেবলমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ আন্দোলনে সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত সাধারণ বাঙালি সৈনিকদের মধ্যেও বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তারাও আস্তে আস্তে স্বাধীনতার মোহমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন। তবে অফিসারদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের অনেকেরই এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা সংকোচ ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেজর জিয়া। তার বিধবা পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর তার যে জীবন বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, তা থেকেই এই উক্তির সারবত্তা মিলে।

এই জীবন বৃত্তান্তে বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন মেজর জিয়া বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তখন বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে চট্টগ্রাম পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সামরিক অফিসারদের হাতে বন্দি ছিলেন। এই তথ্যই প্রমাণ করে যে, মেজর জিয়া কোনো পূর্বপরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেননি। হঠাৎ করেই তাকে যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। এবং এই হঠাৎ করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করাতে মেজর জিয়া তার পত্নীকেও বলে যেতে পারেননি। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে তাকে তার অন্যতম সহকর্মী মেজর রফিক যে জোর করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে নিয়ে গেছেন, এটা দিবালোকের মতোই সত্য। তা না হলে মেজর জিয়া যদি পূর্বপরিকল্পনা মতো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেন তাহলে তিনি তার তৎকালীন তরুণী পত্নী বেগম খালেদা জিয়া ও শিশু পুত্র তারেককে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ভিতরের বাসায় রেখে যেতেন না। আগেই তাদের সরিয়ে দিতেন। বেগম খালেদা জিয়াকেও এই নয় মাস হানাদার বাহিনীর অফিসারদের হাতে বন্দি জীবনযাপনকালে এতো নির্যাতন ভোগ করতে হতো না। মেজর জিয়ার অন্যান্য সহকর্মী ও সেক্টর কমান্ডারগণ যেমন মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশারফ, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর জয়নাল আবেদীন ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান প্রমুখ পূর্বপরিকল্পনা মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেছেন এবং সেই মোতাবেক তাদের পরিবার পরিজন স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের আগেই ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কারো স্ত্রী পুত্র কন্যাদের পাক হানাদারদের হাতে বন্দি থাকতে হয়নি।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে সাবেক জাসদ ও গণফোরাম এবং বর্তমানে বিএনপি নেতা জনাব শাজাহান সিরাজ বলেছেন—২৫ মার্চ রাত এগারটায় বঙ্গবন্ধু ই পি আর ওয়্যারলেস মারফত enemy had stard us, hit them back. বার্তাটি বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় প্রেরণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস, একটি অনুসন্ধান, মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৪৮।

সাবেক জাসদ ও গণফোরাম নেতা এবং বর্তমান বিএনপি নেতা জনাব শাজাহান সিরাজ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন—শেখ মুজিব একটি নাম নয়, শেখ মুজিব একটি দর্শন। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষের যে সংগ্রাম যা আজ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে চলছে তা শুধু শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করেই নয় বরং শেখ মুজিবের দর্শন ভিত্তি করে এগিয়ে চলছে। অসহযোগ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংসদীয় পদ্ধতি ও সশস্ত্র

বিপ্লব এ দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠা মুক্তি সংগ্রামের এক নতুন পথ। এক নতুন দর্শন, মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, কিভাবে সংসদীয় পদ্ধতি ব্যর্থ হলে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয় এবং সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য যে জন সমর্থনের প্রয়োজন তা অসহযোগ ও সংসদীয় পদ্ধতিতে সৃষ্টি করে বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে শত্রুকে চরমভাবে আঘাত হানা যায়, সে আন্দোলনে শেখ মুজিব এক নতুন অধ্যায়। তাই পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একজন মুক্তির দিশারী হয়ে নতুন করে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

জনাব শাজাহান সিরাজ লেখেন—"বঙ্গবন্ধু শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অতিপ্রিয় নেতা যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে শত বছরের পরাধীন একজাতি এক নতুন সূর্যের সন্ধান। এবং যার প্রত্যাশায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ শত বুলেট, বেয়নেট, ট্যাংক, কামান আর মেশিনগানকে উপেক্ষা করে।

জনাব সিরাজ বলেন—এমনি এক মহান নেতার আশীর্বাদ ও পরিচর্যায় গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ তার জন্মলগ্ন হতে পাকিস্তান উপনিবেশবাদ কলুষমুক্ত শোষণহীন বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রাম করে আসছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত তুচ্ছ করে বাংলাদেশের জনগণের কাছে বিজয় নিশানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বেরিয়ে এসেছে ৫২, ৬২, ৬৬ ও ৬৯-এর রক্তঝরা ইতিহাস। শত শহীদের রক্তে পবিত্র মুক্তি শপথে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে এসেছে প্রতিটি কর্মী, যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশের মাটিতে গড়ে উঠেছে এক একটি গণজোয়ার তারাইতো জয় বাংলার দর্শনকে সামনে রেখে অর্জন করেছে '৭০-এর ঐতিহাসিক গণবিজয়।

জনাব শাজাহান সিরাজ আরো লিখেছেন—বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ পল্টনে ঘোষণা করে দিল বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতাকে। শুরু হয়ে গেল প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানালেন অসহযোগের, সাড়া দিলো লক্ষ কোটি জনতা সে ডাকে।

জনাব সিরাজ লিখেছেন—এরপর বাংলাদেশ চলতে শুরু করল আমাদের প্রিয় নেতার নির্দেশে। সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান মেনে চলছে সেই নির্দেশকে, বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর সরকার। ৬ তারিখে ইয়াহিয়ার ভাষণের জবাবে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমুদ্রের সামনে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত করলেন তার ঐতিহাসিক ঘোষণা। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জনাব শাজাহান সিরাজ আরো লিখেছেন—বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছি, কিন্তু নেতার সত্যিকারের একটা ছবি যে, আঁকতে পারিনি এটা সত্য। কেননা শেখ মুজিবকে কোনো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উক্তির মধ্যে বোঝা বড়ই কঠিন। তাকে বুঝতে হলে তাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে বাংলাদেশের এই মুক্তি আন্দোলনের স্তরে স্তরে। কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধুই সেটাকে না করে তার একটা বিচ্ছিন্ন উক্তিকে নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মেতে প্রকৃত মানুষটিকে না দেখে একটি বিকৃত মানুষের সন্ধান করে ফেরেন। সেখানেই বন্ধুরা ভুল করে বসেন। তাকে বুঝতে হলে দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে আবদ্ধ এমন একটি জাতীয় ইতিহাসে ফিরে যেতে হলে সেখানে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে। কেননা মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে শেখ মুজিব একটি নতুন দিগন্ত। তাই সর্বশেষ আমি আবার সেই কথাই বলব, শেখ মুজিব একটি নাম নয়, শেখ মুজিব একটি দর্শন। (কৃত্তিবাস ওঝা, আমি মুজিব বলছি, পৃ. ৫-৮)।

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জনাব শাজাহান সিরাজ বলেন, বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার স্থপতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ঘোষণা দানের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান। জনাব শাজাহান সিরাজ আরো বলেন—যতোদিন পৃথিবী থাকবে শেখ মুজিবের নাম থাকবে। যতোদিন পৃথিবীর ইতিহাস থাকবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকবে। জনাব সিরাজ আরো বলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ছিল অভিন্ন এবং এ মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা ও স্বাধীন বাংলার স্থপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আরো বলেন—আমরা শেখ মুজিবকে অস্বীকার করি না। '৭১-এর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত হলে আমরা সবাই মিলে তা প্রতিহত করবো। (বাংলার বাণী, ৪-৩-৯০, প্রথম পৃষ্ঠায়, ৪র্থ কলাম)।

১৯৭৬ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মেজর জিয়ার বাণীর উদ্ধৃতি, আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী সেনাপতি শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতোমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে একটি সার্বভৌম আইনানুগ সরকার গঠন করেছি যা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী কাজ চালাতে প্রতিশ্রুত। সুতরাং আমরা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী দেশের প্রতি আইনসঙ্গত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের

আহ্বান জানাচ্ছি। (১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত)

১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটের সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত স্মৃতিচারণমূলক এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মেজর জিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বেগম জিয়ার মন্ত্রী পরিষদের প্রভাবশালী সদস্য কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেন—মেজর জিয়া ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বক্তব্য

তপন কুমার দে

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ সকালের পর মেজর জিয়া চট্টগ্রামে ছিলেন না। ২৭ মার্চ তাকে পটিয়া থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে আনা হয়। বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন টেলিফোনে চন্দনপুরার তাহের সোবহান একজন মেজরের হদিস দিয়েছিলেন। যিনি বন্দরে নোঙ্গর করা পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ বাবর ও সোয়াত থেকে অস্ত্র খালাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ঢাকায় পাকিস্তান হামলার খবর শুনে সে কাজে বিরত ও সেই রাতেই অর্থাৎ ২৬ মার্চ সঙ্গী জোয়ানদের নিয়ে পটিয়ায় অবস্থান নিয়ে ছিলেন। জনাব বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন মাহমুদ হোসেন ও আমি যখন পটিয়া পাহাড়ে পৌঁছলাম তখন দ্বিপ্রহর। ঘটনাচক্রে পটিয়া থানার ওসি হিসাবে আমার পূর্বপরিচিত মানিক মিঞাকে পেয়েছিলাম। তার মুখেই মেজর জিয়ার নাম জানতে পেরেছিলাম। জিয়া আগের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ৭:৪০ মিঃ এ এবং রাত ১০টায় প্রচারিত বেতারের দুটো অধিবেশনই শুনেছিলাম। আমার যাওয়া মাত্রই তার ভাসমান ছাউনি পটিয়া থেকে কালুরঘাট প্রচার ভবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ২৬ মার্চ, '৭১-এর বিকেল বেলায় কালুরঘাট সাব ট্রান্সমিটারকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নাম দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, সৈনিক জনাব বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন—২৭ মার্চ সন্ধ্যা অধিবেশনে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণাটি অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রচারিত হয়েছিল। শেষতম উচ্চারণ ছিল খোদা হাফেজ, জয় বাংলা। প্রচার ভবনে আমার প্রস্তাবে মেজর জিয়া তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর ঘোষণার মূল ইংরেজি লিপি রচনা ও বাংলা অনুবাদ লিপি তৈরিতে সহযোগিতা করেছিলাম আমরা তিনজন ক্যাপ্টেন অলী আহম্মদ, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ ও আমি। বেলাল মোহাম্মদ আরো লেখেন—কারণ একাত্তরের সেই চরম মুহূর্তে শেখ মুজিব ছাড়া অপর কোনো জননায়কেরই রাষ্ট্র বা দেশপ্রধান হবার পটভূমি ছিল না। একজন অজ্ঞাতনামা সামরিক

অফিসার তো নয়ই। বাংলাদেশের অপর কোনো রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে অনুরূপ দাবি তখন প্রযোজ্য ছিল না। পাকিস্তানের সামরিক সরকার গণরায়ের অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তো শেখ মুজিবের কাছেই তা করতেন। মুজিব যেমন বাঙালি জাতির তিল তিল ভালোবাসা পেয়ে হয়েছেন মহানায়ক তেমনি বাংলা ও বাঙালি-প্রিয়-মুজিবের জীবন উৎসর্গকারী মহাসংগ্রামের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। আর তাই শ্রেষ্ঠতম বাঙালি সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতিসৌধের নাম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের শেষধাপে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতিকে জানিয়ে দিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এবং ২৬ মার্চ, '৭১-এর প্রথম প্রহরের শুরুতে বাংলাকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ বলে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে বাঙালি জাতির যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার আপামর জনতা যার হাতে যে অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্রক। বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণার পর মুহূর্তে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি কারাগারে। তাই সেই মহা পরীক্ষার দিনে আর কেউ নন, কেবল মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির মাথার মণি হিসেবে, বাঙালি জাতির প্রতীক হিসেবে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের কাছে গৃহীত হন। (স্বাধীনতার ঘোষক কে, ইমন সরকার, পৃ. ৬০-৬৪)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রধান অনুষ্ঠান সংগঠনক শামসুল হুদা তার একাত্তরের রণাঙ্গন গ্রন্থে উল্লেহ করেন—ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান বেলা প্রায় দুটার সময় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে আনুমানিক পাঁচ মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ রেখেছিলেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণীর আলোকেই ছিল জনাব এম এ হান্নানের এই ভাষণ। স্পষ্টতই চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংগঠিত বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অনুষ্ঠান শুনতে পেয়েছিলেন ১৯৭১ সালরে ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটের সময়ে। এই বেতারের প্রথম সন্ধ্যা অধিবেশনেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদটি উপস্থাপন করেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ, ৭১-এর সন্ধ্যা অধিবেশনে সদ্য গঠিত স্বাধীন বাংলা বেতারে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করেন মেজর জিয়া। এরপর মেজর জিয়া আরো দুদিন স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন ২৮ ও ৩০ মার্চ, '৭১। (একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী (৩০/৩২/৩৩ পৃ.)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক বেলাল মোহাম্মদ উল্লেখ করেন যে, ২৬ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে ড. আনোয়ার আলী, কাজী হোসনেরা, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ঘোষণা লিপি তৈরি করতে বসে এক টুকরা কাগজে তিনি লিখলেন "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বললেন, বেলাল ভাই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র বললে ভাল হতো না। বেশ তো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। এবার বেলাল মোহাম্মদ লেখার মাঝখানে তীর চিহ্ন দিয়ে বিপ্লবী শব্দটি লেখেন। অবশ্য দু'দিন পরেই ২৮ মার্চ কেন্দ্রের নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। বিপ্লবী শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল মেজর জিয়াউর রহমানের বরাত দিয়ে লে. শমশেরের প্রস্তাবক্রমে। (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বেলাল মোহাম্মদ, পৃ. ৪৬-৪৭)।

বেলাল মোহাম্মদ লেখেন, ২৭ মার্চ পটিয়ায় নিয়ে স্থানীয় থানার ওসি মানিক মিয়ার সহায়তায় তিনি মেজর জিয়ার সাথে দেখা করেন। ২৬ মার্চ জিয়া তাদের সন্ধ্যে ৭টা ৩০ মিনিট এবং রাত ১০টার অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনটি পাহারা দেয়ার জন্য বেলাল মোহাম্মদ মেজর জিয়াকে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে মেজর জিয়া বিকেল পাঁচটায় পর ট্রান্সমিটিং কেন্দ্রে পৌঁছায়। অফিস কক্ষে তখন শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। আমি মেজর জিয়ার কণ্ঠে কিছু প্রচার করার প্রস্তাব করি। কথাটি রসিকতা করে বললেও তিনি এর গুরুত্ব দেন। মেজর জিয়া কিছু বলার জন্য রাজী হন এবং নিজের পকেট থেকে কলম ও বেলাল মোহাম্মদের কাছ থেকে একপাতা কাগজ নিয়ে লেখেন, আমি মেজর জিয়া এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এরপর আমি মেজর জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বলার প্রস্তাব করি। তখন তিনি নিজের নামের শেষে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখেন— আমাদের মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে।

২৭ মার্চ সন্ধ্যা অধিবেশনে মেজর জিয়ার কণ্ঠে ঘোষণা প্রচারের পর তার অনুবাদ অন্যান্যদের কণ্ঠে বারবার প্রচারিত হয়। ঘোষণাটি ক্যাপ্টেন অলী আহমদের উপস্থিতিতে প্রধানত বেলাল মোহাম্মদের সাথে আলোচনা করে রচিত হয়। অনুরোধের সময় অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ তাকে সাহায্য করেন। ঘোষণার মর্মবাণী ছিল মেজর জিয়া মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বেলাল মোহাম্মদ উল্লেখ করেন, আনোয়ার আলী আমার হাতে একটি সাইক্লোস্টাইল করা হ্যান্ডবিল এগিয়ে দিয়ে ছিলেন। শিরোনাম জরুরি ঘোষণা। নীচে স্বাক্ষর শেখ মুজিবুর রহমান। বিষয়বস্তু ছিল আজ রাত বারটা পাক আর্মিরা ঢাকার পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন-এ আক্রমণ চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধ চলছে আমি এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এবং বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, অধিবেশন চলাকালে আমি স্টুডিওতে অবস্থান করেছিলাম। এমন সময় একজন আমাকে ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়েছেন। স্টুডিওর বাইরে দাঁড়ানো দু-জন আগন্তুক একজন আমাদের পূর্ব পরিচিত ডা. আবু জাফর অন্যজন এম এ হান্নান বলেছিলেন—আপনারা মাইকে আমার নাম ঘোষণা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রচার করবো। এরপর বেলাল মোহাম্মদ বলেন, আপনার নাম প্রচার করা যাবে না। আপনি নিজের কণ্ঠে শুধু এটি পাঠ করবেন। এ সময় এম এ হান্নান বলেন, কেন দুপুর বেলায় আমিতো নামসহ এটি প্রচার করেছিলাম। এখন অবশ্য বক্তব্যটি একটু বড় করা হয়েছে। এবার বেলাল মোহাম্মদ বলেন, দুপুর বেলায় আপনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন। এখন তো তা নয়। এখন থেকে এ হচ্ছে একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র। এম এ হান্নান মেনে নিয়ে দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার নিজের কণ্ঠে করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বেলাল মোহাম্মদ বলেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র সংবাদ আকারে পাঠ করেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। সাইক্লোস্টাইল করা বার্তাটি ডা. আনোয়ার আলী আমাকে দিয়েছিলেন। সাইক্লোস্টাইল বার্তাটি ছিল একটি ঘোষণাপত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন শেখ সাহেব। নীচে শেখের দস্তখত। শেষের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি বারবার প্রচার করা হলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচার করা হয়; একটি জাতি একটি দিগন্তে এসে মিশেছে। সেই দিগন্ত শেখ মুজিব। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এক হয়েছে এক কেন্দ্রবিন্দুতে। এই কেন্দ্রবিন্দু শেখ মুজিব। প্রচার করা হয় আজকে বিশ্ব ইতিহাস জানে একটি মাত্র নামে পরিচিত সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি জাতি, একটি মাত্র শব্দে বাংলার আকাশ বাতাস উষ্ণ অধীর—সেই শব্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

২৬ মার্চ রাতে হঠাৎ চট্টগ্রাম বেতারের মিটারে ঘোষণা করা হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের সাথে যে আলাপ আলোচনা করেন তা ব্যর্থ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের হটকারিতার ফলেই এই ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে গত রাতে বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া সর্বত্রই নিরীহ জনসাধারণের ওপর অতর্কিতে হামলা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

ভাষা সৈনিক জনাব গাজীউল হক তার বাংলাদেশ আনচেঞ্জ গ্রন্থের শেষাংশে "অ্যাজেন্ডা এ ফ্রাগোলোজি অব মেইইভেন্টস" পর্যায়ে ২৬ মার্চ, '৭১-এর ঘরে লেখা হয়েছে। টেন ফ্রিডম ফাইটার্স অকুপাইড চিটাগাং রেডিও স্টেশন, টিক্কা খান ব্রডকাস্ট ওয়াজ স্টপড। শেখ মুজিবুর ডিক্লারেশন ওয়াজ ব্রডকাস্ট। অন দি টুয়েন্টি সিক্সথ অব মার্চ বেলাল মোহাম্মদ অকুপাইড রেডিও স্টেশন চিটাগাং। ব্রডকাস্ট অব জেনারেল টিক্কাস স্পিচ ওয়াজ উই হেল্ড। দি রিসিভিচ অ্যান্ড ট্রান্সমিশন সেন্টার এ্যাট কালুরঘাট এ্যান্ড ব্রডকাস্ট্রিং সেন্টার এ্যাট আগ্রাবাদ নাইন মাইলস অ্যাওয়ে ওয়্যার আন্ডার কন্ট্রোল অব মুক্তিফৌজ। স্বাধীন বাংলা বেতার স্ট্যার্টেড ফাংশনিং অ্যাট ওয়ান পি এম অন দি সেম ডে। দি ডাইরেকটিভস অব শেখ মুজিব ব্রডকাস্টেড ওভার অ্যান্ড এগেন'।

বেলাল মোহাম্মদ মন্তব্য করেন—সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা স্বাধীনতা বলতে বুঝতাম বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গবন্ধু বলতে বুঝতাম স্বাধীনতা।

জনাব বেলাল মোহাম্মদকে প্রশ্ন করা হয় স্বাধীনতার ঘোষক কে—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মেজর জিয়া, না এম এ হান্নান? উত্তরে জনাব বেলাল মোহাম্মদ বলেন—ঘোষক এম এ হান্নান এবং দ্বিতীয় ঘোষকও তিনিই। মেজর জিয়ার ঘোষণাটি ছিল তৃতীয়। এছাড়াও সবক্ষেত্রেই এসব ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ও কথায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। অন্য সবাই ছিলাম আমরা কর্মী।

এক প্রশ্নের জবাবে বেলাল মোহাম্মদ বলেন—'১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর প্রভাবেই। পরবর্তী সময়ে সেই চেতনাকে সম্বল করেই আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ভূমিকায় ব্রতী হয়েছিলাম। মেজর জিয়ার চট্টগ্রামের ঘোষণা না হলে দেশ স্বাধীন হতো না। এ প্রশ্নের উত্তরে জনাব বেলাল মোহাম্মদ বলেন, মেজর জিয়ার ঘোষণা এইটুকুই যে একজন সামরিক

অফিসারের কণ্ঠে ঘোষণা শুনতে পেয়ে জনগণের মধ্যে মনোবল সঞ্চারিত হয়েছিল। এছাড়া এ ঘোষণা না হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধ ঠিকই চলত—দেশও স্বাধীন হতো।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে আপনি কিভাবে দেখছেন এ প্রশ্নের জবাবে জনাব বেলাল মোহাম্মদ বলেন—এ প্রশ্নের উত্তরে একটি কথাই বলব, সমগ্র স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা স্বাধীনতা বলতে বুঝতাম বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গবন্ধু বলতে বুঝতাম স্বাধীনতা। প্রশাসক মুজিবের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যেভাবেই হউক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভাবমূর্তির নিরিখে সত্যের খাতিরে বলতেই হয় ১৯৭১ সালের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সন্তান।

১৯৭১ সালের সলিমপুর কোস্টাল স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার; সুপারভাইজার শফিকুল ইসলাম স্বাধীনতা ঘোষরা সম্পর্কে বলেন—স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রাক্তন মন্ত্রী মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী মরহুমা ডা. নুরুন্নাহার জহুর ওয়্যারলেস স্টেশনে পাঠান টেলিফোনে। তিনি ফোন করেন তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী হাকিম সাহেবের সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু হাকিম সাহেব উপস্থিত না থাকায় তৎকালীন টিটি আর জালাল ভাই ফোন রিসিভ করলে ডা. নুরুন্নাহার জহুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানান এবং হাকিম সাহেব আসলে তার সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। তারা এটা অন্য কোথাও প্রচার করেছেন কিনা আমি জানি না। আমাদের এখানে অর্থাৎ সলিমপুর স্টেশনে পাঠানো হয় সকালে ডা. নুরুন্নাহার জহুর থেকে টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি গ্রহণ ছাড়াও পরে ছোট একটা কাগজও পাঠানো হয়েছিল যা জালালের কাছে ছিল।

আবুল ফজল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাহাড়তলীস্থ টিএন্ডটি ওয়্যারলেস বিভাগের অফিসে ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানোর পরই আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে দেশে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য। শুধু সময়ের অপেক্ষা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। একমাত্র ওয়্যারলেস শিপিং চ্যানেলের মাধ্যমে জাহাজগুলির সাথে যোগাযোগ ছিল।

জনাব আবুল ফজল আরো বলেন, ২৫ মার্চ সকালে সার্বিক অবস্থা জানার জন্য বাহির হয়ে দেখি স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও ছাত্রদের একটি দল কি যেন পরামর্শ করছে। পরিচিত দু'একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে

পারলাম যে তাদের হাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কপি রয়েছে। যাতে বাঙালিদের ওপর পাঞ্জাবিরা গণহত্যা চালাচ্ছে বলে উল্লেখ রয়েছে এবং সর্বত্র জানানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তারা এটা কিভাবে বহির্বিশ্বে জানানো যায় এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ বহির্বিশ্বে পৌঁছানোর ব্যাপারে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করি। কিন্তু কিভাবে একাজ করবেন সে ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারণ ম্যাসেজটি ব্রডকাস্ট করতে হবে সলিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে। পাহাড়তলী থেকে ট্রান্সমিটার করলেই তা পাঠানো যাবে। অপরদিকে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলাম। কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দেওয়াকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করলাম। এই অবস্থায় আমি সলিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব আব্দুল হাকিমের কাছে ফোন করলাম। ফোন ধরলেন সেখানকার টি টি আর জালাল আহম্মেদ। তাকে একটি বাণীর কথা বলতেই তিনি জানালেন যে অনুরূপ একটি বাণী তিনিও পেয়েছেন ভোরে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী ডা. নুরুন্নাহার চৌধুরীর কাছ থেকে। এটি প্রচারের জন্য জালাল আহম্মদ আমাদের ট্রান্সমিটিং স্টেশনের টিটিআর আবুল কাসেম ও আমাকে হন্য হয়ে খুঁজছেন। বললেন হাকিম সাহেব এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। আমাকে লাইনে রেখে অপর ফোনে হাকিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমাকেও তার সাথে কথা বলতে বলেন। হাকিম সাহেব আমাকে বলেন ভাই ফজল তুমি যেভাবেই পার টিটি আর কাসেমকে খোঁজ করে অফিসে এনে ট্রান্সমিটার অন করার ব্যবস্থা করো এবং জালাল আহমদ, জুলহাস উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম এদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করো। এছাড়া তিনি আমরা যে যেখানে থাকি না কেন তার সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিলেন। আমি কালবিলম্ব না করে কাসেমকে খোঁজ করে তাকে সব বলাতে সেও একমত হলেন। আমরা উভয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়তলী ওয়্যারলেস কম্পাউন্ডের কাঁটাতারের বেড়ার পাশ ঘেষে ট্রান্সমিটিং হলে প্রবেশ করে সলিমপুরস্থ ওয়ারলেস স্টেশনে ফোন করি সেখানে জালাল সাহেব তখনো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি জালাল সাহেবের সাথে মেসেজ পাঠানোর বিষয়ে কথাবার্তা বলার একপর্যায়ে কাসেম সাহেব কথা বললেন টেকনিক্যাল বিষয়ে। তারপর তিনি ট্রান্সমিটার অন করলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসেজ পাঠানোর সংকেত দেখেই আমরা ক্ষণিকের জন্য আনন্দে উদ্বেলিত হই। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি ম্যাসেজ কোন বন্দর বা জাহাজ গ্রহণ করলো তা জানার জন্য। মেসেজটি পাঠানো শেষ হলে জানতে পারলাম,

যে প্রথমেই কলকাতা বন্দর এবং একই সাথে গভীর সমুদ্রে জাপানী এবং গ্রীক জাহাজ উক্ত ম্যাসেজ গ্রহণ করেছে এবং তারা আশ্বাস দিয়েছে যে এটা তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ চট্টগ্রামের সলিমপুরস্থ ভি এইচ এফ স্টেশনের ওয়ারলেস কর্মচারী ছিলেন আলী। তিনি বলেন ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাক বাহিনী যে নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করে তার কিছু কথাবার্তা ভি এইচ এফ বেতার মারফতে ফৌজদারহাটস্থ ভিএইচএফ বেতারে ধরা পড়ে। সেখানে কর্মরত আব্দুল কাদের নামে একজন টিটিআর ঘটনাটি মাহফুজ আলীকে জানায়। সলিমপুর ভি এইচ এফ টারমিনাল টেশনটি ঢাকার মগবাজার ভি এইচ এফ টারমিনাল স্টেশনের সাথে যুক্ত। মাঝখানে কোন শট গ্রহণ করে আরো শক্তিশালী করে পাঠানোর জন্য কয়েকটি রিপিটারে স্টেশন রয়েছে। এগুলি হচ্ছে চট্টগ্রামের মিরসরাই, চাঁদপুর এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ।

জনাব মাহফুজ আলী আরো বলেন—২৫ মার্চ সকাল সাড়ে ৬টায় ঢাকার মগবাজার ভি এইচ এফ ওয়্যারলেস কেন্দ্রের সুপারভাইজার মেজবা উদ্দিনের কণ্ঠে ভেসে এলো মোবাইল বেইজের মাধ্যমে সলিমপুর ভি এইচ এফ স্টেশনে। মেজবা উদ্দিন বলেন মাসেজটি লিখে নিন এবং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ নিকটস্থ মেরিন কোস্টাল বেইজ সেখানে যেভাবে পারেন মাসেজটির কথা অবহিত করুন। মাসেজটি রিসিভ করেন মাহফুজ আলীর বক্তব্য অনুযায়ী। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, যে কোনোভাবে হোক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী ঢাকার মগবাজার ভি এইচ এফ ওয়্যারলেস স্টেশনে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার কর্মচারীরা তা ঢাকার বাইরে পাঠানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। যার একপর্যায়ে ২৫ মার্চ সকালে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বাণীটি পৌঁছানো সম্ভব হয়।

জনাব মাহফুজ আলী আরো বলেন, জাতির পিতার বার্তাটি ভি এইচ মোবাইল বেইজের মাধ্যমে গ্রহণ করার সময় চট্টগ্রাম-এর পাকিস্তানি নেভি ওয়্যারলেস টেকনিক্যাল ট্রাবল দিয়েছিল। কিন্তু ২৫ মার্চ রাত প্রায় ১১:৩০ মিঃ হতে উক্ত ভিএইচএফ মাধ্যম ছাড়া ঢাকার সাথে অন্য কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাই অতিকষ্টে বাণীটি গ্রহণের পর এটি দেশ বিদেশে প্রচার করা নিজ দায়িত্বও কর্তব্য মনে করে বাণীটি চট্টগ্রাম বহির বন্দরে অবস্থানরত কয়েকটি বিদেশি জাহাজে প্রেরণ করি, ভি এইচ এফ মোবাইল বেইজের হুচপ্লেক চ্যানেলের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি প্রেরণের সময়ও চট্টগ্রাম সদর নৌ দপ্তরে

থেকে চ্যানেলে টেকনিক্যাল ট্রাবল সৃষ্টি করা হয় এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। তারা রকেট বোমা দিয়ে সলিমপুর বেতার কেন্দ্র উড়িয়ে দেয়া এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। আমি দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুর হুমকিকে অগ্রাহ্য করে বার্তাটি বহির্নোঙ্গরে অবস্থানরত দুটি বিদেশি জাহাজে প্রেরণ করি। এ ছাড়া ২৫ মার্চ সকালেও টেলিফোনের মাধ্যমে বার্তাটির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম আর সিদ্দিকী এবং জহুর আহম্মদ চৌধুরীসহ জানাশোনা গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও অফিসারবর্গকে অবহিত করি।

সলিমপুর ওয়ারলেস স্টেশনের তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী একে এস এম এ হাকিম বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বহির্বিশ্বে প্রেরণের বিষয়টি টেলিগ্রাফ টেলিফোন বিভাগের তৎকালীন হাই কমান্ডের অবগতির জন্য একটি নোট পাঠান। উক্ত নোটের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ : ২৭ মার্চ কালুরঘাট থেকে মেজর জিয়ার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতার ঘোষণার আগেই ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ও ২৬ মার্চ সূচনা লগ্নে মাঝ রাতে টিএন্ডটি কর্মচারীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের কাছে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা শুনেছেন। ২৬ মার্চ ভোরে ডা. নুরুন্নাহার জহুরের স্বাধীনতা ঘোষণাটি পাওয়ার পর সকালে পুনঃ যোগাযোগ করে এ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হন। পরে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জোগাড় করে ওই দিনই বার্তাটি সলিমপুর আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ওয়্যারলেস যোগে নিকট কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধী এবং সমুদ্রগামী অন্যান্য বিদেশি জাহাজে প্রেরণ করা হয়। সহকারী প্রকৌশলী হাকিমের ব্যবস্থাপনায়। বার্তাটি প্রেরণ করেন জালাল আহমদ। অপর যে ৪ জন সহকারী ছিলেন তারা হচ্ছেন : ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার জুলহাস উদ্দিন ও মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম টি টি আর আব্দুল কাসেম খান এবং ক্যাশিয়ার আবুল ফজল। কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী তাদেরকে বার্তাটি প্রেরণ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। (স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু প্রামাণ্য দলিল, মুহাম্মদ শামসুল হক, পৃ. ৩২-৪৫)।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে শুল্ক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কালেক্টর এম এ হালিম লেখেন—১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামে আনুমানিক ২টা থেকে ৩টার মধ্যে মাইক যোগে প্রচার করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত নির্দেশাবলী টেলিগ্রাম আকারে ২৬ মার্চ সকালবেলা থেকে জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়। সকাল প্রায় ৮টার সময় বরিশালের বন্ধু আবদুল মালেক আগ্রাবাদ কলোনির

রেশনসপের মালিককে নিয়ে আগ্রাবাদ জিসিএম কলোনিতে এসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার একটি ধ্বনি হালিম সাহেবকে দিয়ে যান। এর বাংলা অনুবাদ করেন তৎকালীন আগ্রাবাদ সরকারি কলোনির সেক্রেটারি সফিউদ্দিন আহমদ। আগ্রাবাদ সরকারি কলোনির মসজিদের মাইক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রচার করা হয়। টেলিগ্রামের মর্মকথা ছিল রাজারবাগ ও পিলখানায় শত সহস্র বাঙালি পুলিশ ও আর্মির লোকজনকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। তোমাদের কাছে যার যা আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করো। এবং শত্রুদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করো। জয় বাংলা।

কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীর সাথে আলোচনার পর হালিম সাহেব বেবী ট্যাক্সস করে মাইকযোগে আগ্রাবাদ, ফকিরহাট ও দেওয়ানবাগ হাটে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। তার সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের ট্রেজারি সেকশনের ফজলুল হক ও মোহাম্মদ আলম নামক আরো একজন সহযোগী। বেলা প্রায় ১০ টার সময় চট্টগ্রাম জিপিওর সামনে হান্নান সাহেবের সাথে হালিম সাহেবের দেখা হয়। তার প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণাটি আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করতে রাজি হন। হান্নান সাহেব বলেন, তুমি তাড়াতাড়ি বেতার কেন্দ্রে যাও এবং কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সব ঠিক করো। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বেতার কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছব। রেডিও অফিসে কর্মকর্তাদের না পেয়ে হালিম সাহেব রেডিও স্টেশনের বিভাগীয় প্রকৌশলী মির্জা নাসিরুদ্দীন সাহেবের বাসায় যান। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার পর মির্জা সাহেব রেডিও স্টেশনে যান। যাওয়ার পথে রেডিও প্রকৌশলী আবদুস সোবহানকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। ইতোমধ্যে হান্নান সাহেব রেডিও স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেন। মির্জা সাহেব বলেন, আগ্রাবাদ কেন্দ্র থেকে প্রচারের চেয়ে কালুরঘাট থেকে প্রচার করা সহজ হবে। সোবহান সাহেব বলেন এখান লেকে প্রচার করা হলে সবাই ধরা পড়ে যেতে পারে। অতএব তাড়াতাড়ি করে সবাই কালুরঘাটের দিকে রওনা হন। যাওয়ার পথে রেডিও প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেনকে গাড়িতে তুলে নেয়া হয়। তারা যখন কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে পৌঁছান তখন সেখানে কোনো লোকজন ছিল না। শুধু রহমান নামে একজন পাহারাদার ছিল। সে সবাইকে গেটও খুলে দিল। হান্নান সাহেবের অনুরোধে প্রকৌশলীরা কাজে লেগে যায়। সেদিন শুক্রবার। ইতোমধ্যে সোবহান সাহেব এসে বললেন আপনারা এখন যা বলতে চান তা বলতে পারেন। জনৈক ছাত্রকর্মী

হান্নান সাহেবের নির্দেশে ঘোষণা করেন—এখনই চট্টলার বীর হান্নান সাহেব স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে আপনাদের সামনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বেতার ভাষণ দিবেন। তখন বেলা প্রায় ২টা ১০ মিনিট। হান্নান সাহেব প্রথমবারের মতো বাংলার স্বাধীনতার ঘোষণা করে বাংলার মানুষকে জাগ্রত করেন। ঘোষণা মর্মকথা ছিল—আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ও তার নামে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা যারা এই গোপন রেডিও হতে আমার এই ঘোষণা শুনছেন, তারা অন্যদের নিকট এই বাণী প্রচার করবেন। আর যার নিকট যা কিছু আছে, তা নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করুন এবং দেশকে মুক্ত করুন। পরের দিন ২৭ মার্চ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও বেলাল মোহাম্মদের একান্ত সহযোগিতায় মেজর জিয়া পটিয়া হতে এসে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৮ মার্চ মেজর জিয়া সংশোধিত আকারে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়, আব্দুল মতিন , পৃ. ২৮, ২৯)।